তারাশঙ্কর

হরপ্রসাদ মিত্র

আইডিয়াল পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

তারাশঙ্কর

উৎসর্গ—

আমার অধ্যাপক

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম খুবই দ্রুত চলে থাকে। তিনি অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, আরো অনেক লিখবেন বলে আশা করা যায়। তাঁর সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনো মন্তব্যে পৌঁছোবার সময় হয়নি এখনো। তবে, জন্ম-কালের দিক থেকে স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ইত্যাদির সন্নিহিত যাঁরা, সেইসব যশস্বী লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক সক্রিয়, সর্বাধিক পরিচিত এবং বোধ হয় সর্বাধিক পুরস্কৃত ব্যক্তি! তরুণতর কৃতী লেখক স্বর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণযোগ্য।

তাঁর লেখার প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে, পাঠক হিসেবে, সমালোচককে অবিশ্যি আপন সীমাতেই সীমিত থাকতে হয়েছে। এখানে সেই অনিবার্যতাটুকু সংকোচের সঙ্গে স্মরণ করছি।

মূলতঃ এ-আলোচনা তারাশঙ্করের রচনা-প্রকৃতির আস্বাদন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে আমি আন্তরিক স্নেহে আবদ্ধ। পাঠক হিসেবে সাধ্যানুসারে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দূরে রাখবার চেষ্টা করেছি। যে-দুয়েকটি জায়গায় সে-রকম উল্লেখ ঘটেছে—সে-কেবল তাঁরই লেখকসত্তার উদ্‌ঘাটন সূত্রে।

বইয়ের শেষে প্রসঙ্গাদির যে সূচী যোগ করা হোলো, সেটি তৈরি করে দিয়েছেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী নমিতা সেন।

আজ বিশেষভাবে স্বর্গত মুরলীধর বসুর কথা মনে পড়ছে। তিনিই সেই প্রবীণ পাঠক, যাঁর উল্লেখ আছে এ-বইয়ের প্রধান একটি অংশে।

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর সাঁইয়ের উৎসাহেই এ বই ছাপা হোলো। তাঁর অকৃপণ বন্ধুত্বের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। —ইতি

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলিকাতা
রথযাত্রা, ১৩৬৮

॥ পাখার পরিধি ॥

পাখিকে উড়তে দেখার মধ্যেই তার যথার্থ পক্ষিস্বরূপের উপলব্ধি! পাখি অবিশ্যি উড়তেও জানে, বসতেও জানে। কিন্তু দাঁড়ে বসে পাখা মেলবার প্রদর্শনপটুতা তার যতোই থাক, আকাশে ডানা মেলে ভেসে পড়বার সামর্থ্যেই তার যথার্থ আত্মপরিচয়। আলো, বাতাস এবং বন-নীলিমার সমুদ্র-বিস্তারের মধ্যেই তার প্রাণাবেগের স্ফূর্তি! সে এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গায় ভেসে যেতে জানে। কখনো কখনো শরৎ-প্রভাতের কোনো তরুশাখায় অথবা রৌদ্রোজ্জ্বল কোনো গৃহশীর্ষে সে তার স্থির, স্তব্ধ, প্রশান্ত উপবেশনভঙ্গিতেও দেখা দেয় বটে, কিন্তু সে তো তার নানা ভঙ্গির একটা ভঙ্গি মাত্র! যখন সে ডানা মেলে দেয়, তখনই প্রকৃতির বিশেষ যে অভিপ্রায়টি তার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, সেটিকে চিনে নেওয়া সম্ভব।

গল্প-উপন্যাসের লেখকদেব সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাঁদের চিন্তা, যুক্তি, দর্শন, সঞ্চয় সব কিছুই তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতায় গিয়ে মেশা চাই। মানব-জীবনের মহাকাশে লক্ষ কোটি আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে তাঁদের পরিক্রমা। গল্প-প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতের সার্থকতা সেই গতিশীলতায়! আরম্ভ থেকে সমাপ্তির দিকে নিরবচ্ছিন্ন এক একটি পরিণতি রূপায়িত করে তোলাই তাঁদের বিশেষ কাজ।

তাই কথাসাহিত্যিকের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ তাঁদের রচনায় গল্পের স্বাভাবিক টান যেন বজায় থাকে; দ্বিতীয়তঃ বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজরূপ তাঁদের রচনায় যেন যথার্থভাবে স্বীকৃত হয়। স্বীকৃতির যাথার্থ্য বলতে কী বোঝায়, সে-কথা সৎ পাঠকের অনুভূতিবেদ্য। সৎ পাঠক কাকে বলে, সে প্রশ্নের বিস্তৃত জবাব এখানে আবশ্যিক নয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, উদার, অভিজ্ঞ, রসিক, আত্মস্থ পাঠকই হলেন সৎ পাঠক। লোকাচারের বাস্তব চেহারাটা তাঁর নখদর্পণে বিম্বিত থাকলেও যথার্থ শিল্পীর তদতিশায়ী 'আইডিয়া'ও তিনি সংকেতমাত্রেই ধরতে পারেন। আবার, লেখকসমাজের ছলনা, মুদ্রাদোষ, ভঙ্গিজাল বা অন্যান্য ত্রুটিও তাঁর নজর এড়াতে পারে না। দুর্বল লেখকের সামাজিক প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর রসবোধ

আচ্ছন্ন হয় না, আবার যথার্থ শক্তিমানের সামাজিক অ-প্রতিষ্ঠাতেও তিনি নিজেকে বিভ্রান্ত হতে দেন না। সৎ পাঠক মানে স্বাধীন পাঠক। স্বাধীনতা মানে সজাগ সৌষম্য-চেতনা। সৌষম্য মানে পারস্পরিক অন্বয়ের মাধুর্য। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিশব্দ নয়। লেখকের সম্বন্ধে সৎ পাঠকের অনুরাগ অকৃত্রিম। ভালো লেখার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অনাচ্ছন্ন। তিনিই যথার্থ সামাজিক এবং তিনিই যথার্থ স্বাধীন।

রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনার পথ তাঁর কাছে একটিই, কিন্তু তার অধ্যায় দুটি। পাখিকে দেখবার উপায় আনন্দের সঙ্গে চোখ খোলা। চোখ খুললে দুটি বিষয় ধরা পড়ে—এক, তার পাখার পরিধি; দুই, তার ওড়ার আনন্দ!

অতঃপর আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, লাভপুর, বীরভূম।

ছেলেবেলায় দশ বছর বয়সে, কোনো এক ঘুম-না-হওয়া রাত্রে তিনি তাঁর মায়ের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পড়েছিলেন। তারও আগে, সাত পেরিয়ে যখন আটে পড়েছেন, তখন তাঁদের বৈঠকখানা-বাড়ির খড়খড়িওয়ালা এক দরজায় তিনি খড়ি দিয়ে লিখেছিলেন জীবনের প্রথম কবিতা। সে লেখার উপলক্ষ ছিলো সামান্য একটি পাখির মৃত্যু:

পাখির ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

এ অতি কাঁচা লেখা। কিন্তু শুধুই কল্পনা নয়,—সত্যিকার অভিজ্ঞতার ওপরেই তাঁর ছেলেবেলার এই চার লাইনের প্রতিষ্ঠা।

কাব্যচর্চার আরো অনেক উপলক্ষ ছিলো সেই বাল্যপর্বে। কুকুরের সমাধির ওপরেও কবিতা লিখতে হয়েছে,—আবার শারদীয়া পুজা উপলক্ষেও। কিন্তু অভিজ্ঞতার সম্পর্কহীন, ভিত্তিহীন কল্পনামাত্রকে প্রশ্রয় দেবার ঝোঁক ছিল না তাঁর। অভিজ্ঞতার শক্ত মাটির ওপরেই তাঁর আজন্ম আস্থা! তাঁর এই কবিত্ব, আর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সত্যনিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি,—এই দুটি প্রসঙ্গের ওপর জোর দিয়েই এ-আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

'আমার সাহিত্য জীবন' তাঁর পরিণত বয়সের আত্মকথা। তের শ' ষাট সালের শ্রাবণ মাসে বইখানির প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছে। গল্পে উপন্যাসে কৃতী লেখকের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেও তিনি যে তাঁর ছেলেবেলার কাব্যচর্চার কথা ভুলতে পারেননি, তার প্রমাণ আছে তাঁর এই আত্মকথার পাতায় পাতায়। মনে হয়, কবি হয়ে আত্মপ্রকাশ করবারই ব্যাকুলতা ছিল তারাশঙ্করের। কিন্তু সরস্বতী তাঁকে অন্য পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু ছেলেবেলার কাঁচা কাব্যোচ্ছ্বাসের জন্যেই যে তাঁকে কবি বলে মানতে হয়, তা নয়। গদ্যের যুক্তি-তথ্য-বিচারের রাজ্যেও তাঁর লেখার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় টুকরো টুকরো কবিতা,—কখনো পরিহাসের চমক, কখনো বা গভীর আবেগ। তাঁর প্রসিদ্ধ একখানি উপন্যাসের নাম 'কবি'। বংলার আউল, বাউল, তন্ত্রসাধক নানা কবির মধ্য দিয়ে কবিত্বের যে অকৃত্রিম, গ্রাম্য ধারাটি সুদূরকাল থেকে নেমে এসেছে, তারাশঙ্কর সেই ধারারই মানুষ। রাঢ়ের কাঁকুরে মাটি, শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের আচার আর বিশ্বাস,—গ্রাম, নদী, মাঠ, জঙ্গলের পরিবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে কবিত্বকে তিনি তাঁর নিজের করে নিয়েছেন। সে কবিত্ব গ্রাম্য, কিন্তু অকৃত্রিম। নিজের 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের গ্রামে বাউড়ীদের মধ্যে ডোমেদের মধ্যে কত কবি আছে। তাদেরই একজনকে নিয়ে আমার মানস সরোবরে স্নান করিয়ে আমার 'কবি' উপন্যাসের নায়ক হিসাবে অভিষেক করেছি।'

এই বাক্-ভঙ্গির মধ্যে তাঁর কবিওয়ালা-ভাবটিও দৃশ্যমান! 'মানস সরোবরে স্নান' করানোর সমারোহ-ভঙ্গি,—কিংবা উপন্যাসের নায়ক-নির্বাচনের কথা বলতে গিয়ে 'নায়ক হিসাবে অভিষেক করেছি'—এই আড়ম্বরের ঝোঁক দেখাবার রুচি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় আর কোনো গদ্য-লেখকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। তারাশঙ্করের লেখায় এ রকম ভঙ্গি বার বার চোখে পড়ে। এ যেন কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের বিকৃতি, কতকটা কবিওয়ালার উচ্ছ্বাস! 'বিকৃতি' আর 'উচ্ছ্বাস' ছাড়া অন্য শব্দ মনে আসছে না। একালের হাওয়াতে সেকালের এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রক্ষেপ সজাগ পাঠকের কানে লাগে বই কি! সেটাই প্রত্যাশিত। তারাশঙ্কর নিজেও সে বিষয়ে সচেতন। সুখ-দুঃখের মিশ্র-অনুভূতি দিয়েই তিনি লিখেছেন : 'বাংলা দেশটাই কবির দেশ। কবি অনেক আছে, কবির কাব্য

শোনবার লোকেরই বরং অভাব, শ্রোতা নেই। তাই আগের কালের কবিরা কাব্য রচনা করে নিজেকেই নিজে শোনাত। মাঠের মধ্যে হাল বইতে বইতে চাষী কবি গান বেঁধে সুর দিয়ে আপন মনেই গেয়ে উঠতো—পাশে পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি সে গান শুনেছি।'

তাই তিনি নিজের পঙ্গু, দুর্বল বাল্যরচনা থেকে নানা পদ্যের নমুনা ছাপার হরপে চিরকালের জন্যে তাঁর পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথও তা পারতেন না! চুয়াত্তর বছর বয়সে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বটে—

যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোন কবি—
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুল চুক।

তবু, সেই সঙ্গে তাঁর মনে কাঁটার মতন এক 'কিন্তু' দেখা দিয়েছিল:

কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ?

এবং এর পরের ক'লাইনে তিনি বলেছিলেন:

ভাবী কালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি
বর্তমানের ভরি অর্ঘের ডালি
অদেয় যা দিনু মাখায়ে ছাপার কালি
তাহার লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

কবিতার ব্যাপারে এরকম 'কিন্তু'-বোধ থেকে বেশ মুক্ত থেকেই তারাশঙ্কর তাঁর ছেলেবেলার এলোমেলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা অনেকগুলি কবিতার লাইন ছেপে দিয়েছেন বটে,—তবু আর-একভাবে তাঁকেও এই 'কিন্তু'-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে! সে তাঁর গদ্য রচনার ক্ষেত্রে। নিজের লেখার মধ্যে তিনি যেন কেবলই খুঁৎ ধরতে অভ্যস্ত। তাই সংস্করণে সংস্করণে পুরোনো লেখা নতুন করে সংশোধন করবার তাগিদ আসে তাঁর মধ্যে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র 'প্রকাশকের নিবেদনের মধ্যে 'বেঙ্গল পাবলিশার্স'-এর অংশীদার

শ্রীযুত মনোজ বসু সে কথা উহ্য রাখেন নি। একজন কথাসাহিত্যিক সমকালীন আর-একজন কথাসাহিত্যিককে সেখানে এই বলে তারিফ করেছেন :

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে সর্বজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য তারাশঙ্করকে 'শরৎচন্দ্র-পদক ও পুরস্কার' দানে সম্মানিত করেছেন। পাঠকবর্গ সমাদর করেছেন—তার প্রমাণ আমরা প্রকাশক হিসাবে দাখিল করতে পারি। প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে।...তাঁর মতো অতৃপ্ত লেখক বাংলা দেশে বিরল। প্রতি সংস্করণেই তিনি বইয়ের সংস্কার করে থাকেন। হাঁসুলী বাঁকের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়—সংস্কার করতে বসে বইখানিকে তিনি প্রায় নূতন করে লিখেছেন। তাতে বইখানির কলেবর পুর্বের চেয়ে আরও প্রায় দশ ফর্মা বেড়ে গিয়েছে। কাহার-জীবনের যে সব কথা পুর্বে ছুট পড়েছিল, লেখক সে সব বলেছেন এবং চরিত্রগুলিকে পুর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্য নূতন ঘটনা-সংস্থান করে বইখানিকে প্রায় নূতন গ্রন্থে পরিণত করেছেন।'

বইয়ের আকারে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রথম ছাপা হয় তেরশ' চুয়ান্নোর আষাঢ় মাসে। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল তেরশ' পঞ্চান্নোর আশ্বিনে এবং তৃতীয়টি তেরশ' আটান্নোর জ্যৈষ্ঠে। পর পর দুটি সংস্করণেই তারাশঙ্কর অকৃপণভাবে কলম চালিয়েছিলেন। এবং এ স্বভাব তাঁর প্রায় সব বইয়ের সব সংস্করণের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা' এর বিরল ব্যতিক্রম !

অভিজ্ঞতার সীমা মেনে চলবার বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা,—তাঁর কবিত্ব,—এবং তাঁর এই পৌনঃপুনিক পরিমার্জন-স্বভাবের পরে, তাঁর চতুর্থ যে বিশেষত্বের কথা মনে পড়ে, সে তাঁর কৌতুক-স্বভাব। তাঁরই আত্মকথা থেকে পাওয়া তাঁর গ্রাম-সম্পর্কের ব্রজ-জ্যাঠার কথা স্মরণীয়। তিনি ছিলেন 'পোষ্টাপিসের চাকুরে, তন্ত্রমন্ত্র-সাধক, গাঁজা খেতেন, মদ খেতেন আধ-পাগলা আত্মভোলা মানুষ; সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন।' একদিন বীরভূমের লাল কাঁকুরে পথ ধরে দারুণ গ্রীষ্মে তাঁকে তাঁর কুটুমবাড়িতে যেতে হয়। পথে তাঁর জুতো ছিঁড়ে যাওয়ায় জুতো ফেলে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ব্রজজ্যাঠা যখন তাঁর ধনী কুটুমবাড়িতে,—অর্থাৎ জমিদারবাড়িতে

গিয়ে পৌঁছোলেন, তখন তাঁরা জিগেস করেন 'এ কি ব্রজবাবু খোঁড়াচ্ছেন কেন?'

মনোহরশাহী কীর্তনের সুরে ব্রজজ্যাঠা তখুনি জবাব দিয়েছিলেন:

ভাস্করেরই কর (ও) অতীব প্রখর (ও)
ফোসোকা পড়িল পায়
তাহারো উপর (ও) পথেতে কাঁকর (ও)
লবণের ছিটা ঘায়ে

ব্রজ-জ্যাঠার এই কৌতুক-স্বভাব তারাশঙ্করের মধ্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও যে বর্তেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ছড়া কিংবা গানের মধ্য দিয়ে তাঁর হাস্য-পরিহাসের ঝোঁক তাঁর পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করেছেন। ব্রজ-জ্যাঠাকে তিনি কখনোই ভুলতে পারেননি। গভীর দুঃখের মধ্যেও ব্রজ-জ্যাঠার পরিহাসের ঝিলিক তাঁর গল্প-উপন্যাসের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে যায়। 'তমসা'র পঞ্চীকে মনে পড়ে,—মনে পড়ে 'আরোগ্য-নিকেতনের' সেতাবের ছড়া। 'দিল্লীকা লাড্ডু'র ব্যঙ্গ-রীতি অবিশ্যি অন্য জাতের। সেখানে ব্রজ-জ্যাঠার চিহ্ন নেই। ব্রজ-জ্যাঠা যতো পরিহাস-রসিক, ততো ব্যঙ্গ-পরায়ণ নন। তাঁকে চেনা যায় গানে, ছড়ায়, হাসিতে, প্রসন্নতায়। আবার 'ইমারত' গল্পের কাহারদের বউ মতিবালা যখন ছাদ পিটতে পিটতে গান ধরে:

বাবুদের চিলের কোঠার ছাদে
চিল কাঁদিছে গো ভরা দুপুরে
চিলি পালায় কোথা বাসা
বেঁধেছে কোন্ তালপুকুরে

কিংবা 'তৃষ্ণা' গল্পের সংকীর্তন-দলের শিরোমণি ক্ষুদিরাম যখন গান ধরে—

পরের লাগি মন উদাসী
লোকে হাসে বাঁকা হাসি
হায়, কাল কলঙ্করাশি হইল অঙ্গভূষণ
তবু তো পেলেম না সে ধন,– কঠিন পরের মন।

—তখন সেইসব গানের মূলে ব্রজ-জ্যাঠা তাঁর স্মৃতিতে থাকুন বা না থাকুন, তাতে তারাশঙ্করের কবিস্বভাবের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবার সম্ভাবনা নেই! গান বানাতে তিনি ভালোবাসেন। গান রচনা সম্বন্ধে তাঁর বেশ একটু গৌরববোধ আছে। সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন।

অনুরাগের চোখ দিয়ে দেখলে যেসব লক্ষণ গুণ বলে মনে হয়, অনুরাগহীন বিশ্লেষণে তারাই কখনো আবার দোষ বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতানিষ্ঠার সঙ্গে মিশে আছে তাঁর আড়ম্বরস্বভাব,—তাঁর সত্য-বীক্ষার সঙ্গে ভাবোচ্ছ্বাস,—তাঁর গানের সঙ্গে গ্রাম্যতা! বেদে, বাউল, যাযাবর-সমাজের দিকেই তাঁর অন্তরের আগ্রহ। শিল্পী হিসেবে সংযমের তুলনায় প্রাচুর্যের দিকেই তাঁর পক্ষপাত। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সেই অসম্পূর্ণ প্রাচুর্যের দিকটাই সংক্ষেপে, কিন্তু বিশেষ ভাবে দেখিয়েছেন। তাতে এই কথাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে যে তারাশঙ্করের কলমে লেখার বিষয়ের অভাব নেই, কিন্তু তিনি জানেন না যে তা কী ভাবে লিখতে হবে!'[১]

এই কথাটাই আরো একভাবে দেখা যায়। তারাশঙ্কর বার বার জীবন সম্বন্ধে তাঁর যে সত্যবোধের কথা বলেছেন, সেই সত্যবোধের কথাটাই এই খানে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

তেরশ' পঁয়তাল্লিশ সালে 'রঞ্জন প্রকাশালয়' থেকে তাঁর 'রসকলি' গল্পসংগ্রহ বেরিয়েছিল। তাতে, লেখকের ভূমিকাতে তিনি বলেছিলেন :

> 'রসকলি আমার প্রথম গল্প, রসকলি হাতে লইয়া সাহিত্য-অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনের 'কল্লোলে' গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটির প্রতি আমার একটি মমতা আছে।...'

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সেই বইয়েতেই তাঁর সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকার মধ্যে লিখেছিলেন :

'শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু এবং সর্বশেষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকদলে ইঁহারা কেহই অনধিকার প্রবেশ করেন নাই।...এই কীর্তিমান লেখকসমাজে তারাশঙ্করের স্থান একটু স্বতন্ত্র। অন্য সকলের ক্ষেত্রে গল্প বলিবার আর্ট বস্তুটা মুখ্য, বিষয়বস্তু গৌণ। তারাশঙ্করের আর্ট বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করিয়া চলে, বিষয়কে প্রকাশ করিয়া আর্ট গৌরবান্বিত হয়। এই বাস্তব-প্রাধান্য তারাশঙ্করের

১। 'An Acre of Green Grass' দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।...তাঁহার সকল রচনায় একটা অমোঘ নিয়তি ও একটা বিশ্বগ্রাসী নীতির জয়ঘোষণা আছে।...'

সজনীকান্ত তাঁর অনেক দিনের বন্ধু। এ-কালের বাংলা সাহিত্যে সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি' যে ক'জন কথাসাহিত্যিকের বিকাশে সহায়তার গৌরব দাবি করতে পারে, তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর, বনফুল এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রগণ্য। কবি এবং সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও সেই 'শনিবারের চিঠি'রই স্বজন। তেরশ' আটচল্লিশ সালের ফাল্গুনে মোহিতলালের নামে তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি' বইখানি উৎসর্গ করেন। তার বছর ছয়েক পরে তেরশ' চুয়ান্নোর পৌষ মাসে মোহিতলাল সেই বইখানি উপলক্ষ করেই তাঁর সম্বন্ধে সুদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে এই কটি কথার ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল যে, তারাশঙ্কর বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিএ বং রসসৃষ্টির একটি নতুন ক্ষেত্র এনেছেন,—'বাংলার একটা অঞ্চলের একেবারে মাটির গন্ধ' তাতে লেগে আছে,—তাঁর আর্ট 'অন্তর্দৃষ্টিহীন বহিরঙ্গের ফটোগ্রাফ নয়',—তাঁর কাহিনী তাঁর চরিত্রসৃষ্টির বিশিষ্টতার ওপরেই নির্ভরশীল এবং তা দেখে সংস্কৃতের সেই কথাটি মনে পড়া স্বাভাবিক যে 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্'। মোহিতলাল সেই প্রবন্ধের মধ্যে আরো বলেছিলেন যে, তারাশঙ্কর তাঁর 'বাস্তবনিষ্ঠ'—অথচ 'বাস্তবভেদী' দৃষ্টির গুণে যে জগৎকে দেখেছেন, তাকে মোটেই বিস্তীর্ণ বলা চলে না। তাঁর বাস্তব-জিজ্ঞাসার মূলে মোহিতলাল দেখেছিলেন 'বৈজ্ঞানিক পিপাসা', অর্থাৎ জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আন্তরিক আগ্রহের গুণে বিশেষ সজাগ থাকবার মনোভাব!

তারাশঙ্কর তাঁর নানা লেখার মধ্যে জীবনের কথা বিচিত্রভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যিকের সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে তাঁর জীবন-বোধের সম্পর্ক কী রকম? 'জীবনের বোধ' কথাটার লক্ষ্য কী? 'জীবন' তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়লব্ধ, বুদ্ধি-অর্জিত, আবেগ-স্বীকৃত, পরিবেশ-সঞ্জাত কিছু কিছু অভিজ্ঞতার মালা,—স্মৃতির সমাবেশ এবং বিস্মৃতির কুয়াসা! শাদা চোখে দেখলে জীবন তো অন্তহীন বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাত এবং কামনা-বাসনার অন্তহীন তাড়নামাত্র বলে মনে হয়। আমাদের প্রতিদিনের লোকব্যবহারে লোকের মুখে মুখে এই 'জীবন' শব্দটি এতো বেশিবার উচ্চারিত হয় যে, তাতে এ-শব্দের গভীর ইশারা

ক্রমেই ঝাপসা হতে থাকে। তারাশঙ্করের কথা-প্রসঙ্গে মোহিতলাল মানব-জীবনের সেই বিশেষ ইশারাকেই আমাদের বোধের সামনে তুলে ধরেছিলেন: 'জীবন বলিতে আমি কি বুঝি তাহা বলিয়াছি, বলিয়াছি—মূলে সে একটা শক্তি আমাদের জ্ঞানে তাহা অন্ধ। সেই শক্তি মানুষের দেহ-জীবন আশ্রয় করিয়া, তাহার নিজেরই সেই দুর্জ্ঞেয় লীলায় যেন এক-একটি চরিত্ররূপে ফুটিয়া ঝরিয়া যাইতেছে।' মোহিতলালের কথায় এই জীবন সত্যের রূপকার হবার তাগিদেই তারাশঙ্কর জীবন-গ্রন্থের অধ্যবসায়ী পাঠক হতে আপত্তি করেন নি। তিনি নিজে তারাশঙ্কর সম্পর্কিত তাঁর ঐ আলোচনাতে 'অধ্যবসায়' শব্দটি একবারও ব্যবহার করেন নি বটে, তবে 'জীবন' সম্বন্ধে তারাশঙ্করের অনুসন্ধানের স্বরূপ বা প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন: 'রসাস্বাদনের জন্য বা রসকল্পনার বশে নয়—তাহার কলকব্জা, তাহার জটিল জাল-গ্রন্থি খুলিয়া দেখিবার একটা দুর্দমনীয় কৌতূহলে—কেবল দেখিবার ও জানিবার আকুল ইচ্ছায় তারাশঙ্কর বহু পরিশ্রম করিয়াছেন।'

এই সমালোচনার কয়েক মাস আগে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বইখানি বেরিয়েছিল (আষাঢ়, ১৩৫৪)। মোহিতলাল বলেছিলেন: 'ইহা ঠিক গল্প বা উপন্যাস নয়, ইহা তারাশঙ্করের সেই অপর ক্ষুধার—সেই মানুষ ও মানুষের সমাজকে জানিবার দেখিবার সেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্তির একটা চমৎকার দলিল।...সেই জীবন বা সেই রহস্যময় শক্তির লীলা কোন্ ভঙ্গিতে কোন্ ছন্দে প্রকাশ পাইতেছে, তারাশঙ্করের দৃষ্টি সে দিকেও নিবদ্ধ আছে।' বেশ স্পষ্টভাবেই তিনি জানিয়েছিলেন, 'এ দৃষ্টি হৃদয়াবেগবর্জিত, বৈজ্ঞানিক তান্ত্রিকের দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই তারাশঙ্করের সকল রচনার আদি-প্রেরণা।'

'তন্ত্র' অথবা 'তান্ত্রিক-বৃত্তি' সম্বন্ধে মোহিতলালের একটু যেন বেশি ঝোঁক ছিল। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও 'তন্ত্রে'র উল্লেখ করেছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য-প্রবন্ধে তান্ত্রিক, বাউল ইত্যাদি ধর্ম-সম্প্রদায়ের নাম কতকটা তাঁর নিজস্ব পরিভাষার মতনই বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'নির্মম অনাসক্ত তান্ত্রিক দৃষ্টি', 'তান্ত্রিক রসপ্রেরণা' ইত্যাদি উক্তির সাহায্যে তারাশঙ্করের অকৃত্রিম সত্যানুরাগেরই তিনি প্রশংসা করে গেছেন। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে 'তান্ত্রিক দৃষ্টি'কথাটির অভিপ্রেত এই অর্থই বোঝা সম্ভব যে, সত্যের উপলব্ধি-প্রয়াসে তারাশঙ্কর সংকীর্ণ কোনো রকম বাছ-বিচার মানেন নি।

পৃথিবীর অন্তহীন, অসংখ্য মানুষের মধ্যে প্রেম-ব্যাপারটা কোথাও বা শৌখিন-অথচ-অনিবার্য ব্যাধি, কোথাও বা তা সাংঘাতিক রকমের রূপমোহ মাত্র, কোথায় গভীর বেদনা! কিন্তু শিল্পীর মনে প্রেমের জিজ্ঞাসাটা কী রকম? মানব-জীবনে প্রেমের প্রকাশতত্ত্বটি জানতে হলে সংকীর্ণ কোনো তারতম্য-সংস্কারে বাঁধা পড়লে চলবে না। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় পরিত্যাগ করে যথার্থ জীবন-সত্যের অনুসন্ধানেই তারাশঙ্কর আত্মনিয়োগ করেছেন। মোহিতলাল সেই কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

প্রত্যেক বড়ো শিল্পী সম্বন্ধেই এই ধরনের মন্তব্য মেনে নেওয়া যায়। তারাশঙ্কর যে যথার্থ শিল্পী, এতে কেবল সেই প্রশংসার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর নিজস্ব রুচি বা আগ্রহের দিকগুলি মোহিতলাল অতঃপর একটু বিশেষ ভাবেই বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং তাতে, এই ঔপন্যাসিককে তিনি 'বাঙালী সমাজ ও বাঙালী-জাতির জাতিগত জীবন'-এর কথক বলেই উপলব্ধি করেছিলেন; তাছাড়া তাঁর 'কবি' বইখানির মধ্যে মোহিতলাল বাংলার 'সহস্র বৎসরের হৃদয়স্পন্দন' অনুভব করেছিলেন; এবং এই ভাবনার ধারাতেই সমালোচক তাঁর এসব উপলব্ধিও প্রকাশ করেছিলেন যে,—১] 'বাঙ্গালী জাতির 'আভিজাত্য-গৌরব বলিয়া প্রকৃত কোন গৌরব নাই, ইহার গৌরব—সর্ববিশেষণবর্জিত, উচ্চ-নীচ-অভিমানহীন, ঐ ভূমির মতই সমতল-বাহিনী একটি অতি সরল অকৃত্রিম মানবতায়। সেই মানবতার মূল মন্ত্র—জীবনকে যতদূর সম্ভব জটিলতামুক্ত করিয়া, বিলাসব্যসনের উপকরণ-বাহুল্য, ঐশ্বর্যের দুরাকাঙ্ক্ষা, এবং লোকব্যবহারের সর্বপ্রকার কৃত্রিম বন্ধনজাল অগ্রাহ্য করিয়া ব্যক্তি-মানুষকে যতদূর সম্ভব মুক্তিদান করা।'—২] দ্বিতীয়তঃ বাঙালী সমাজের এই অভিমানহীন সর্বান্বয়ী মানবতাবোধ সমাজের ওপরের স্তরে 'শাস্ত্র-শাসনের ও সমাজ-বন্ধনের কঠিন কবচে অবরুদ্ধ' থাকলেও ভাবের বা রসের ক্ষেত্রে সমস্ত জাতির মধ্যেই আশ্চর্য এক সহানুভূতি নিহিত আছে, আর তারই ফলে ভাব-রসের ক্ষেত্রে এ জাতির সমপ্রাণতা স্বীকার্য; ৩] তৃতীয়তঃ বাঙালীর রক্তে এই যে জীবন-রসের বৈষম্যহীন আকুতি, এটি আস্বাদন করবার বিশেষ এক সাধনমার্গ আছে যাকে বলা যেতে পারে 'সহজিয়া' সাধনা। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল-ই এই সহজিয়া-সাধকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ!

সজনীকান্ত এবং মোহিতলালের এই সব মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করকে

যতোটুকু দেখা গিয়েছিল,—তাঁর নিজস্ব সেই বিশেষ ভাবসত্তাই অতঃপর তেরশ' সাতান্নো সালের পঁচিশে বৈশাখের আর-একটি লেখাতে পুনর্বর্ণিত হয়। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনের ভূমিকা হিসেবে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের সেই লেখাটি পাঠক-সমাজের সুপরিচিত। প্রধানতঃ গল্পের দিকটাতেই অধ্যাপককে নজর রাখতে হয়েছিল বটে, তবু সাহিত্যিক তারাশঙ্করের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন সমালোচকদের যাবতীয় প্রশংসার কথাগুলি সেই ভূমিকাতে এক সঙ্গে পরিবেষণ করতেও তিনি ভোলেন নি।

কিন্তু প্রশংসা অনুরাগীর কাজ। আবার নিন্দাও সমালোচনার প্রতিশব্দ নয়। সজনীকান্ত তারাশঙ্করের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। মোহিতলাল যথার্থ আবেগের সঙ্গে সেই স্বাতন্ত্র্যতত্ত্বের অনুরাগসমন্বিত ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। জগদীশবাবু তাতে তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, সঞ্চিত তথ্যজ্ঞান এবং কিছু পরিমাণে অধ্যাপক-সুলভ পুনর্বর্ণনাও যোগ করেছিলেন। শৈলজানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন তারাশঙ্করও যে আঞ্চলিকতায় চিহ্নিত;—কিংবা নাগরিক জীবনের সুখদুঃখ বর্ণনায় যাঁরা বিশেষ আগ্রহী, সেই সব আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদের মহল থেকে তিনি যে বেশ দূরবর্তী,—তিনি যে উত্তর-রাঢ়ের পল্লী-বাংলার কথাকার,—এবং 'কালিন্দী' (প্রথম সংস্করণ' ভাদ্র ১৩৪৭) পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি যে 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক',—'গণদেবতা' (প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৪৯) আর 'পঞ্চগ্রাম'-এর মধ্যে তিনি যে 'একটি বিরাট জনপদের পটভূমিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক জীবনের রূপ উপন্যাসের বিপুল আয়তনে পরিস্ফুট' করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন,—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তে তিনি যে ডোম, বাউরি, বাগ্দী, কাহার, বেদে, সাঁওতাল ইত্যাদি নানা অন্ত্যজ মানুষের জীবনালেখ্য এঁকেছেন—এইসব পূর্বাভ্যস্ত ধারণাই জগদীশ বাবু তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে সংহত হতে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক কথাসাহিত্য পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রবাহটি লক্ষ্য করে তিনি তারাশঙ্করকে সেই ধারার মধ্যে সমুচিত সম্মানিত দেখাতে চেয়েছিলেন। সেই প্রয়াসের বশবর্তী হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দুর্নীতি বোধের মাপকাঠি দিয়েই জীবন উপলব্ধি করেছিলেন,—তাঁর 'কল্পনামূলে ছিল শিবচেতনা'; অপর পক্ষে, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনস্বপ্নে ধরা পড়েছে সুন্দরের লীলা',—তিনি দেখেছেন 'রসিক মানুষ' কে! জগদীশবাবুর অভিপ্রেত প্রভেদতত্ত্বটি এতে ঝাপসা থেকে গেছে,—কারণ, 'নষ্ট নীড়' আর

'চোখের বালি'কে (যে দুটি উদাহরণ তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন,) যদি শেষ পর্যন্ত নীতি-বিমুখতার বা নীতিজ্ঞানের অতিশায়ী রসকৈবল্যবাদের উদাহরণ বলে মানতে হয়, তাহলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অথবা 'বিষবৃক্ষ'ই বা সেই একই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হবে না কেন? কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

শান্ত হয়ে ভাবলেই দেখা যাবে যে, মানুষের প্রবৃত্তি যে মাঝে মাঝে মানুষের সামাজিক আইন লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়, সেই তত্ত্বই এই চারখানি বইয়ের প্রত্যেকটির আলোচ্য। তবে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমও সমাজকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাই করে গেছেন। এ দিক থেকে দু'জনের লক্ষ্যের তফাৎ নেই। জগদীশবাবু যদি আর-একটু বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন, তাহলে তিনিও হয়তো এই কথাই বলতেন। এবং তিনি সেখানে অতঃপর যা বলেছেন, এটুকু মেনে নিয়েও তা বলা যেত। আজও তা বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকে ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের এলাকায় পৌছে পাঠককে একথা অনুভব করতেই হয় যে, সামাজিক নীতিজ্ঞানের শক্ত পাঁচিলে মাঝে মাঝে দুর্মর, দুর্দম, দুর্জয় ব্যক্তিমানসিকতার ঢেউ এসে লাগে। এবং তার ফলে সে পাঁচিলের ভিৎ আলগা হয়ে যায়। কিন্তু মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে, জীবনের গভীর কোনো ন্যায়-অন্যায়বোধের মাপকাঠিই সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায় না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয় যে অসম্ভব নয়, সে-কথা রোহিণী-গোবিন্দলাল অথবা কুন্দনন্দিনী-নগেন্দ্রনাথ চরিত্র-রূপায়ণের মধ্যেই ধরা পড়েছিল,—আবার অমল-চারু কিংবা মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মধ্যেও সেই একই রহস্যের রোমাঞ্চ অনুভব করা গেছে। যে বিকেলের আলোতে বিনোদিনী লুকিয়ে লুকিয়ে 'বিষবৃক্ষ' পড়েছিলেন, 'চোখের বালি'র সেই হৃত্তাপ-শিহরিত, আশ্চর্য সংঘর্ষময় অপরাহ্নের কথা মনে পড়ে! এও মনে পড়ে যে, প্রবৃত্তির শক্তিটা দেখিয়ে দেওয়া এক জিনিস, নীতির দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলা অন্য জিনিস। সাহিত্যিক ইচ্ছে করলেই নীতির দেওয়াল ভাঙ্গতে পারেন না। বড়ো বড়ো পরিবর্তনে সমাজ আগে সায় না দিলে সাহিত্যে তা কিছুতেই প্রবেশাধিকার পায় না। এবং জীবনের পক্ষে যা অত্যাবশ্যক, যা গ্রাহ্য বা বরণীয়, সে-রকম শিব-চেতনাকেও কোনো সমাজ দীর্ঘকালের জন্যে কখনোই ত্যাগ করে থাকতে পারে না।

অতএব তারাশঙ্কর-প্রসঙ্গে শ্রীযুত জগদীশ ভট্টাচার্যের সেই আলোচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা-সূত্রে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদের বিষয়ে 'নৈতিক মানুষ' আর 'রসিক মানুষের' যে পার্থক্যের কথা বলা হয়েছিল, তাকে যথার্থ সঙ্গত বলতে বাধা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও কল্যাণ-সচেতন, রবীন্দ্রনাথও কল্যাণবাদী। সামাজিক কল্যাণের আদর্শ সামনে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল স্তরের মানুষের জীবনে কখনো কখনো প্রবৃত্তির আকর্ষণ দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সে সংঘাত দেখিয়ে গেছেন। প্রভেদ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এসব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির কথা যতো বিস্তৃত ভাবে বলতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাতে আরো কিছু বিশ্লেষণ, আরো কিছু আগ্রহ যোগ করেছিলেন। প্রধানতঃ কালের পরিবর্তনেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের আমলে পৌঁছে সে আগ্রহের আরো আনুকূল্য, আরো বিস্তার ঘটতে দেখা গেছে। জগদীশবাবু এই গভীর কথাটি একটু স্থূলভাবে বলেছিলেন। শরৎচন্দ্র নাকি 'ভাবে অবশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া' 'আচণ্ডালে প্রেম' বিলিয়েছিলেন! জগদীশ-বাবুর কথায়—'সুন্দর অসুন্দরের মাপকাঠি তিনি মানলেন না, প্রেমের দৃষ্টিতে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদাভেদ নেই ; প্রেম অসুন্দরকেও সুন্দর করে।'

না, হঠাৎ কেবল ভাবে অবশ হয়ে পড়বার কথা নয়। প্রেমের দৃষ্টি চিরকাল একই রকম! সুন্দর-অসুন্দরের চিরনির্ভরযোগ্য মাপকাঠি যদি কিছু থাকেও বা, তাহলে সে মাপকাঠি প্রেমেরই করতলগত। প্রেম-দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সুন্দরের বোধ জাগে, নাকি সুন্দরকে দেখলে প্রেমের অনুভূতি দেখা দেয়, সে বিতর্ক আপাততঃ স্থগিত রাখা যেতে পারে। কারণ, একথা স্বতঃসিদ্ধের মতন স্পষ্ট যে, মানুষ যাকে ভালোবাসে, তাকে নিজের সৌন্দর্যবোধ দিয়েই গ্রহণ করে থাকে। প্রেমই যথার্থ দৃষ্টি! পূর্ণ দৃষ্টিতেই জগৎকে সুন্দর বলে চেনা যায়!

তবু মানুষ বড়োই সীমাবদ্ধ। বিশেষ পরিবারে, বিশেষ সমাজে, বিশেষ বিশেষ আচার, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের মধ্যেই এক-একটি মন এসে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যেসব অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিণতির পথ তৈরি হয়েছিল, সেই ক্ষেত্র থেকেই তিনি তাঁর জগৎকে দেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ভাবেই নিজের স্বাধিষ্ঠানভূমি থেকে জীবন উপলব্ধি করেছিলেন। অর্থাৎ

নিজের নিজের অভিজ্ঞতার ওপরেই সৎ সাহিত্যিকের সাহিত্য নির্ভর করে। শরৎচন্দ্রও ছিলেন স্বকীয় অভিজ্ঞতার মানুষ। তাই তাঁর অন্য ভাব, তাই তাঁর অন্য জগৎ! সাহিত্যিকের মনের প্রকৃতি তাঁর অর্জিত সত্যবোধেরই আনুষঙ্গিক ভাবনা!

তেরশ' একচল্লিশ সালের 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে' শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব 'সত্য-বোধের' কথা বলেছিলেন। তারাশঙ্করের কথাও সেই রকম। তাই শরৎচন্দ্রের কথাগুলি এখানে প্রাসঙ্গিক এবং স্মরণীয়:

> 'সাহিত্যের ব্যাপারে গোড়া থেকেই বলেছি যেন আমি কখন মিথ্যার আশ্রয় না নি। অবশ্য সত্যি জিনিসটাই সাহিত্য নয়। সংসারে অনেক ব্যাপার আছে যা সত্যি কিন্তু সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সত্যিটা যেন বনেদের মত মাটির নীচে থাকে এবং তা হলে তার উপর যে সৌধটা গড়ে তুলবো কল্পনা দিয়ে—সেটা সহজে ডুবে যাবে না।'

তারাশঙ্করের সত্য-বোধ সম্বন্ধে আলোচনার ধারায় জগদীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের পরে শরৎচন্দ্রের কথা তুলে শরৎচন্দ্রের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদাভেদহীন, বা সমস্ত বৈষম্যের উর্দ্ধগামী প্রেমের উপলব্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই পুর্ব-প্রস্তাব মেনে নিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন: 'যে প্রেমকে মহিমান্বিত করে শরৎচন্দ্রের জীবনকল্পনা, আধুনিক যুগ সে প্রেমেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেলে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে। যে দুটি আদিম প্রবৃত্তির বশে মানুষের জীবজীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তার সমস্ত সুখদুঃখ ও আচার আচরণের মূলে সেই প্রবৃত্তিদ্বয়ের বিশ্লেষণ মুখ্য হয়ে উঠল এ যুগের সাহিত্যে।'

এও অস্পষ্ট কথা। 'প্রবৃত্তিদ্বয়' মানে কি? দুটি প্রবৃত্তি কি কি? জগদীশবাবু 'দুই' সংখ্যাটি খুলে বলেন নি। তিনি কি আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধির কথা বলতে চেয়েছিলেন? না-কি কাম আর ভয়? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের অভিধানে 'প্রবৃত্তি' কথাটির মানে দেওয়া হয়েছে—ইচ্ছা, প্রবণতা, ঝোঁক এবং গতি। এ ছাড়া আরো মানে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সে-সব অর্থ অবান্তর। 'প্রবৃত্তিমার্গ' বললে সংসারাসক্তির কথা বোঝায়। কিন্তু 'প্রবৃত্তি' কথাটির সঙ্গে বিশেষ কোনো সংখ্যা জুড়ে দিলে প্রবৃত্তির বিবিধত্বের ধারণা মনে আসে। জগদীশবাবু যখন বলেছেন,—'তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রবৃত্তিই

মানুষের নিয়তি', তখন সে মন্তব্যের অর্থবোধে অসুবিধা হয় না। কিন্তু 'দুই প্রবৃত্তি' বললে ব্যাখ্যার দরকার হয়।

তিনি আরো বলেছেন যে, 'শরৎচন্দ্রের জীবনে রাধিকামূর্তিরই আরাধনা, তারাশঙ্করের আরাধ্যা জীবনের নগ্নিকা কালিকামূর্তি।' এটি তাঁর আলোচনার একটি বিশেষ পর্বের শেষ কথা। শেষ কথায় চূড়ান্ত ভাবে একটি বিশেষ ঝোঁক ধরা পড়েছে। এর অব্যবহিত আগের কয়েকটি বাক্যে তিনি বলেছিলেন: 'শরৎচন্দ্র কেবল কোমল, কেবল মধুর। জীবনের রসতীর্থে তিনি বৈষ্ণবপন্থী। তাই বাৎসল্য ও মধুর রসই তাঁর সাহিত্যের মুখ্য রস। তারাশঙ্করে চিত্তবৃত্তি নয়, মানুষের ধাতু-প্রবৃত্তিরই দুর্দমনীয় বিকাশ। তাই তাঁর রচনায় মধুর ও করুণ রসের সঙ্গে রৌদ্র, ভয়ানক এমন কি বীভৎস রসও সমান মর্যাদা পেয়েছে।'

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এ মন্তব্য মেনে নিতে জোর পাওয়া যায় না। তবে, তারাশঙ্কর সম্বন্ধে 'ধাতু-প্রবৃত্তি' কথাটা এখানে অধ্যাপকের অভিপ্রায়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করেছে। 'চিত্তবৃত্তি'র দ্বারা যা শাসিত নয়,—চিত্তেরই গভীরে যা দুর্মর, অকাট্য, নিহিত, অনিবার্য অথবা অনাক্রান্ত, সেই elemental passionকেই তিনি বোধ হয় তারাশঙ্করের জীবনসত্যবোধ বলতে চান।

অতঃপর 'দুই' সংখ্যাটির রহস্য ভেদ করা যেতে পারে। প্রথম জীবনে তারাশঙ্কর তাঁর 'তারিণী মাঝি' গল্পটি লিখেছিলেন। তাতে প্রেমের প্রবৃত্তিকে স্থূল আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির কাছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হতে দেখা গিয়েছিল। উত্তরকালে তিনিই আবার প্রেমের ততোধিক বলিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন আরো কোনো কোনো লেখাতে। একদিকে প্রেম, অন্যদিকে আত্মরক্ষা—এই দুটিকে তবু 'দুই প্রবৃত্তি' বলা ঠিক হবে না। কারণ, 'প্রেম' মানেই আত্মবিসর্জন! মূলে দুই নয়,—মূলে একই! তারাশঙ্কর অল্প বয়সে জীবন-সত্যের যে ধারণাই প্রকাশ করে থাকুন না কেন, পরিণত জীবনে নিজের কীর্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি যখন এ-বিষয়ে তাঁর মনের কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তখন তাঁকে এই অদ্বৈত সত্যের কথাই বলতে শোনা গেছে। ১৯৫৬ সালে এশিয়া-লেখক-সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণের মধ্যে তিনি জানিয়েছিলেন—'ভারতবর্ষ আত্মাকে মানে, চিরকাল সে তার তপস্যা করেছে, তাই তার জড়তা এলেও সে মরে না—

জড়তা-জীর্ণ দেহে আঘাত করলে নব কলেবরে সে অভ্যুদিত হয়। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের প্রাণধারার উৎসমূলে একটি একাত্মতা আছে।' রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করে,— গান্ধীজীর সাধনার কথা মনে রেখে—একালের 'পঞ্চশীল'-এর আদর্শ উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্যকে তিনি কেবল সভাশোভন আড়ম্বর দেবার চেষ্টা করেছিলেন বলে ভেবে নেওয়াটা হঠকারিতা। কারণ, তারাশঙ্কর সত্যিই ঐতিহ্যবাদী,—সত্যিই তিনি প্রেমে বিশ্বাস করেন,—এবং একালে বিশুদ্ধ মানবতার আদর্শনিষ্ঠাকে যতোই সেকেলে বলা হোক না কেন, তারাশঙ্কর সত্যিই মনে মনে তিনটি নামের উপাসক। প্রথম—ভারতবর্ষ, দ্বিতীয়— গৌতম বুদ্ধ, এবং তৃতীয়—মহাত্মা গান্ধী!

এই মতামত, যুক্তি-তর্ক এবং বিশ্লেষণের পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে এ-কথা অনুভব করতেই হয় যে, সমকালীন সাহিত্যের আস্বাদন যদিও বা সম্ভব, তবু তার সমালোচনা সত্যিই দুরূহ দায়িত্ব। স্বদেশের, সমসাময়িক লেখকের সৃষ্টি যথেষ্ট দূরত্বে স্থাপন করে দেখা দরকার। স্বদেশের সমকালীন পাঠকের গ্রাহিকা-শক্তির সীমা বা সংকোচের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে বিশদভাবে বলে গেছেন। সত্তর বছর বয়সে তিনি লিখেছিলেন: 'নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগদ্বেষের ধূলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে দূরত্ব অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি-বিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে দেশের লোকের চোখের সামনে, সেই দূরত্ব দুর্লভ।'

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ না হোক, বিস্তৃত আলোচনা এর আগেই বেরিয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে এখনো সে-রকম কোনো পৃথক বই বেরোয়নি বটে, তবে অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ দেখা গেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা বনফুল বা একালের অন্য কোনো কথাসাহিত্যিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার অভিপ্রায় মনে এলে রবীন্দ্রনাথের কথাই আবার মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন: 'মুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ করে ধরে; তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ, যথার্থ পরিচয় দেখে না।'

॥ প্রথম প্রবেশ ॥

সাহিত্যের বাহন অবলম্বন করে তারাশঙ্কর তাঁর যে সত্যবোধ প্রকাশ করেছেন, কথার সাহায্যে সেই সত্যকে সম্পূর্ণভাবে অধিগত করে দেখানো শক্ত কাজ। যা আমাদের বাস্তব আচরণ, এবং যা আমাদের আদর্শ অভিপ্রায়, এই দুইয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগে বাস করে মনোধর্মময় মানুষের মনে জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা দেখা দেয়, সেটাই তার 'সত্য'! সেটা অংশতঃ বাস্তব, অংশতঃ কল্পনা! তারাশঙ্করের সত্য-বোধ সম্বন্ধে তাই তাঁর নিজের কথা মনে রাখা দরকার। তের শ' পঁয়ষট্টি সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যার 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ থেকে এ-বিষয়ে তাঁর নিজের কথা তুলে দেওয়া গেল :

> 'মানুষ জন্মায় বাস্তবে। প্রবৃত্তি প্রকৃতির দাবী ও অনুশাসনের নির্দেশই সেখানে সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু বাস্তবে সে বাঁচে না। বাঁচে সে কল্পনায়—সে কল্পনা অসংকলুষহীন সৎপ্রকাশের কল্পনা। সেই কল্পনার রূপায়ণের কর্মেই কাটে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আয়ুষ্কাল। যে জীবনে এই কল্পনার রূপায়ণ সার্থক হয়ে ওঠে সেখানে মৃত্যু মৃত্যু নয়, নির্বাণ। ···শাস্ত্রে বলেছে চলাই জীবন। সে চলা এই চলা। সম্মুখে চলা। অমৃতের সন্ধানে চলা। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের ইতিহাসের মর্মকথা এই পথ চলার কথা। তাতে অগ্রগতি এবং পশ্চাদ্‌গতি দুই গতির কথাই আছে। সৎ এবং অসৎ দুইয়ের জয় পরাজয়ের কথাই রয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। অনাবিষ্কৃত মানব-ইতিহাসের অধ্যায়গুলি আছে মাটির তলায়। কিন্তু সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারার মধ্যে অর্থাৎ শিল্প-সংগীত-সাহিত্যে যা অবিনশ্বরত্ব লাভ করেছে, যা পুরাতন হয়েও নূতনের মধ্যে বেঁচে আছে, তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বাস্তবের পটভূমিতে সত্যের জ্যোতিষ্মান কল্পনা সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই সে অমৃতত্ব লাভ করেছে। তাই সে বেঁচে আছে। যা

এ অমৃত লাভ করেনি—মানুষ তাকে ফেলে দিয়েছে আবর্জনাস্তূপে।
ঐতিহাসিকের অনুসন্ধান সর্বত্র। আবর্জানস্তূপ থেকেও এমন
অনেক নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করেছেন—কিন্তু সে সংগ্রহ তথ্য ও তত্ত্ব
উদ্ঘাটনের জন্য; সাধারণের মধ্যে প্রকাশের জন্য নয়।'

তবু ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেই হোক, আর রাষ্ট্র বা সমাজ বা জাতি-জীবনের বিচারেই হোক,—বাস্তবে ব্যক্ত আচরণের মধ্য দিয়েই নিহিত ধ্যান-ধারণার দিকে সমালোচককে এগিয়ে যেতে হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের প্রথম প্রবেশের প্রায় বছর পাঁচ-ছয় পরের একটি ঘটনা এই সূত্রে মনে এলো। তখন 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার আপিষে সাহিত্যিকদের এক আসর বসতো। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচিত্রণ'[২]-এর মধ্যে জানিয়েছেন যে, উনিশ-শ' বত্রিশ থেকে উনিশ-শ' ছত্রিশের মাঝামাঝি, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন বছর 'বঙ্গশ্রী'র সেই সংস্কৃতি-বৈঠক চলেছিল। ধর্মতলা স্ট্রীটের সেই আসরে যাঁরা প্রায়ই, কিংবা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর অরবিন্দ দত্ত, রামচন্দ্র অধিকারী, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, নলিনীকান্ত সরকার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পী যামিনী রায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ ব), শিল্পী অতুল বসু, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, হরিপদ রায়, কিরণকুমার রায়, বাসব ঠাকুর, সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেকের নামই পরিমলবাবু উল্লেখ করেছেন। সজনীকান্ত দাস ছিলেন সে-আসরের উদার বন্ধু, পরিমল গোস্বামী সে-আসরের নিয়মিত সদস্য। কীটতত্ত্ববিদ্ গোপালচন্দ্র

২। প্রজ্ঞা-প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৫। পৃঃ ২৩৮-২৪৮ দ্রষ্টব্য।

ভট্টাচার্যও সেখানে যেতেন,—বনফুলও, তারাশঙ্করও। তারাশঙ্কর সম্বন্ধে সেই আসরের অন্যতম উৎসাহী সদস্য শ্রীপ্রমথনাথ বিশী একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাতে সেকালের তারাশঙ্করের চমৎকার একটি রেখাচিত্র পাওয়া যাচ্ছে :

মফঃসল হ'তে কার চলে যাওয়া-আসা
কলমে অলম্ নাহি; মুখে নাহি ভাষা।
কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
না পড়িয়া উপন্যাস কন্‌তিনাতাল।
রাই-কমলের মুখ (কুয়াশা-মলিন)
ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট কার দেহখানি ক্ষীণ।
নাম নাই করিলাম। (নাহি মেলে ছন্দে)
সকলেই জানে তারে খ্যাতির সুগন্ধে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর এই কবিতা উল্লেখ করে পরিমলবাবু লিখেছেন : 'তারাশঙ্করের তখনকার পরিচয়টি এতে পাওয়া যাবে। তবে এই রাইকমলের যুগে অতি চমকপ্রদ ছোটগল্প লেখাও চলছে একের পর এক। তাঁর সুবিখ্যাত জলসাঘর প্রভৃতি এই সময়েই লেখা।'

য়ুরোপের সাহিত্য না পড়ার জন্যে লজ্জা তো নয়, বরং বিশেষ গৌরববোধ ছিল 'কল্লোল'-পর্বের তারাশঙ্করের মনে। তার সবটাই কিন্তু সেকালের নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিকদের য়ুরোপ-অনুরাগের প্রতিক্রিয়া নয়। কতকটা তাঁর নিজস্ব স্বভাব, কতকটা প্রতিক্রিয়া! 'প্রতিক্রিয়া' এই জন্যে যে, কল্লোল-দলের অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ইত্যাদি সকলেই ছিলেন কন্টিনেন্ট্যাল সাহিত্যের গুণগ্রাহী এবং সেই প্রভাবেরই আশ্রিত। আর, 'কল্লোলে'র আড্ডায় তিনি ঠিক গৃহীত হননি বলে মনে বিশ্বাস জাগবার কারণ ঘটেছিল তারাশঙ্করের! সে-অবস্থা সম্যকভাবে বুঝতে হলে তাঁর সেকালের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক অবস্থার কথা আরো বিশদভাবে লক্ষ্য করা দরকার। অতএব ইতিপুর্বে এ-বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় যে কথাটা স্থগিত ছিল, এখানে সেই প্রসঙ্গটি পুনরায় উত্থাপন করা যেতে পারে।

তাঁর জন্ম হয় তেরশ' পাঁচ সালের ৮ই শ্রাবণ, সুর্যোদয়ের ঠিক পুর্বলগ্নে। কিন্তু শাস্ত্রমতে তাঁর জন্মদিন ধরা হয় ৭ই শ্রাবণ। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে

তিনি নিজে লিখেছেন : 'আমাদের অঞ্চলে বলে, ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য উদিত হননি, তার লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময়ে আমার জন্ম ব'লে শাস্ত্র মতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ।' ৩

খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে সে ছিল ১৮৯৮।

লাভপুরের সমাজে তখন প্রবল দুই বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ চলেছে।৪ গ্রামটি ছিল জমিদার-প্রধান। জমিদাররা ছিলেন সরকার-বংশ। তাঁর নিজের কথায়—'তাঁরা তখন বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর উঠেছে আরও দুটি বংশ, ওই সরকারবাবুদেরই দৌহিত্র-বংশ। এদের এক বংশ হ'ল আমার পিতৃবংশ, দ্বিতীয়টি অন্য এক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় বংশই তখন গ্রামের মধ্যে প্রধান। ঠিক এই সময়ে গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান, ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা-ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে, শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন।'

এই ব্যবসায়ী, আর জমিদার-পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই লাভপুরে শাক্ত আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা ছিলেন বৈষ্ণব, জমিদারদল শাক্ত। জমিদারবংশ গ্রামে মাইনর স্কুল বসিয়েছিলেন, ব্যবসায়ীরা আনলেন হাই-স্কুল। গ্রামের ফুল্লরা দেবীর পুরোনো মন্দির ভেঙে নতুন মন্দির করে দিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা; জমিদাররা সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সামনে দীঘির ঘাট বাঁধিয়ে দেন। জমিদারবাড়িতে মহা সমারোহে জগদ্ধাত্রী পুজা হয়; ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠা হোলো। রাম-যাত্রাতে তাঁরাও সমারোহ দেখিয়ে দিলেন। এই ব্যবসায়ীর বাড়িতেই রাসের সময়ে মাসখানেক ধরে ভাগবতের কথকতা হোতো, যাত্রা হোতো। রাসপূর্ণিমার পর দিন মশালে মশালে আকাশ রাঙা করে, মিছিলের মধ্যে আসাসোঁটাধারী বরকন্দাজের সঙ্গে বিগ্রহ যেতেন বনভোজনে। বাজি পুড়তো, লাঠিখেলা হোতো, সাঁওতালরা নাচতো। পুজা-পার্বণে খেমটা নাচ হোতো জমিদার এবং ব্যবসায়ী দুই পরিবারেই। ব্যবসায়ীদের রাসের বাড়িতে একবার প্রসিদ্ধ

৩। 'আমার কালের কথা' (দ্বিতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩) পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ পৃঃ ৫-৭ দ্রষ্টব্য।

গাওনের দলের নীলকণ্ঠের দুই ভাই শ্রীকান্ত আর সিতিকণ্ঠ এসেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণযাত্রায় তখন যুবজনের আগ্রহ কমতে আরম্ভ করেছে। যুবকের দল 'হরিবোল' দিয়ে যাত্রার আসর ভেঙে দেন। 'কণ্ঠের' দল তাতে অপমানিত হয়ে ফিরে যান। কিন্তু পরের বছর কণ্ঠমশাই অর্থাৎ নীলকণ্ঠ নিজে এলেন তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে। এসে লাভপুরের হৃদয় জয় করে ফিরে গেলেন।

নতুন ফ্যাশানকে স্তব্ধ করে দেবার এই বনেদী ক্ষমতা সম্বন্ধে তারাশঙ্করের শ্রদ্ধাবোধ তাঁর নিজের ঐ একই আত্মকথাতে ব্যক্ত হয়েছে।[৫] হয়তো সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম পর্বে 'কল্লোলের' কন্‌টিনেণ্ট্যাল সাহিত্য-অনুরাগের ফ্যাশান সম্বন্ধে, তাঁর মধ্যে ফল্গুধারার মতন এই নীলকণ্ঠ-মনোভাবই গোপনে কাজ করে থাকবে। 'নীলকণ্ঠ' নামটি তাঁর প্রথম পর্বের একখানি উপন্যাসের শিরোনাম হিসেবেও দেখা দিয়েছে। কিংবা সে হয়তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। হয়তো এই সাদৃশ্যটা নিতান্তই কাকতালীয় সংযোগ। যাই হোক, সে লেখাটি প্রথম তেরশ' উনচল্লিশে 'উপাসনা' পত্রিকায় 'যোগ-বিয়োগ' নামে ছাপা হয়। পরে সে নাম বদলে নতুন নাম রাখা হয়েছিল 'নীলকণ্ঠ'। তাঁর প্রিয় সুহৃদ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বইখানি উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গের তারিখ ছিল আশ্বিন, ১৩৪০।

তারাশঙ্করের পিতামহেরা ছিলেন দুই ভাই। দু'জনেই ছিলেন সিউড়ির উকিল। এঁদের মধ্যে ছোট যিনি, তিনিই তাঁর নিজের পিতামহ। তাঁর তিন বিবাহ। দ্বিতীয় বিবাহ যখন হয়, তখন তাঁর বয়স বাহান্ন-তিপ্পান্নো। সে ঘটনার দশ-এগারো মাসের মধ্যেই প্রথমার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর বছর-খানেক পরে তারাশঙ্করের পিতা জন্ম গ্রহণ করেন এবং চার-পাঁচ বছর বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। তারাশঙ্করের পিতামহ চুরাশি বছর বয়সে কাশীতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। সে অনেক পরের ঘটনা। পিতা যথাকালে সিউড়ি জেলা-ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ১২৮৬ সালে, ষোলো বছর বয়সে, গ্রীষ্মের ছুটিতে লাভপুরে এসে, মঙ্গলডিহি গ্রামে কোনো এক 'নবীন ভাইপো'র বিবাহ উপলক্ষে কয়েক দিন আটকে পড়েছিলেন বলেই ইস্কুলে ফিরে যেতে তাঁর দেরি হয়ে যায়। তাতে গদাই গরাঞী নামে ইস্কুলের একজন মাষ্টারমশাইয়ের মনে সন্দেহ হয় যে, তাঁর এই কুলীন ব্রাহ্মণ ছাত্রটি ফাল্গুন মাসে তো একটি

৫। ঐ পৃঃ ৯-১০ দ্রষ্টব্য।

বিবাহ করেইছে, জ্যৈষ্ঠেও বুঝি আর-একবার পাণিগ্রহণে ব্যস্ত ছিল! ফলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু হয়। সেই বিদ্রূপে বিপর্যস্ত হয়ে তারাশঙ্করের পিতা ইস্কুল পরিত্যাগ করেন। তারাশঙ্কর নিজেই এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর পিতার বিষয়ে এমন দুটি দরকারী খবর জানিয়েছেন, যা,—তাঁরই কথায়, তাঁর নিজের 'জীবনের পটভূমি' নির্ণয়ের সহায়ক।

প্রথমতঃ পড়াশোনায় পিতার 'বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর' এবং তিনি ইস্কুলে লেখাপড়া না করলেও, পরে, ঘরে যথেষ্ট শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি নিজে 'নিয়মিতভাবে সেকালে নিজের ডায়রী রেখে গেছেন'। তাঁর এই দিনলিপি থেকেই জানা যায় যে, বাংলা তেরশ' দশ সালের ৮ই মাঘ, সরস্বতী পুজার দিনে বালক-তারাশঙ্করের মনে যথার্থ ভক্তিভাব দেখা গিয়েছিল। সে-কথাটা পাঠক-সাধারণের কাছে যতোই তুচ্ছ মনে হোক্ না কেন, পরিণত বয়সে নিজের আত্মকথা লিখতে বসে তারাশঙ্কর নিজে সেটি উল্লেখ করতে ভোলেন নি!

তাঁদের বাড়িতে তখন সাপ্তাহিক 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' এবং মাসিক 'হিন্দু' পত্রিকা নেওয়া হোতো। পিতার অধ্যয়নের বিষয় ছিল এই সব পত্র-পত্রিকা এবং এ ছাড়া ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন তন্ত্রের বই, —কালিদাসের কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস,—মহানির্বাণতন্ত্র, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ! তারাশঙ্কর জানিয়েছেন: 'মোট কথা—বাস্তব সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি মর্মান্তিক পরাজয়ের ক্ষোভ বহনের দুঃখকে স্বীকার করেই জীবনতত্ত্বের রহস্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি এবং দৃষ্টি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মারা যান অল্প বয়সে। আমার বয়স তখন আট বৎসর। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করে গিয়েছে।'

পিতার ডায়ারি সম্বন্ধে তাঁর মনে বেশ একটু মহিমাবোধ আছে। সেকালে আত্মকথা লেখবার বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যে তাঁর পিতার এই রচনার কথা উল্লেখ করে তিনি আরো লিখেছেন: 'আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে কীর্ণাহার। সেখানকার জমিদার স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার মহাশয় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু, পুণ্যাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈবাহিক। তিনি আমার পিতামহের বয়সী। তিনি ডায়রী রাখতেন। বোধ হয় আমাদের অঞ্চলে ডায়রী-লেখক হিসাবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি।'

তারাশঙ্করের জননী পাটনা শহরের প্রবাসী বাঙালী ঘরের মেয়ে। মাতামহ ছিলেন ইংরিজীনবিস সরকারী চাকুরে। মায়ের সম্বন্ধে এক কথায় তাঁর মন্তব্য—'প্রতিভাময়ী'। এবং এ বিষয়ে তাঁর নিজের কথা থেকেই আরো কয়েকটি তথ্য জানা দরকার :

'তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে। তখনও পিতার এক পুত্র আমার বাবা মদ্যপানে মাত্রা ছাড়ান, ক্রোধে আত্মহারা হন। আমার পিসিমা একদিনে স্বামীপুত্র হারানোর বেদনায় ক্ষোভে অধীর-চিত্ত, অসহিষ্ণু প্রকৃতি, অনির্বাণ চিতার মত উত্তপ্ত।...

...পনেরো বছরের মেয়েটি বাড়িতে পা দেবামাত্র গোটা বাড়িটার চেহারা ফিরে গেল। বাবার সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমময় গাম্ভীর্যে পরিণত হ'ল ; পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনামগ্ন হলেন।...পিসিমা সেবায় স্নেহে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এলেন। বাড়ির শ্রী ফিরল। নিজের রুচিমত তিনি ঘরগুলি সাজালেন। ৬

তখন তাঁর বাবার বয়স সাতাশ, মায়ের পনেরো।

মায়ের নির্ভয় প্রকৃতির কথাও তিনি বলেছেন,—তা'ছাড়া মায়ের গল্প বলার নৈপুণ্যের কথা,—এবং দেশপ্রেমের কথাও। মাতুল পরিবারের এই শেষ দিকটি তিনি একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন :

'আমার বড় মামার মধ্যে মানিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল। পরবর্তীকালে আমার মেজমামা—তিনি আমার থেকে চার পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন—তিনি উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদলের দলভুক্ত হয়েছিলেন। অকালে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্লেগ রোগে মারা যান। পরে বেনারস কন্‌স্‌পিরেসি কেসে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে—তাঁর পরবর্তী ছোট ভাইকে তাতে সাক্ষ্যও দিতে হয়েছে।'

৬। ঐ পৃঃ ২৪-২৫ দ্রষ্টব্য।

রাখীবন্ধনের দিন তাঁর বড় মামা ছিলেন তাঁদেরই লাভপুরের বাড়িতে। তিনি তাঁর বোনের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন,—এবং সেই বোন আবার নিজের সন্তানের হাতে আর একটি রাখী বেঁধে দেন। 'ধাত্রীদেবতা'য় এই ব্যক্তিগত ঘটনারই ছায়া পড়েছিল।

ছেলেবেলায় দেওঘরের দেবতা বৈদ্যনাথের কাছে তারাশঙ্করের চুল মানত রাখা হয়। সেজন্যে তাঁর লজ্জা ছিল,—কুণ্ঠা ছিল অপরিসীম। তাঁর পিসিমা তো এক বছরের জন্যে নিজের ডান হাতটিই মানত রেখেছিলেন! দেবতাকে ডান হাত দিয়ে ফেলে, সংসারের সব কাজ তখন তিনি বাঁ হাতে করতেন।

সেই সুদূরকালের সমাজবন্ধন, দেশপ্রেম, তীর্থভ্রমণ, আচারপালন, বিলাস-ব্যসন,—রাঢ়ের একান্নবর্তী পারিবারিক জীবন,—পুরুষের দাপট, মেয়েদের ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি প্রসঙ্গের কথকতায় তারাশঙ্কর আজও অনুরাগী! এসব কথা তাঁর রক্তস্রোতের মধ্যে মিশে আছে। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নাগরিকতা তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত ছিল বললে অন্যায় হয় না। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন বটে,—'দল যাই হোক, 'কল্লোল' যে উদার ও গুণগ্রাহী তাতে সন্দেহ কি। নবীন-প্রবীণ ও রসবুদ্ধিসম্পন্ন বলেই তারাশঙ্করকে স্থান দিয়েছিল, দিয়েছিল বিপুল-বহুল হবার প্রেরণা। সেদিন 'কল্লোলের' আহ্বান না এসে পৌছুলে আরো অনেক লেখকেরই মত তারাশঙ্করও হয়তো নিদ্রা-নিমীলিত থাকতো।'[৭] কিন্তু 'কল্লোল'-এর সঙ্গে সত্যিই তাঁর প্রকৃতির সাধর্ম্য ছিলো না। তাঁর আত্মকথা পর্যায়ের লেখাগুলি পড়তে পড়তে রুশো, টলস্টয়ের নাম মনে আসে। তারাশঙ্কর তখনো সত্যিই মার্জিত নাগরিক ছিলেন না! পিতার দিনলিপি থেকে পিতার একথাও তিনি তুলে দিতে কুণ্ঠিত হননি যে, 'লাভপুরে আসিয়া—লোকের সংসর্গে আসিয়া অল্প বয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল।' দুর্গাপুজা উপলক্ষে বৃদ্ধবয়সেও পিতামহের উপবাস, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি খুবই উদ্দীপনা বোধ করেছেন। তাঁদের জমিদারবংশেরই অন্য এক সরিক কুলদাপ্রসাদের বিষয়াসক্তি অথবা ভোগবিলাসের কথা বলতে তাঁর আগ্রহের অন্ত থাকে

৭। 'কল্লোল যুগ' : দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৫৮, পৃঃ ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

না,—আবার তাঁর সংযম, তিতিক্ষা, সম্ভ্রমবোধের উদাহরণ দিতে গিয়েও শ্রদ্ধায় তিনি অভিভূত বোধ করেন। সেকালের বাঙালী জীবনের এই বিশেষ মূল্যবোধ তাঁর মনে রেখে গেছে চিরস্থায়ী স্মৃতি। সেই সঙ্গে সেকালের এই সব ছোট-বড়ো জমিদারপরিবারের ভাষাও তিনি যেন ভুলতে চান না। পরিণত জীবনে, কলকাতার নাগরিক সমৃদ্ধির আবহাওয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও তিনি তা ভুলতে পারেন নি! এ বিষয়ে তাঁর নিজের কথাগুলিই আবার মনে আসছে:

> 'সেকালের এই ধর্মাশ্রয়ী মানুষদের ভাষা ছিল বড় মধুর। বড় মিষ্ট। তেমনি ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা। আজকের দিনের ভাষা সে দিনের ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত—দীপ্তিতে তীক্ষ্ণতায় ব্যঞ্জনা-মহিমায়, প্রকাশ-শক্তিতে অপরূপ, মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে যায়, ক্ষেত্র বিশেষে বীণার সপ্ত তারে ঝঙ্কার তোলে; কিন্তু মিষ্টতায় সেদিনের ভাষা ছিল বড় মধুর।'[৮]

গ্রামের প্রবল পক্ষের সঙ্গে বিরোধিতার ফলে তারাশঙ্করের পিতা একবার অপমানিত হন। সেজন্যে দেওঘর-তীর্থে গিয়ে ছেলের সাক্ষাতেই দেবতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—'রাজার হুকুমে এই অপমান, এর প্রতিকার তুমি ভিন্ন আর কে করতে পারে? হে দেবাদিদেব! হে আশুতোষ!'

এই ঘটনারই কথাপ্রসঙ্গে পরিণত বয়সে তারাশঙ্কর লিখেছেন:

> 'আমার চোখেও জল এসেছিল। তারই প্রভাব আমার জীবনে কাজ করেছে। রাজার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাব এইভাবে সৃষ্টি হ'ল তার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এরই মধ্যে হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ।
>
> অপর প্রভাব এই দেবভক্তিই বলি, আধ্যাত্মিকতাই বলি, নীতিবাদই বলি তার প্রভাব। একটি গভীর অজ্ঞাত অনুশাসন আমি অনুভব করি; মানব-হৃদয়ের এই অনুশাসনের একটি

৮। 'আমার কালের কথা' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৩) পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য।

বেদনাময় আকুতি আমার আছে। এ দুর্বলতা হলে আমি দুর্বল। পরাজয় হলে আমি পরাজিত।'[৯]

'কল্লোলের' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বা অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র বা মণীশ ঘটক বা অন্য কারো মনেই এই জমিদার-ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব ছিলনা,—শাক্ত-বৈষ্ণব সংঘর্ষের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁরা ধর্মাচারের বাস্তব রূপটা এতো কাছ থেকে দেখবার সুযোগই পান নি,—বা তা পেলেও, তাঁদের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মূলে তা কোনো স্মরণীয় প্রেরণা রেখে যায়নি। টাকা-পয়সার অভাব ছিল তাঁদের। কিন্তু আমাদের এই সাধারণের সংসারে বিশেষভাবে তরুণ বয়সের জন্যে সে-অভাববোধ কোন্ যুগেই বা না থাকে? অভিভাবকের দাক্ষিণ্যের ওপর যতোদিন নির্ভর করতে হয়, ততোদিন অভিভাবকের সামর্থ্য এবং তাঁদের অনুমোদনের সীমার মধ্যেই তো থাকতে হয়!

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন 'কল্লোলের' বীজমন্ত্রের মতন। অচিন্ত্যকুমার তাঁকে, 'কল্লোল' ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্বের সম্মান দিয়েছেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিকে ভাবানুরাগী'।[১০] আরো সোজাসুজি বলা হয়েছে: 'বস্তুত কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই, বিহ্বল ভাববিলাস'। আবার এরই কয়েক লাইন পরে তিনি লিখেছেন:

'যাকে বলে 'ম্যালাডি অফ দি এজ' বা যুগের যন্ত্রণা তা 'কল্লোলের' মুখে স্পষ্টরেখায় উৎকীর্ণ। আগে এর প্রচ্ছদপটে দেখেছি একটি নিঃসম্বল ভাবুক যুবকের ছবি, সমুদ্র-পারে নিঃশব্দ ঔদাস্যে বসে আছে—ফেন-উত্তাল তরঙ্গশৃঙ্গটা তার থেকে তখনও অনেক দূরে। তেরোশ' একত্রিশের আশ্বিনে সে-সমুদ্র একেবারে তীর গ্রাস করে এগিয়ে এসেছে, তরঙ্গতরল বিশাল উল্লাসে ভেঙ্গে ফেলছে পুরোনো না পোড়ো মন্দিরের বনিয়াদ। এই দুই ভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল 'কল্লোলে'। কখনো উন্মত্ত, কখনো

৯। ঐ পৃঃ ৬৭ দ্রষ্টব্য।

১০। 'কল্লোল যুগ': পৃঃ ১০৭-১০৮ দ্রষ্টব্য।

উন্মনা। কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবনবিতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র। ভাবে শেলীয়ান, কর্মে হ্যামলেটিশ।'[১১]

অন্যপক্ষে তারাশঙ্কর কিন্তু টুর্গেনিভ, শেলী বা হ্যামলেটের অনুষঙ্গ-খচিত এই ধরনের বাক্‌বিভূতিতে অভ্যস্ত তো ছিলেনই না, সাহিত্যের আসরে এসে প্রথম তিনি যখন এইসব চিন্তা-রীতির সন্নিহিত হলেন, তখন তাঁর মনে বিপরীত ভাবনা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, তিনিও সত্যিকার প্রতিভা নিয়ে আসরে প্রবেশ করেছিলেন। নিজের জীবনবোধের সঙ্গে কলকাতার এই উগ্র, 'আধুনিক', জীবনবিতৃষ্ণাবাদী, পশ্চিম-ঘেঁষা, নাগরিক-দলের জীবনবোধের বৈষম্য দেখে তাঁর মনে তখন প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াই প্রত্যাশিত। সে প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। 'সপ্তপদীতে' (প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬৪ ; তার আগে ১৩৫৬-র শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) এসে তিনি ফিরিঙ্গী সমাজের দিকে যখন চোখ ফিরিয়েছেন, তখন আগেকার সেই অবিশ্বাসই যেন অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

লাভপুরের সমাজ কলকাতার সমাজ নয়। শেলি, টুর্গেনিভ বা শেক্‌স্‌পীয়র চর্চার কোনো হাওয়াই ছিলনা সেখানে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন অন্য জগৎ। তাঁর নিজের কথায় : 'সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।'[১২]

সে-আমলের কথা-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করবাবুকে আমি নিজে একদিন জিগেস করেছিলুম, 'আপনাদের আয় কত ছিল'?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'বছরে হাজার পাঁচেক টাকা।'

পরের বৃত্তান্ত তাঁর ছাপা বই থেকেই পাওয়া যাচ্ছে :

'অল্প চার-পাঁচ হাজার টাকা আয়ে রাজার হালে চলে যেত। আমার নিজের যখন বারো-চোদ্দ বছর বয়স তখন হাটখরচা আমার মনে আছে—সপ্তাহে দু'দিন হাটে তরকারির খরচ ছিল—ছ' আনা

১১। ঐ পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য।

১২। 'আমার কালের কথা' : পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য।

> হিসেবে বারো আনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর খরচটা বাড়লো—বারো আনা থেকে আঠার আনা পাঁচ সিকেতে পৌছল। আমাদের বাড়ির মুদীর দোকানের খরচ ছিল বছরে একশো টাকা। কোন বছর দশ টাকা কম, কোন বছর পাঁচ টাকা। বছরে দুবার কাপড় কেনার ব্যবস্থা ছিল—আশ্বিনের পুজোর সময় এবং বছরের শেষেই বলুন আর পরের বছরের প্রারম্ভের আয়োজনেই বলুন, চৈত্র মাসে আর এক দফা কাপড় আসত। পুজোর সময়—শন্তিপুর, ফরাসডাঙ্গার পোশাকী কাপড় থেকে শুরু করে, গুরু পুরোহিত পুজক দেবপূজার কাপড়, বাড়ির মুদি মোদক জেলে মুড়িভাজুনী মেথর চাকর বাকর—এসব নিয়ে পাহাড়প্রমাণ কাপড় (তাই বলত লোকে) কেনা হ'ত দোকান থেকে, ফর্দ আসত সত্তর পঁচাত্তর আশি। পাঁচ শো টাকা ঋণ হলে গৃহস্থ ভাবতো ঋণে সে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। চাকরের মাইনে ছিল দেড় টাকা, কাপড় কোঁচানো থেকে সকল রকম তরিবত জানা খানসামার মাইনে আড়াই টাকা, মেয়ে রাঁধুনী থাকতো দু'টাকা আড়াই টাকায়, পুরুষ রাঁধুনীর বেতন সাড়ে তিন টাকার বেশি ছিল না।'[১৩]

লাভপুরের সেই সমাজে ছোটো-বড়ো সকলের মধ্যেই দেব-দ্বিজে বিশ্বাস না হোক, সম্ভ্রমবোধ ছিল। সেখানকার আবহাওয়াই ছিল অন্য রকম। এবিষয়ে আবার তাঁর আপন কথার সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে :

> 'আবহাওয়াই ছিল তখন এই। ভাগ্য আর অদৃষ্ট ছাড়া পথ ছিল না। দেবতারা ছিলেন ভাগ্যের কাণ্ডারী। সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে।'

আরো অনেকে আসতো। পীরমঙ্গলের গায়ক, গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তব্রতী, পটুয়া, বেদিয়া, বাজীকর, সাপুড়ে, ইরানী! মর্তের মাটিতে ভূত-প্রেত-ডাইনীর আসা যাওয়াতেও সেকালের লাভপুরের বিশ্বাস ছিল। আর, তারাশঙ্কর সেই সেকালের লাভপুরেরই সন্তান।

জীবনাদর্শের এই স্মৃতি নিয়ে তিনি লাভপুর থেকে কলকাতায়

১৩। ঐ পৃঃ ৬৯-৭০ দ্রষ্টব্য।

এসেছিলেন। তাঁর জীবনের অন্যান্য কথা স্থগিত রেখে এইবার তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের প্রসঙ্গে আসা যাক।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' বইখানির সূত্রপাত হয়েছিল তেরশ' তিরিশ সালে। তখন বৃহদায়তন কোনো বইয়ের পরিকল্পনা ছিল না লেখকের মনে। বাংলা উপন্যাসের নানা নমুনা নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো প্রবন্ধের আকারে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। বাংলা তেরশ' তিরিশ সাল মানে ইংরেজি হিসেবে উনিশ-শ' তেইশ। তখন 'কল্লোল'-এর আমল। সেকালের 'নব্যভারত' পত্রিকায় শ্রীকুমারবাবু তাঁর সেই লেখাটি আরম্ভ করেছিলেন। তারপর তেরশ' পঁয়ত্রিশের 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় সে আলোচনা আর একবার এবং আরো কয়েকবার কিস্তিতে কিস্তিতে ছাপা হয়। 'নব্যভারত' বন্ধ হয়ে গেলে 'বঙ্গবাণী'তে তিনি এই দ্বিতীয় প্রয়াস সুরু করেন। 'বঙ্গবাণী' উঠে গেলে 'উদয়ন' মাসিক-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা শুরু হয়। তারপর 'উদয়ন'ও উঠে যায়। পর পর তিনবার, তিনটি প্রসিদ্ধ পত্রিকায়, প্রত্যেকটিতেই বছর-খানেক বা তার কিছু বেশিই তাঁর বাংলা উপন্যাস-সম্পর্কিত এই আলোচনা ছাপা হয়েছিল। সাধারণ সাহিত্য-পত্রিকা ছাড়া রাজসাহী-কলেজ-ম্যাগাজিনেও তাঁর এ-বইয়ের কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছে। শেষে, বইয়ের আকারে সে লেখাগুলি তেরশ' পঁয়তাল্লিশ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ন'বছর পরে তেরশ' চুয়াল্লোতে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র দ্বিতীয় সংস্করণ, এবং আরো ন' বছর পরে, তেরশ' তেষট্টির বুদ্ধপুর্ণিমা তিথিতে (ইং ২৪এ মে, ১৯৫৬) তার তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছিলেন যে, তাঁর এই ধারাবাহিক লেখাটিতে তিনি প্রধানতঃ 'রস বিশ্লেষণের চেষ্টা' করেছেন,—এবং 'বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের তালিকা খুব দীর্ঘ না হওয়ায় প্রত্যেক লেখকের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা'র দিকেই তাঁকে মন দিতে হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে সজাগ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি সাধ্যানুসারে কিছু কিছু রদবদল করেছিলেন। তারপর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জানিয়েছেন: উপন্যাস-সাহিত্য যেরূপ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে যেরূপ নূতন আঙ্গিক ও

আলোচনা-পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে সমালোচনার ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলা প্রায় অসম্ভব। বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাসের আদর্শ ও রূপ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার সম্প্রসারণ করিয়া নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে হইবে। সমাজ-বিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের যে আবেগ-সংঘাত নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপরেও উপন্যাসের গঠন-বিন্যাস ও ভাবকেন্দ্র নির্ভরশীল।' বাংলা উপন্যাসে পরিবর্তনের এই দ্রুততা ইতিমধ্যে পাঠকের অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে। শ্রীকুমার বাবুও তা স্বীকার করেছেন। তাঁর নিজের কথায়: 'অগ্রগামী অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বাংলা উপন্যাসের যে কিরূপ বৈপ্লবিক রূপান্তর-সাধন ঘটিবে তাহা নিশ্চিতরূপে অনুমান করাও সম্ভব নয়। উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনধারা নূতন নূতন বাঁক ফিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যেন মনে হয় যে, প্রচলিত সমালোচনা-সেতুর তলা হইতে ইহা অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে।'

এই মন্তব্যের তারিখ ২৪এ মে, ১৯৫৬। এ ঘটনার প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে, তথাকথিত কল্লোল-যুগের 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকার দিন এসেছিল। শ্রীকুমারবাবু তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' বইখানির ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সে-সময়কার নতুন-উপন্যাসের—তথা নতুন সাহিত্য-ভঙ্গির কথা বলেছেন বিশদভাবে।

তারাশঙ্কর এই সময়টিকেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশকাল বলে চিহ্নিত করেছেন। 'আমার সাহিত্য জীবন' বইখানিতে তিনি জানিয়েছেন: 'বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে 'হারানো সুর'। '৩৪ সালের ফাল্গুনের কল্লোলে 'রসকলি' প্রকাশিত হওয়ায় ষান্মাসিক মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলাম। 'হারানো সুর' প্রকাশিত হল এক মাস পর; তখন সম্পাদক জানালেন, আমাকে আর কল্লোলের জন্য মূল্য দিতে হবে না, 'কল্লোল' আমি নিয়মিত পাব এর পর থেকে। সুতরাং এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব।'

এই ধরনের কথা তিনি তাঁর আরো কোনো কোনো প্রবন্ধে-নিবন্ধে বলেছেন। বাংলা গল্প-উপন্যাসের আসরে তাঁর প্রথম প্রবেশের এই যে বাংলা তারিখটি তিনি দিয়েছেন, খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে, সে ছিল উনিশ শ' আটাশের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যবর্তী সময়।

শরৎচন্দ্র তখন আমাদের উপন্যাস-জগতের মধ্যমণি। শরৎ-সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের আগেকার অভ্যস্ত 'পশ্চিমের হাওয়া' অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কুড়ির দশকের শেষ দিকেই তথাকথিত অতি-আধুনিকরা এসে পশ্চিমের জানলা নতুন করে খুলেছিলেন বা খোলবার চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর একটি প্রবন্ধে সে-কথা এইভাবে সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন: 'শরৎচন্দ্রের যুগে আমরা আমাদের চারিদিকে আঘাত-সংঘাতের ফলে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, পশ্চিমের দিকে আমাদের আর তেমন তাকাবার উপায় নাই—পল্লীসমাজের দলাদলি, বাঙ্গালীর রেঙ্গুনযাত্রা, সস্তাদরে খেলনা বাড়ি নিয়ে যাওয়ায় কেরানি-জীবনের যে দুর্লভ আনন্দ তাতেও ব্যাঘাত, বর্তমান যুগের বিবাহ-সমস্যা, এইসব নানারূপ দুঃখকষ্ট, সুখ, আনন্দ আমরা আর অবহেলা করতে পারি না, আর বুঝি যে এ সব দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিবিড় আনন্দের উৎস আছে, ইন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভের মতো শ্রীকান্তের জীবনে আর কখনও এত লাভ হয়নি, তা সে জীবন যত পর্বেই ছড়িয়ে যাক না কেন।'

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে বাংলা কথাসাহিত্যের এই দিক্-পরিবর্তন উল্লেখ করে প্রিয়রঞ্জন বাবু আমাদের উপন্যাস-ধারায় তখনকার দুটি বিশেষত্বের কথা বিশেষভাবে দেখিয়েছিলেন। প্রথমতঃ—'পাশ্চাত্য প্রভাব এখন যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে',—দ্বিতীয়তঃ 'জাতীয় সাহিত্যের কলরোল আর কানে পর্যন্ত এসে পৌছতে পারছে না'।

একথা সেদিন তিনি যে ভাবে বলেছিলেন, আজ আর ঠিক সে-ভাবে মেনে নেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, তাঁর এ-মন্তব্য প্রকাশিত হবার আগেই 'অতি আধুনিক'রা এসে আসরে প্রবেশ করেছেন।

তাঁর এই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল তেরশ' উনচল্লিশের শ্রাবণ মাসে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক, রুচি, আদর্শ, বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক তার আগেই বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক নিজেই তাঁর ঐ প্রবন্ধের শেষ দিকে যা বলেছিলেন, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও সে মন্তব্য এখানে স্মরণ করা দরকার: 'প্রসঙ্গক্রমে 'অতি-আধুনিক কথাসাহিত্য' সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। অল্পদিন পূর্বে বাংলায় মাসিকপত্রগুলি বিতণ্ডা-মুখর হয়ে উঠেছিল; তাঁদের বিতণ্ডার বিষয় ছিল বর্তমান গল্প ও উপন্যাসের রুচি ও ঘটনাসংস্থান। যাঁরা ছিলেন

বিরুদ্ধবাদী, অতি-আধুনিকতাই ছিল তাঁদের কাছে নিন্দার হেতু। অন্যপক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তারুণ্যের গর্বে স্ফীত হয়ে স্পর্ধাভরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন,—'আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের রুখবে' এই ভাবে। যাঁরা বিরুদ্ধবাদী তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী; তাঁর আপত্তির কারণটা আমাদের বোঝা দরকার। সে কারণ তিনি বহুবার বলেছেন, বহুবার নবীন সাহিত্যিকদের সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর আপত্তি রুচিগত নয়, শুচিবাইয়ের চীৎকার নয়, তার চেয়ে সার কথা আছে তাঁর যুক্তিতে;—পশ্চিমের হাওয়ায় যে কৃত্রিম সাহিত্য গড়ে উঠেছে বলে তাঁর ধারণা, তাঁর আপত্তি সেই কৃত্রিম সাহিত্যের বিরুদ্ধে।'

প্রিয়রঞ্জন বাবু এই একই সূত্রে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'এর বহুদিন পুর্বে প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পুর্বে কবি যখন 'সাধনা' পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন, তখনো মনে পড়ে ফরাসী কোনও ভালো উপন্যাসের বাংলা অনুবাদে তাঁর আপত্তি ছিল প্রচুর, কারণ তিনি বলতেন—ফরাসী উপন্যাসে যে অতিসূক্ষ্ম কাজ আছে, অনুবাদের অত্যাচারে তার আব্রুটুকু চলে যাবে, তার মাধুর্যটুকু নষ্ট হবে…'। অনুবাদের প্রসঙ্গ এনে ফেলে আসল প্রসঙ্গটাকে তিনি একটু পাশ কাটাতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু সে কেবল ক্ষণকালের জন্যে। সাহিত্যের সৌন্দর্যহানির যুক্তিটাই সেদিন শান্তিপ্রিয় প্রিয়রঞ্জনের কাছে সমুচিত সামর্থ্যময় বলে মনে হয়েছিল। সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি অতঃপর বলেছিলেন: 'আধুনিক ও অতি-আধুনিকের তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তবে এই কথাই মনে রাখা দরকার যে, সাহিত্য পরগাছা নয়, পশ্চিমের হাওয়া তাকে চঞ্চলতা দিতে পারে, তাকে নূতন পথে চলার কথা বলতে পারে, তাকে প্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু প্রাণ দিতে পারে না।'

খুবই সতর্ক হয়ে, বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমী প্রভাবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, অথবা, পশ্চিমী প্রভাবময় বাংলা সাহিত্যধারার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ভাবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজে জোর করে সে-বিষয়ে কোনো ঘোষণা প্রকাশ করতে, বোধ হয়, তাঁর সংকোচ ছিল। তেরশ' কুড়ি সালে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের অভিভাষণ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, সেটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বঙ্কিম-

যুগের বাংলা সাহিত্যে মিল, বেন্থাম, কোঁত, মিল্টন, বায়রন, স্কট ইত্যাদির প্রভাব-চিহ্নিত যে উল্লাস-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, সে ছিল বিদেশ থেকে আমদানী করা ব্যাপার,—'তখনকার সাহিত্যের মূলদেশ আমাদের দেশের মাটির সহিত সংলগ্ন ছিল না, সে যেন 'আরকিডের' মত আর এক গাছের উচ্চ শাখায় ঝুলিতেছিল। সে সাহিত্য যে প্রাণবান্, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু তার প্রাণরস অন্যদেশের সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইত।' জগদিন্দ্রনাথের এই কথাটি উদ্ধৃত করে অধ্যাপক সেন অতঃপর তাঁর নিজের এই কথা আর একটু জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন যে, 'আমরা আজ এ অবস্থা ছাড়িয়ে গিয়েছি বলেই আমরা পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে সংকীর্ণ মত পোষণ করতে পারি না।'

প্রিয়রঞ্জনবাবু যখন এই প্রবন্ধ লেখেন, তখন রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে এ দেশে সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজ্‌ম্-এর ধারণা প্রবেশ করেছে। তেরশ' উনচল্লিশ সালের ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকাতে তাঁর ঐ লেখাটিরই পাশাপাশি, অন্য একটি রচনায় অধ্যাপক সুশোভন সরকার জানিয়েছিলেন: 'সোশ্যালিষ্ট ভাবস্রোতের ঢেউ আজকাল আমাদের দেশেও পৌঁছেচে, যদিও অনেকে এটা নিতান্ত ক্ষোভের কথা মনে করেন। অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক এ সম্বন্ধে আগ্রহ বা আলোচনাকে পশ্চিমের সস্তা অনুকরণ বলে ব্যঙ্গ করেছেন—এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ও সর্বোপরি ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও আমরা প্রায় শুনতে পাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশ থেকে সাহিত্য, সামাজিক প্রথা, শিক্ষাপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে নতুন নতুন মত ও আদর্শ আহরণ করতে কুণ্ঠিত হন না—ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতীয়তাবোধের প্রসারের বিপুল চেষ্টা পাশ্চাত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সোশ্যালিজ্‌ম-এর বিরুদ্ধে অনেক প্রবল যুক্তি আছে কিন্তু তাকে বিদেশী বলে বর্জন করার উপদেশ শ্রেণীস্বার্থের সুন্দর উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়।' সোশ্যালিজ্‌ম্ যে ধনতন্ত্রবাদের প্রতিবাদ,—যে সমাজ স্থিতিশীল, কেবল সেই সমাজই যে শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য স্বীকার করতে পারে,—গতিশীল সমাজ যুগের প্রয়োজন অনুসারেই যে আত্মনিয়ন্ত্রণে সর্বদা প্রস্তুত,—বার্নার্ড শ' যে সেকালে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধনসাম্য ঘটাবার পক্ষপাতী হয়েছিলেন,—ধনের বৈষম্য দূর করতে হলে ভূমি, মূলধন, যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়গুলির রাষ্ট্রীয়করণ এবং সেই সঙ্গে উত্তরাধিকারপ্রথা রদ

করাও যে অনিবার্য,—দারিদ্র্য দূর করবার দিকেই যে সোশ্যালিজম্-এর লক্ষ্য,—সুশোভনবাবু সে-সবকথা খুবই সরল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সমাজে ধনিক-কর্তৃত্ব এবং শ্রমিক-দাসত্বের দিন যে শেষ হয়ে এসেছে, সে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি তাঁর ঐ প্রবন্ধের মধ্যে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল। সমষ্টিবাদ (Collectivism), সমিতিতন্ত্র (Syndicalism), সংঘতন্ত্র (Guild Socialism), সাম্যবাদ (Communism), এবং নৈরাজ্য (Anarchism) —সোশ্যালিজ্‌ম্-এর এই পাঁচটি প্রধান শাখা সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ এবং ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিস্মৃত হন নি। এই বাংলা প্রতিশব্দগুলি ব্যবহার করে এ-বিষয়ে তিনি আমাদের সমুচিত পরিভাষার ইশারা দিয়েছিলেন। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের 'ক্রিশ্চান সোশ্যালিজ্‌ম্', জার্মানিতে বিস্‌মার্কের 'স্টেট-সোশ্যালিজ্‌ম্' এবং নাজিবাদ,—যার নামান্তর 'ন্যাশনাল সোশ্যালিজ্‌ম্' —এই তিনটির প্রত্যেকটিই যে আসল 'সোশ্যালিজ্‌ম্'এর ভেকধারী বিকৃতির নমুনা মাত্র, সে-তত্ত্বও বুঝিয়ে দিয়ে, প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি জানিয়েছিলেন : 'সাম্যবাদ মার্ক্স ও এঞ্জেল্‌সের মতের লেনিনকৃত টীকার উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যেতে পারে। রুষ-বিপ্লবের পর এই মতবাদ সাফল্য-গর্বে মণ্ডিত ও সুপরিচিত হয়ে পড়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কর্মপদ্ধতিতে। সাম্যবাদ অনুসারে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ধনতন্ত্রের ধ্বংস অসম্ভব এবং বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এই কর্তৃত্ব অবশ্য সাম্যবাদী দলের হাতে ন্যস্ত থাকবে কিন্তু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রে পূর্ণ পরিণতি লাভ না করা পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবকাশ নেই। রাশিয়াতে উদ্ভাবিত সোভিয়েট-সমিতি বর্তমান সাম্যবাদের অঙ্গীভূত হয়েছে একথা বলা বাহুল্য।'

ধ্যান-ধারণা-মতবাদের এই আবহাওয়ায় বাস করে, সে-আমলের সাহিত্য-শিল্পী দেখেছিলেন অবসানের বেদনা-বিহ্বলতা,—অবসাদময় অন্ধকার,—যে কাল আসন্ন, তারই অনতিনিরূপিত অন্য মূর্তি! অথবা, একদিকে পুরোনো প্রতাপ, সমারোহ, আড়ম্বর, অধিকারবোধ,—অন্যদিকে জীর্ণ অতীতের ওপর নতুন অধিকারীর স্থূল হস্তাবলেপ! জমিদার তারাশঙ্কর পুরুষ-পরম্পরাক্রমে অর্জিত তাঁর আপন সংস্কার থেকেই সে বেদনা প্রকাশের রূপক খুঁজেছিলেন। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন বাবু যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বা দেশী-বিদেশী এতিহ্যভেদে ব্যাখ্যা

করেছিলেন, তারাশঙ্করের গভীর শিল্পিমনে সে বিতর্ক ঠিক সেভাবে দেখা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কারণ, প্রথম জীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে তারাশঙ্কর কিছু সক্রিয়তার নজীর রেখে এসেছেন বটে, কিন্তু সংহত প্রকাশের সঙ্গে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-কৌশল তিনি কখনোই আয়ত্ত করেননি। তিনি প্রধানতঃ অভিজ্ঞতার মানুষ। হৃদয়বোধের ধারা তিনি! সে সময়ে, ইতিহাসের প্রগতিপন্থী অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সমাজতন্ত্র-ব্যাখ্যানও তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন বলে বিশ্বাস করবার কারণ নেই। সত্যিই তিনি অন্য দলের, অন্য মেজাজের মানুষ।

শিল্পীর অন্তরাবস্থা বোধ হয় চিরকাল তাই-ই হয়ে থাকে। তাঁরা স্বতন্ত্র। তবু, পারিপার্শ্বিক ঘটনাধারার সঙ্গে তাঁদেরই সর্বাধিক অন্তরঙ্গতা! ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ,—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র,—প্রাচীন, অতীত এবং অনাগত ভবিষ্যৎ,—এই সব বিভিন্ন উপাদান এবং বিচিত্র ভাবনার ওতপ্রোত সমাবেশ থেকেই তারাশঙ্করের গহন মনে রূপ নিচ্ছিল গভীর এক বেদনার ব্যাকুলতা!

সেই ব্যাকুলতার মধ্যেই, বোধ হয়, হঠাৎ ধরা দিয়েছিল দুটি মানুষ। একদিকে, রায়বাড়ির সাত-পুরুষের সপ্তম, বিশ্বম্ভর রায়। তিন পুরুষের সঞ্চয়ে, চতুর্থ পুরুষের রাজত্বে, পঞ্চম আর ষষ্ঠের ভোগে, ঋণে বিপর্যস্ত রায়বাড়ির প্রবলপ্রতাপান্বিত বিশ্বম্ভর! অন্যদিকে, নতুন সম্পদ-গর্বিত, তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বী মহিম গাঙ্গুলী! এই দু'পক্ষ সত্যিই দুই নয়,—ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র নয়। এঁদের দু'পক্ষ একই তন্ত্রাশ্রিত। একই ধনতন্ত্র! তবু তারই মধ্যে দুই রূপ। অবসান, আর সূচনা। বিশ্বম্ভর অবসানের রূপক,—মহিম গাঙ্গুলী সূচনার!

অতীত কোনো মতেই তার অধিকার ছাড়তে চায় না। তখন বিশ্বম্ভরের হাতিশালে যদিও হাতি বাকি আছে একটি মাত্র, ঘোড়াশালে ঘোড়ার সংখ্যাও তথৈবচ, তবু তাঁর মনে পড়ে সুদূরকালের অতিক্রান্ত সমারোহের অন্য এক রাত। লখনউ-এর জোহ্‌রা! দিল্লিওয়ালী চন্দ্রাবাঈ! ঘোড়ার নাম 'তুফান'। হাতির নাম 'ছোটগিন্নি'। মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রান্ত হয়ে, দুর্দান্ত রাবণেশ্বর রায়ের উত্তরাধিকারী বৃদ্ধ, বিপর্যস্ত বিশ্বম্ভর পরিশেষে রায়-বংশের শেষ মাঙ্গলিক সিঁথিখানি নায়েবের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দেবোত্তরের খাতায় সেই অলঙ্কার জমা পড়েছে,—ইষ্টদেবী আনন্দময়ীর জড়োয়া সিঁথি খরিদের দাম বাবদ

বংশের সেই শেষ সম্বল দেড়শোটি মাত্র টাকার জোরে জলসাঘরে আর একবার আলো জ্বলেছে! সুরা, নারী, সংগীত, উন্মাদনা! সারারাত চাঁদ আর স্মৃতিবিলাস! গান আর রূপানুরাগ! তারপর শেষরাত্রে তুফানের ওপর সওয়ার হয়ে বিশ্বম্ভর ঘুরে এসেছেন শূন্য রাস্তায়। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে তুফান তাঁকে তাঁদেরই হারানো লাট কীর্তিহাটের কাছে এনে ফেলেছে! তারপর? তারাশঙ্করের নিজের ভাষাতেই সে-কাহিনীর শেষটুকু স্মরণীয়:

'মুহূর্তে সোজা হইয়া লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিলেন, আবার কশাঘাত তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাবলের সম্মুখে আসিয়া রায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, পুর্বদিকে আলোর রেশ ফুটিতেছে। রজনী এখনও যায় নাই।'

'নিতাইয়ের হাতে তুফানকে দিয়া ত্বরিত পদে রায় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসাঘর তখনো খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। ঝাড়–দেওয়ালগিরির বাতি তখনও শেষ হয় নাই। তখনও আলো জ্বলিতেছে। দেয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে।'

'দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত।'

'অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কথনও শোনে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াইতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর—জলসাঘরের—'

'আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।'

উনিশ শ' সাঁইত্রিশের সেপ্টেম্বর মাসে 'জলসাঘর' গল্পসমষ্টি বেরিয়েছিল। কিন্তু 'জলসাঘর' লেখাটি আরো আগেকার। তিরিশের দশকে এ-দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং ধর্মচেতনার মধ্যে কতকটা ব্যাপক এবং অস্পষ্টভাবেই পুরোনো কালের জৌলুষ মুছে-দেওয়া যে পরিবর্তনবোধ দেখা দিয়েছিল, তারাশঙ্করের 'জলসাঘরে' তারই সুস্পষ্ট ইশারা! আমাদের কুলগৌরব, ঐতিহ্যধারণা, বিলাসব্যসনের প্রথা,—জীবনের তীব্র আস্বাদনে আমাদের তৎকালীন আগ্রহ, উৎসব-আড়ম্বরের ঐ একটি রূপকের সাহায্যে এ সবই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর এসব বিষয়ে আরো ভাবতে হয়েছে! তিনি তাঁর নিজের শিল্পের দিক থেকেও ভেবেছেন—আবার দেশের দিক থেকেও। তাই তাঁর লেখাতে কেবলই সংস্কার, কেবলই শোধন,—তাঁর রচনাবলীর সংস্করণে-সংস্করণে কতো যে পরিবর্তন! সে কথা আগেও বলা হয়েছে। এই সূত্রে আবার মনে পড়ে। মনে পড়ে, তেরশ' আটান্নো সালের ভাদ্র সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্য অংশে এই মন্তব্যটি ছাপা হয়েছিল:

> 'তারাশঙ্করের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ আছে। সাহিত্য পরিষদের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতীর পুলিন সেনের জ্বালায় আমরা অহরহ জ্বলিতেছি, সংস্করণে সংস্করণে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর ইঁহারা যেরূপ পরিবর্তন ঘটাইতেছেন, গরিব বাঙালীর পক্ষে তাহার তাল সামলানো দুর্ঘট হইয়াছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা ইদানীং (বঙ্কিমের রাজসিংহ, ইন্দিরা অনেক দিনের কথা) নিরাপদ ছিলাম। কিন্তু তারাশঙ্কর তাঁহার 'সন্দীপন পাঠশালা'র নূতন (তৃতীয়, আষাঢ়, ১৩৫৮) এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র নূতন (তৃতীয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) সংস্করণে যে আপাদমস্তক পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, তাহাতে নূতন সংস্করণের মালিক না হইলে বঞ্চিত হইতে হইবে। দাম তো কম নয়, ৪।০, ৭৲। দুটিরই বছরে বছরে সংস্করণ হইতেছে এবং নিষ্কর্মা (?) তারাশঙ্কর বছরে বছরে বদলাইয়া চলিয়াছেন, আমরা যে মারা গেলাম!'[১৪]

১৪। পৃঃ ৫৫৯।

সাহিত্যিক হবার আগ্রহ নিয়ে তিনি যখন লাভপুর থেকে প্রথম কলকাতায় আসেন, তখনকার বাঙালী সাহিত্যিকের আর্থিক দুরবস্থার কথা অনেকেই বলেছেন। তারাশঙ্কর নিজেও সে-সব কথা নানা প্রসঙ্গে অনেকবার জানিয়েছেন। 'কল্লোল-যুগ'-এর অচিন্ত্যকুমারও বলেছেন। উনিশ শ' তিরিশের কয়েক বছর আগে সে-অবস্থা কতো যে মর্মান্তিক ছিল, এখানে তারও একটু বর্ণনা তুলে দেখা যেতে পারে। 'কল্লোল', 'কালিকলম' 'প্রগতি', 'বঙ্গবাণী', 'নব্যভারত, 'উত্তরা' বা তখনকার অন্য যে-কোন পত্রিকার কথাই ভাবা যাক না কেন, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্যান্য লেখকদের অবস্থা এদিক থেকে মোটেই উৎসাহজনক ছিলনা। লেখার বদলে লেখককে কিছু যে অর্থমূল্য দেওয়া দরকার, সেকালের বাংলা পত্র-পত্রিকার পরিচালকসমাজ সে বিষয়ে বড়োই বিমুখ ছিলেন। তেরশ' তেত্রিশে, আষাঢ়ের 'কালিকলম' পত্রিকায় 'বিচিত্রা' শিরোনামে বিশেষ ভাবে সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসুর সাহিত্যিকদের লেখার পারিশ্রমিকের দাবি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। এর আগেও এ-রকম কিছু কিছু আলোচনা অন্যান্য কাগজেও দেখা গেছে। 'কালিকলম'-এর সেই 'বিচিত্রার' মধ্যে সাহিত্য-প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন মুরলীধর এবং রাষ্ট্র ও সামাজিক বিষয়ে লিখতেন নলিনীকিশোর গুহ। মুরলীধরের বক্তব্য ছিল: 'বড় বড় কাগজগুলি যে কাহাকেও কিছু না দিয়াই সকলকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিয়াই চালান হয় এমন অসার অভিযোগ তুলিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। শুধু জিজ্ঞাসা এই যে যাহা দেওয়া হয়, লাভের তুলনায় তাহার পরিমাণ কতটুকু? তাহাও কি আবার সব সময় আপনা হইতে দেওয়া হয়? না চাহিয়া পাঠাইলে কি পাওয়া যায়? নিতান্তই কি দায়ে ঠেকিয়া দেওয়া নয়?'

এই আবহাওয়ার মধ্যেই তারাশঙ্কর এসে আসরে প্রবেশ করেছিলেন।

***

॥ ঐতিহ্য ও সহযাত্রী ॥

সেকালের বাংলা কথাসাহিত্যের দিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য রেখে এইবার সে আবহাওয়ার আরো কয়েকটি দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে।

ইংরেজি হিসেবে শতাব্দীর প্রথম পাদান্ত গেছে উনিশ শ' পঁচিশ সালে। বাংলায় সেটা ১৩৩১-৩২ সাল। ১৩৩০ সালে দীনেশরঞ্জন দাশের সহযোগিতায় গোকুলচন্দ্র নাগ তাঁর 'কল্লোল' পত্রিকা বের করেছিলেন। 'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই গোকুলচন্দ্রের 'পথিক' প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩২-এ সে-রচনা গ্রন্থাকারে ছাপা হয়।

সমকালীন সাহিত্যের বিষয়ে এ অবিশ্যি সকলেরই জানা কথা যে, সৃষ্টিমূলক রচনার মধ্যে গল্প এবং উপন্যাসের পাঠকসংখ্যাই সর্বাধিক। উপন্যাস লিখতে পারলে লেখক তাড়াতাড়ি সমাজে পরিচিত হন। তাঁর রচনাতে বস্তু থাকলে তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁর ভক্তের দল গড়ে ওঠে, এবং ভক্তের স্বভাবই এই যে, তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতার কোনো সমালোচনা সহ্য করতে নারাজ! লেখকরাও রক্তমাংসের মানুষ। মানুষ প্রশংসা শুনতেই ভালোবাসে,—অনুযোগে কুণ্ঠিত বোধ করে,—অপ্রিয় সত্যে বিচলিত হয়। এই সাধারণ অভিজ্ঞতার ভূমিকাটুকু মনে রেখে উনিশ শ' পঁচিশ থেকে মোটামুটি উনিশ শ' পঞ্চাশ পর্যন্ত, পঁচিশ বছরের বাংলা গল্প-উপন্যাসের সাধারণ প্রকৃতির কথাই এখানে বিবেচ্য। তবে, তারাশঙ্করের প্রথম প্রবেশ থেকে শুরু করে তাঁর সাম্প্রতিকতম রচনার প্রসঙ্গে এগুতে হলে উনিশ শ' পঞ্চাশের সীমাটিও চূড়ান্ত নয়। তিনি এখনো লিখছেন। তাঁর পরীক্ষার অবসান ঘটেনি এখনো।

তেরশ' পঁয়ত্রিশ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'কল্লোল'-এর 'ডাকঘর' থেকে সেকালের সাহিত্যিক আবহাওয়ার একটি খবর তুলে দেখা যাক। সেকালের নবীন শক্তিমানদের মুখপত্র 'কল্লোল' মন্তব্য করেছিলেন :

'মাসিক পত্রে ছোটগল্প খুব চলে। কিন্তু ছোটগল্পের বই বাজারে একেবারে চলে না। যাঁহারা ছোটগল্প লেখেন তাঁহারা একথা হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছেন।...এই কারণে যাঁহারা গল্প লেখায় একটুও

হাত পাকাইয়াছেন তাঁহারা উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপন্যাস হইলে অন্তত কিছুও মূল্য পাওয়া যায় এই ভাবিয়া যাঁহাদের গল্প লেখায় এখনও হাত পাকে নাই তাঁহারাও উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।...অক্ষম লেখকের হাতে পড়িয়া ছোটগল্প বা উপন্যাস একই মূর্তি পরিগ্রহ করে।'

যুগের খেয়াল, পাঠকের রুচি, সম্পাদকের গরজ এবং বিক্রেতার চাহিদা অনুসারেই উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু সকল যুগের এই সাধারণ সত্যের পাশাপাশি, আর একটি বিপরীত সত্যের কথাও ধর্তব্য। 'কল্লোল'-এর যে-সংখ্যা থেকে ওপরের উদ্ধৃতিটি তোলা হয়েছে, ঠিক তার আগের সংখ্যাতেই প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছিলেন :

'পাঠকও সাহিত্য ফরমায়েস দেয় না। অলেখক হয় গোপালের মত সুবোধ ছেলে—অর্থাৎ সে যা পায় তাই পড়ে—আর না হয় রাখালের মতো অবোধ ছেলে,—কিছুই পড়ে না। পাঠক গোপালও সাহিত্যের থিওরির ধার ধারে না, অপাঠক রাখালও থিয়োরির ধার ধরে না।

অবশ্য একদল পরোপকারী লোক আছেন যাঁরা গোপালকে নিত্য পরামর্শ দেন, তার কি পড়া উচিত, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, গোপালকে এ পরামর্শ দেওয়া তেমনি বৃথা, যেমন বৃথা রাখালকে পরামর্শ দেওয়া তার কি লেখা উচিত।'

এই দু' রকম ধারণারই সত্যাসত্য আছে। দেশ-কালের প্রভাবও স্বীকার্য, আবার, লেখকদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিও অবান্তর ব্যাপার নয়। ১৯২৬ থেকে ১৯৫০-এর বিস্তারের মধ্যেও তাই-ই ঘটেছে। আমাদের প্রথম পাদান্তের নবীন ঔপন্যাসিকদল রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সম্মিলিত মহিমা শিরোধার্য করে নিয়েই আসরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের নতুনত্ব ছিল ভঙ্গিতে, প্রচারে,—কল্পনাস্পৃষ্ট বাস্তবতায় এবং রোম্যান্টিক দুঃখবাদে। 'ভারতী', 'নারায়ণ', 'সবুজপত্র', 'মানসী' ইত্যাদি পত্রিকা খুঁজে দেখলে দেশের মাটিতেই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের মনোভঙ্গির কতকটা ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যাবে। বাকিটুকু তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী করেছিলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত

প্রভৃতি প্রাক্‌-'কল্লোল' পর্বের লেখকদের কীর্তি, ইতিহাসের অটুট এবং অব্যাহত ক্রমায়ণটি বোঝবার জন্যেই এই সূত্রে মনে রাখা দরকার।

উনিশ শ' ষোলোতে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ', দুখানি উপন্যাসই বই হয়ে বেরিয়ে গেছে। সে ঘটনার বছর দশেক পরে তেরশ' চৌত্রিশের আশ্বিনে 'বিচিত্রা'-তে তাঁর 'তিন-পুরুষ' নামে নতুন একখানি উপন্যাস ছাপা শুরু হয়। তেরশ' ছত্রিশের আষাঢ়ে (ইং ১৯২৯) সে লেখাটি 'যোগাযোগ' নামে বই হয়ে বেরোয়। 'শেষের কবিতা'ও ঐ একই বছরের বই। সে লেখাটি তেরশ' পঁয়ত্রিশের ভাদ্র থেকে চৈত্রের মধ্যে 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল। বছর পাঁচেক পরে, তেরশ' চৌত্রিশে তাঁর 'মালঞ্চ' এবং 'চার অধ্যায়' বেরিয়েছে এবং এই শেষ দুখানির আগেই উনিশ শ' তেত্রিশে বেরিয়েছিল তাঁর 'দুই বোন'।

'বঙ্গবাণী'তে উনিশ শ' বাইশের আগষ্ট থেকে (বাংলা ১৩২৯) কতকটা অনিয়মিত কিস্তিতে-কিস্তিতে ছাপা হয়ে উনিশ শ' ছাব্বিশের আগষ্ট মাসে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী অবশেষে গ্রন্থরূপ পেয়েছিল,—এবং পেয়েই রাজ-রোষে পড়ে বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তার আগে উনিশ শ' তেইশে তাঁর 'দেনা-পাওনা' এবং উনিশ শ' চব্বিশে 'নববিধান' বেরিয়েছিল। 'পথের দাবী'র উত্তেজনা শতাব্দীর প্রথম পাদসন্ধির একটি বিশেষ ঘটনা। তার বছর পাঁচেক পরে, রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি তত্ত্বচিন্তার আতশবাজি দেখাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' লিখেছিলেন এবং তার ফলে, পাঠকসমাজের মধ্যে আর একবার খুবই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। সে বইখানি ছাপা হয় উনিশ শ' একত্রিশে—রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র পরে। তার আগে, উনিশ শ' সাতাশ সালে বেরিয়েছে শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব—এবং ১৯৩৩-এ তার চতুর্থ পর্ব। ১৯৩৫-এ তাঁর 'বিপ্রদাস' বই হয়ে বের হবার পরে 'শেষ প্রশ্নে'র অসংযমে ব্যথিত সমালোচকদের মনে কতকটা শান্তি ফিরেছিল। সেই সময়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন: 'উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পূর্ব-গৌরবের অনেকটা পুনরুদ্ধার হইয়াছে।'

উপন্যাসের দিক থেকে দেখলে 'কল্লোল'-এর জন্মকালে এবং তার পরেও 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণী'—এই চারখানি পত্রিকারই বিশেষ সুদিন ছিল বলতে হবে। যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বহু আলোচিত

উপন্যাস ছাপা হয়েছে এই সব পত্রিকার পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই দুই চন্দ্র-সূর্যের কথা স্থগিত রাখলে সে যুগের প্রবীণ খ্যাতিমানদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অবশ্যই মনে পড়বে। এ-কালের 'মহাস্থবির জাতক'-এর খ্যাতিমান লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী উনিশ শ' ছাব্বিশের আগেই তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখে ফেলেছিলেন। শান্তা দেবী এবং সীতা দেবী তখন 'প্রবাসী'তে লিখে কিছু নাম করেছেন। প্রভাবতী দেবীর অসংখ্য লেখার মধ্যে, সে-আমলে যা প্রকাশিত হয়ে গেছে, সেও বহুসংখ্যক। জলধর সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়. শৈলবালা ঘোষজায়া, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ইত্যাদি লেখক-লেখিকারা তখন উপন্যাসে অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার এবং হেমেন্দ্রলাল রায় দুজনেই কবিতা লিখেছেন এবং উপন্যাসেও দুজনেরই কিছু কিছু প্রয়াস-প্রযত্নের নমুনা আছে। যশোদালাল, ফণীন্দ্রনাথ, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি আরো কতো-যে লেখক সে-সময়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস সুদীর্ঘ বলেই এখানে পরিত্যাজ্য।

শরৎচন্দ্রের প্রথম অভ্যুদয়ের বিস্ময় কেটে যাবার আগেই ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', ময়ুখ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাহিনী ছাপা হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কাঞ্চনমালা' অনেক আগেকার রচনা, কিন্তু তাঁর 'বেণের-মেয়ে' 'কল্লোল'-এর অল্পকাল আগে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে য়ুরোপে ১৯১৪-১৮-র মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। 'ভারতী' দলের সৌরীন্দ্রমোহন, চারুচন্দ্র, মণিলাল প্রভৃতি খ্যাতনামার দল সে-কালে নানা সাহিত্যের নানা প্রভাবের মধ্যে বাস করে গল্প-উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করেছেন। 'সবুজ-পত্রে'র প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকী রীতি বাংলা উপন্যাসের প্রবাহে তেমন কোনো ব্যাপক ছায়া ফেলেনি বটে, কিন্তু বোধ হয়, তাঁরই প্রভাবে বুদ্ধিমুখ্য বিশ্লেষণের দিকে ধীরে ধীরে পরবর্তীদের রুচির টান দেখা গেছে। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথই কি কম বিদ্যা-বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছেন? তবে বিদ্বৎ-ভঙ্গির প্রদর্শন-ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের বেশি মিল দেখা যায়। নরেশচন্দ্র

সেনগুপ্ত তাঁর 'অগ্নি-সংস্কার' এবং 'বিপর্যয়' বই-দুখানির মধ্যেও কিছু বিশ্লেষণের সামর্থ্য দেখিয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হয়তো আরো দেখিয়েছিলেন। সে যাই হোক, একথা মানতেই হয় যে, ১৯২৬-এর আগেকার কীর্তিমানদের নানা সামর্থ্য সত্ত্বেও গদ্য-পদ্য উভয় অঞ্চলেই সে সময়ে নতুন দৃষ্টির না হোক, নতুন এক দিদৃক্ষার প্রকাশ অবশ্যই ঘটেছিল!

এসব কথা সুদূর অতীতের। তারাশঙ্কর আরো একালের প্রসিদ্ধতমদেরই একজন। 'কল্লোল'-এর অনেক লেখকের তুলনায় তিনি উপন্যাসে খ্যাতিলাভ করেছেন খুবই সাম্প্রতিক কালে। মনে পড়ে, উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে তিনি যখন তাঁর খ্যাতির প্রায় শিখরে পৌঁছেছিলেন, সেই সময়কার ছোট একটি প্রবন্ধে, আমাদের সাহিত্যধারায় শরৎচন্দ্রের পরবর্তী লেখকদের সেই নতুন দিদৃক্ষা বা মনশ্চাঞ্চল্যের কথাই তিনি লিখেছিলেন। ১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধের পরে য়ুরোপের প্রচলিত সমাজধর্মের সকল ক্ষেত্রেই যে অনাস্থা ও অধীরতার ভাব দেখা গিয়েছিল এবং য়ুরোপে সে সময়কার সাহিত্যে যে আদর্শ এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল, বাংলা গল্পে-উপন্যাসে সেই নৈরাশ্যবাদেরই অনুকরণ চলেছিলো বলে সমালোচকরা মন্তব্য করে থাকেন। শরৎচন্দ্র যে পল্লীজীবনের কথা লিখে গেছেন, পরবর্তীরা সকলেই যে সে অঞ্চল পরিত্যাগ করে নগরের কথায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তা নয়। তবে শরৎচন্দ্রীয় পল্লীকথার সঙ্গে শরৎ-পরবর্তী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পল্লীকথার অনেক তফাৎ চোখে পড়ে! এই শেষ তিনজনের মধ্যেই বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে। বৈচিত্র্যই বনফুলের প্রধান আবেদন। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন গ্রামের সমাজে জাতিধর্মের বাড়াবাড়ি,—জমিদার এবং উচ্চবর্ণের প্রতাপ,—সেইসঙ্গে ছোটোলোকের হৃদয়গুণ! বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবণতার পার্থক্য সত্ত্বেও জীবন-পরিবেশের গ্রাম-নগরগত বিভিন্নতার এক রকম সামগ্রিক চৈতন্যের আবেদন পাওয়া গেল। এঁদের দৃশ্যপট আরো বিচিত্র, এঁদের আঞ্চলিকতা আরো সুচিহ্নিত ; বিভূতিভূষণ একটু বেশি উদাসীন, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই একটু বেশি আঞ্চলিক উপভাষাময়,—আবার তারাশঙ্কর

বেশি রাষ্ট্রচেতনাময়, বেশি গ্রামীণ,—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তাকর্ষকভাবে তীব্র, তীক্ষ্ণ, সঙ্কেতময়। সমাজবন্ধন এবং স্বভাব-উচ্ছৃঙ্খলতার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি চির-আবিষ্ট! তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই রাজনীতির ঢেউয়ে দুলেছেন। বনফুল শিল্পীর অনাসক্তি বজায় রেখেই সে ঢেউ দেখেছেন। আর, বিভূতিভূষণের চোখ ছিল অন্য দৃশ্যে, অন্য রূপে,—সুদূর দিকচক্রবালে! এই চারজন কৃতী ঔপন্যাসিকের একজনও 'কল্লোল'-এর যথার্থ প্রতিনিধি নন। তারাশঙ্করের গল্পের খ্যাতি তাঁর উপন্যাসের পূর্ববর্তী বটে, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, উপন্যাসে তিনিও নাম করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' বেরিয়েছিল ১৯৩৬-এ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রথম দেখা দেয় ১৯২৯-এ। 'কল্লোল'-এর লেখকদের মধ্যে কৃতী হয়েছেন যাঁরা, তাঁরাই 'কল্লোল-যুগ' কথাটা একটু বেশি জোর দিয়ে বলে থাকেন। আসলে, নবীন সাহিত্যিক-দের মনে সে সময়ে 'কল্লোল'-নিরপেক্ষভাবেই নতুন এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। তারাশঙ্কর সেই দিকেই বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। নিচে তাঁর সেই লেখা থেকেই কিঞ্চিৎ নমুনা তুলে দেওয়া হোলো:

> 'সমালোচকগণ বলেন, তদানীন্তন সাহিত্যের সুর ইউরোপীয় সাহিত্যের সুরেরই অনুকরণ। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে সমালোচকগণ দেখিয়েছেন যে, বিখ্যাত বিদেশী বইয়ের বাংলা নকল বেমালুম মৌলিক বাংলা উপন্যাস বলে চলে গেছে।···
>
> সমালোচকগণ যে কথা বলেছেন সে কথা মিথ্যা নয়; ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ সত্য, তাকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু তার সঙ্গে মনের মধ্যে সত্যকার ক্ষোভ ছিল, একথাও পরিপূর্ণভাবে সত্য। ১৯২১ সালে এবং ১৯৩০ সালে বার বার দু'বার তখন গণআন্দোলন ভেঙে পড়লো। অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা ও লৌকিক সাধনার যে সমন্বয়চেষ্টা বা পরিকল্পনার মধ্যে আমরা কিছুদিনের জন্য মহা আশ্বাসে আশ্বাসিত হোয়ে উঠে-ছিলাম. সে আশ্বাসভঙ্গের ফলে এবং বিগত মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ (প্রথম মহাযুদ্ধ) পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত

অবস্থায় আমাদের জীবনও অনুরূপ ক্ষোভে ভরে উঠেছিল……রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অহিংসাধর্মী আন্দোলনকে উপেক্ষা করে সন্ত্রাসবাদীর পুনরাবির্ভাব এই ক্ষোভের আর এক দিকের নিদর্শন। ……সমন্বয় নয়, বিপ্লবের বাসনা সাহিত্যে সঞ্চারিত হোতে চাওয়াটাই এই সাহিত্যের বড় লক্ষণ। এই অধীর চিত্তের প্রতিফলন দিয়েই এই সাহিত্যের সুরু।'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুলচন্দ্র নাগ, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের নানান্ গল্পে সে-যুগের নতুন মানবতার প্রতিফলন ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে সত্যিকার ঔপন্যাসিক সিদ্ধি একজনেরও ঘটেনি। অথচ গল্পকার হিসেবে এঁদের প্রায় সকলেরই বিশিষ্ট স্থান আছে। মধ্যবিত্তের নগর-জীবনের পারিপার্শ্বিকতা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন: মানুষ দেবতাও নয়, পশুও নয়। সে সময়ে তাঁর যুগ-সচেতন মনে মানুষের অসহায় আকুল জিজ্ঞাসার বেদনাই ধরা পড়েছিল। শৈলজানন্দের 'নারীমেধ' প্রভৃতি গল্পে এবং কয়লাকুঠীর সাঁওতালী কথাতে সেই মানবতারই অন্যতর প্রকাশ ঘটেছিল। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে তাঁর বিশেষ রুচির কথাও স্মরণীয়। পারিপার্শ্বিক জীবনের বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলবার আগ্রহ ছিল তাঁদের, কিন্তু তখনো রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় রোম্যাণ্টিক প্রবণতার প্রভাব কাটেনি। রোম্যাণ্টিক টান কি সহজে যেতে চায়? সে কি পুরোপুরি যাবার জিনিস? তারাশঙ্কর বলেছিলেন বটে—'এই সাহিত্যই প্রথম দৃষ্টিপাত করেছে—অনাদৃত অবজ্ঞাত মানব-সমাজের দিকে',—কিন্তু গূঢ় অবস্থাটি বোঝবার জন্যেই তাঁর ওকথা আরো ভেবে দেখা দরকার। ১৯৩৭ সালে অন্য এক প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন: 'যাঁরা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা হুতাশ করেন, তাঁরা লোক ভাল, কিন্তু রোম্যাণ্টিক। আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই।' ধূর্জটিপ্রসাদের ও-কথা যদিও ১৯৩৭ সালে উচ্চারিত হয়, তবু 'কল্লোল' প্রসঙ্গেও তা যেমন সুপ্রযোজ্য, একেবারে আধুনিক কালের বাংলা উপন্যাস-অরণ্যের প্রাচুর্য সম্বন্ধেও তেমনিই চিন্তনীয়। সেকালে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গল্পকার নিজের নিজের জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবন-সত্যের যে উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, তাতে তীব্রতা

ছিল, কিন্তু যথার্থ উপন্যাসের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে যে বিস্তারবোধের মুখাপেক্ষী, সে বোধ তাঁদের ছিল না। তবু তাঁরা যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বা নারায়ণ ভট্টাচার্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র নন, সে তো স্বতঃসিদ্ধের মতনই স্পষ্ট। অবশ্য 'কল্লোল' পত্রিকাতেই সৌরীন্দ্রমোহনের 'রূপছায়া' উপন্যাস ছাপা হয়েছে,—তাতেই যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালী' বেরিয়েছে,—অচিন্ত্যকুমার 'বেদে' লিখেছেন,—আবার সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির আলোও' বেরিয়েছে। আগের যুগের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সেকাল থেকে একাল অবধি প্রায় সমভাষী, সমান সাবলীল প্রবোধকুমার সান্যালও সেই 'কল্লোলে'ই গল্প লিখেছেন। শতাব্দীর প্রথম পাদান্তের নবজাগ্রত মানবতাবোধ প্রকৃত শিল্পীর আবেগ এবং মননের সমর্থন পাবার আগেই অতি-প্রগলভ বাঙালী সাহিত্যিকের কলমে তা কেবল অনুকরণেরই প্রেরণা জুগিয়েছে! ১৩৩৩-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'কল্লোল'-এর ১১৬ পৃষ্ঠায় তাই লেখা হয়েছিল: 'আজকাল সব গল্পগুলিই প্রায় এক ধরনের আসে। কারখানা ও খনির কুলিদের ঘটনা লইয়া গল্প লেখা এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

উনিশ শ' তিরিশের কাছাকাছি সময়ে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একদিকে এই 'অন্ধজনে দেহ আলো'-গোছের তির্যক আবেদন, (—'তির্যক', কারণ, এই নবীন আগন্তুকরা কোনোরকম সামগ্রিক ব্যাখ্যানেরই প্রয়াস যে গ্রাহ্য করেননি, তার ইশারা আছে 'কল্লোল'-এরই আর একটি লেখাতে,—সেটিও ধূর্জটিপ্রসাদের; তিনি কয়েকজনের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তাঁদের 'বর্ণিত দৃশ্যাবলী সব ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতন খাপছাড়া।' এবং তাঁদের 'চোখ ঐ প্রকার লণ্ঠনের চোখের মতই বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়।')—অন্যদিকে মনস্তত্ত্বের দিকে বেশি আগ্রহ,—কতকটা তারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার হিসেবে যৌনবোধের বাড়াবাড়ি,—কিছু বিদ্যা জাহিরের দুর্বলতা,—তা'ছাড়া শরৎচন্দ্রীয় যাযাবর-ভাবেরই রূপান্তর হিসেবে একদিকে অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'—অন্যদিকে বিভূতিভূষণের ক্রমপরিণতিমুখী অপু,—এবং সেই ধারাতেই প্রবোধকুমারের উপন্যাসকল্প ভ্রমণ-কাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে' ইত্যাদি গ্রন্থ এবং তৎ-সম্পর্কিত প্রবণতা দেখা গেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ সে-যুগের কোনো কোনো লেখকের ম্যাজিকলণ্ঠন-সদৃশ চোখের যে খণ্ড-সামর্থ্যের কথা বলেছিলেন, তার মূলে ছিল পাশ্চাত্ত্য আদর্শের প্রভাব। হয়তো হ্নুট হামসুনের, কিংবা

ফ্লবেয়ার অথবা জোলার প্রভাব পড়েছিল। সে সময়ে মার্কসীয় অর্থনীতির চিন্তা, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব-ব্যাখ্যান ইত্যাদি বিজ্ঞান-বিচিত্রায় নবীন উচ্চ শিক্ষিতের দল বিশেষ আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন। হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং বনফুলের নিগূঢ় মনোলোকবীক্ষার প্রথম প্রবণতা জেগেছিল বহু সম্ভাবনাময় সেই তিরিশের দশকের সূচনা-সন্ধিতেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখনো উপন্যাস লেখেননি; বনফুল তখনই কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন অনুশীলনে প্রবীণ! ১৯১৭-১৮ থেকেই তিনি মাসিক পত্রিকাদিতে কবিতা লিখে আসছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' বেরিয়েছিল ১৯৩০-এ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' তার বছর পাঁচেক পরে। অচিন্ত্যকুমার এবং বুদ্ধদেব সম্পর্কে অতিরিক্ত গীতিকাব্যিকতার কথা শোনা যায়। শ্রীকুমারবাবু এও বলেছেন যে, 'তাঁহারা উপন্যাসে যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন তাহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য; বিশ্লেষণ যাহা কিছু আছে—তাহাও কবিত্ব-সুষমায় রূপান্তরিত হইয়া কবির উচ্ছ্বসিত আবেগ ও গীতি-ঝঙ্কারের প্রকাশ করে।' এঁদের সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ সমালোচকের এ-মন্তব্য এখনো সর্বাংশে অগ্রাহ্য মনে করবার হেতু ঘটেনি। অচিন্ত্যকুমার সরকারী কর্মসূত্রে বাংলার নানা অঞ্চলে ঘুরেছেন,—তাঁর গল্পে-উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর বৈচিত্র্য কম নয়,—পরিহাসে, বিদ্রূপেও তিনি পিছ্‌পা নন। তবু তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতেই ইতস্তত: কবিতার ঘোর আছে। আর, বুদ্ধদেবের 'বাসরঘর' (১৯৩৫) বইখানির মধ্যে শ্রীকুমারবাবু যে 'কবিত্বপূর্ণ অতীন্দ্রিয় আভাসে ভরপুর বর্ণনা' লক্ষ্য করেছিলেন,—১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯-এর মধ্যে লেখা তাঁর 'তিথিডোর' বইখানিরও প্রধান আবেদন তাই-ই। প্রতিভা বসুর মধ্যেও সে গুণ সংক্রামিত হয়েছে। এ লক্ষণকে দোষ বলতে মন রাজী হয় না। কারণ, উপন্যাসে বিশেষ বিশেষ লেখক-মনের বিশেষ বিশেষ মর্জি বা স্বভাবের চেহারা ফুটবে না, এ-রকম কোনো নিষেধ ধর্তব্য নয়। তবে পাঠকের মনে ঠিক কী রকম উপন্যাসের জন্যে বেশি শ্রদ্ধাবোধ জাগতে পারে, সেকথা জিগেস করলে এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আদর্শ বা প্রীতির প্রসঙ্গ হয় উহ্য রাখতে হবে, নয়-তো অকুণ্ঠভাবেই বলতে হবে যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর এবং সরোজকুমার রায়চৌধুরীর কোনো কোনো রচনার মধ্যেই

সে স্বাদ বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। প্রবীণদের মধ্যে, বর্তমানে এঁদের নামই ১৯২৬ থেকে অধুনাতন বাংলা উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে শীর্ষবর্তী বলা চলে। রোম্যাণ্টিক দৃষ্টি এঁদের মধ্যেও কম নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সিদ্ধি এবং ব্যার্থতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাশাপাশি বিদ্যমান; তারাশঙ্কর প্রায়ই নিজের পুনরাবৃত্তি করে থাকেন; অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'এপিক' উপন্যাস-প্রয়াসের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন,—যদিও তাঁর আধুনিকতর লেখাতে দেশ-কাল-জীবনের অভিব্যক্তি সত্যিই আশানুরূপ ভাবে ব্যক্ত হয়নি। বিভূতিভূষণকে নিঃসন্দেহে মনে হতে পারে কেমন যেন গৈরিকধারী, কেমন যেন উদাসীন! সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কৃশানু' বা 'শতাব্দীর অভিশাপ'-এর তুলনায় তাঁর আগেকার বই 'ময়ূরাক্ষী' (১৩৪৩) এবং 'গৃহকপোতী' (১৩৪৪) যদিও বেশি ভালো লাগে, তবু তাঁর সকল প্রয়াসের মধ্যেই একটি বিস্তার-প্রবুদ্ধ মনের সাক্ষাৎ দুর্লভ নয়। বাংলার উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব অথবা পশ্চিম অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা গ্রামপুঞ্জের ওপর একালের লেখকদের দৃষ্টি হয়তো সংহত হতে চাইছে। রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী', 'কুরপালা', 'মালঙ্গীর কথা',—অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাসেম বা 'জোটের মহল' এবং এই ধরনের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যেও এই লক্ষণের নমুনা আছে। কিন্তু কেবলই আঞ্চলিক জীবন-পরিবেশের ওপর জোর দিয়ে সত্যিকার কোনো লাভ হবে কি? শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,—তাঁদের পরে, হাল আমলের তরুণতমদের মধ্যেও কেউ কেউ আঞ্চলিক আদব-কায়দা, উপভাষা বা অন্যান্য ব্যাপারের সমারোহ দেখিয়েছেন। এ লক্ষণ কালধর্ম মাত্র।

প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই হয়তো প্রারব্ধ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে উঠতে পারেন নি। যেমন মণীন্দ্রলাল বসুর রোম্যাণ্টিক স্নিগ্ধতায় এক সময়ে বাংলার উপন্যাস-পাঠকের মন ভুলেছিল,—ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে যেমন মনোবিকলনী মেজাজ দেখা গিয়েছিল,—প্রমথনাথ বিশী যেমন 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলন বিল' প্রভৃতি বইয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে শক্তিমান ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন,—তেমনি এ-কালের খ্যাতনামাদের মধ্যেও অনেক সম্ভাবনার ইশারা আছে,—যদিও শান্ত, গভীর নিষ্ঠার অভাব বা ক্ষণে ক্ষণে মনের পরিবর্তন, রুচির বহুধা গতি ইত্যাদি বাধার উদাহরণও অল্প নয়। কিন্তু সে-সব কথার বিস্তার এখানে নিষ্প্রয়োজন। অতএব অন্য প্রসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া যাক।

॥ প্লট, চরিত্র, নীতিবাদ, গুরুবাদ ॥

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। সে শুধু শৌখীন ভদ্রতা বা সৌজন্য নয়। বাংলা উপন্যাসধারার বিশ্লেষণে তারাশঙ্করের কথা-প্রসঙ্গে সে কথা একটু বিশেষ ভাবেই মনে রাখা দরকার।

একালের উপন্যাসে 'প্লট', সংঘট (situation), চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি উপাদান সম্বন্ধে, অথবা উপন্যাসের সামগ্রিক আবেদন সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই মন দিতে হয় লেখকদের তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক অনাসক্তি পালনের' প্রয়াস-প্রযত্নের দিকে। শরৎচন্দ্রের নিজের লেখাতে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ, বিশ্বাস বা সংস্কারের প্রভাব কম ছিল না। তাঁর সমকালীন এবং তাঁর পরবর্তী লেখকদের মধ্যে তাঁর প্রভাবের চিহ্নও কম নয়। তথাকথিত 'বাস্তবতা' রক্ষার দিকে ঔপন্যাসিকরা বেশি মনোযোগী হয়েছেন যেন। আমাদের অতীতের উপন্যাস-চর্চার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে, সে-দিক থেকে খুব বড়ো কোনো ভেদ চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু ব্যাপক একটি প্রবণতা হিসেবে বস্তুজগতের দিকে একালের ক্রমব্যপমান আগ্রহের লক্ষণটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাঁশরী'র মধ্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে নবপর্বের এই নবীন লেখকদের অতি-মনোযোগের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই সূত্রে সে-কথাও মনে পড়ে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও বস্তুজগৎ উপেক্ষিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও না। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রতিদিনের ব্যবহারিক জগতের ঘাত-প্রতিঘাত বা বস্তু-পরিচয় কোনো দিনই উপেক্ষা করেননি। তবু, এঁদের পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিগত কিছু কিছু প্রভেদ বা তারতম্য ছিল। এঁদের পরবর্তীদের মধ্যে সে-দিকে আরো পার্থক্য দেখা গেছে। সেই কারণেই,—একালের বাংলা উপন্যাসের মূল প্রকৃতির কথা ভেবে দেখতে গেলে শরৎচন্দ্রের গুরু-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ অবশ্যই মনে পড়বে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে বসে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন:

> 'তিনি ছিলেন আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের শিক্ষক। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এই নগরেরই এক পথের ধারে। ডেকে বললেন……আমার আদেশ রইল—যা সত্যই জানো না, তা কখনো লিখো না। যাকে যথার্থ উপলব্ধি করনি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন করে পাওনি,

তাকে ঘটা করে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হ'তে চেয়ো না।......সেদিন তাঁকে জানিয়েছিলাম তাই হবে।'

চন্দননগরের এক সভায় শরৎচন্দ্র আবার অন্য সূত্রে বলেছিলেন: 'আমি মানুষের ভেতরটা বরাবর দেখি। এ বল্‌লে, সে বল্‌লে বলে পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নেওয়া—এ আমার কোনোদিন ছিল না। যার অতি বড় দুর্ভাগ্য, সে এ করবে। সত্যিকারের জীবন দেখতে গেলে শুচিবাইগ্রস্ত হলে চলে না। যে অভিজ্ঞতার ফলে গোর্কি, টলস্টয়, সেক্সপীয়র পর্যন্ত অত শুচিগ্রস্ত হতে পারেননি।'

চন্দননগরের এই আলোচনা-সভাতেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির' কথা বলেছিলেন। 'বামুনের মেয়ে' লেখবার সংকল্প সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মনে পড়েছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যখন তাঁর ঐ বইখানি লেখবার সংকল্প জানান, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন—'এখন ত কৌলীন্য নেই, এক্‌জনের একশ'টা বিয়ে নেই, প্লটের ত ভাবনা নেই—তবে আর এটাকে ঘেঁটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে, লেখো, কিন্তু কিছু মিছে কল্পনা কোরো না।'

এই শুচিবায়ুবর্জিত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আমাদের উপন্যাসের উদ্ভব-যুগে ছিলনা,—বঙ্কিম-যুগেও এ বিষয়ে লেখকদের মন খুব বেশি সজাগ ছিলনা। বঙ্কিম বলেছিলেন: 'যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।' আমাদের উপন্যাসের উদ্ভব-পর্ব থেকে শুরু করে বঙ্কিম-যুগের প্রায় শেষ পর্যন্ত, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ সেই আদর্শই সম্মানিত হয়েছে। সেকালে আমরা বাস্তবতা চেয়েছি, কিন্তু ততোধিক যা চেয়েছি, সে ছিল সুনীতি! বিশেষ দেশ-কালে সীমাবদ্ধ বাঙালী সংসারেরই সুনীতি।

কিন্তু বঙ্কিম-যুগের বাংলা উপন্যাসের এই আদর্শের সঙ্গে একালের ইংরেজি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সমারসেট মমের ধারণা মিলিয়ে দেখলেই একালের পরিবর্তিত প্রবণতার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। মম্ বলেছেন—বোধবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো সুস্থ মানুষই উপদেশ-প্রাপ্তির আশা নিয়ে কিংবা নীতিশিক্ষার আগ্রহবশে উপন্যাস পড়তে উদ্যোগী হন না।

জগতে কোনো শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধেই পৃথক পৃথক অংশ বা উপাদানের কথা আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। তবু, 'প্লট', 'সেটিং', 'চরিত্র'—এই তিন উপাদানের মধ্যে আমাদের গত শতকে,—উপন্যাসের আদিপর্বে প্রধান

ঝোঁক ছিল 'প্লট' তৈরির দিকে। তারপর ক্রমশঃ 'চরিত্র' সম্বন্ধে আগ্রহের মাত্রা বেড়েছে। বঙ্কিমের নিজের লেখার মধ্যেই তার নজীর আছে। সেই আদর্শ দেখে তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী লেখকরা সেই পরিবর্তিত লক্ষ্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে, চরিত্রের দিকে নজর পড়লেও 'প্লট' উপেক্ষিত হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই তা হতে পারেনি। বঙ্কিম-যুগের পরে রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই মনোরহস্যের দিকে বেশি আগ্রহ দেখা দেয়। উদ্ভব-পর্বের বাংলা উপন্যাসের প্রধানতম অভাব ছিল সুসংবদ্ধ 'প্লট'-এর। ১৮০০ থেকে ১৮৭২-এর বাংলা উপন্যাসতত্ত্বের কথা ভাবতে গেলে 'প্লট' এবং 'সেটিং'-এর তত্ত্বই মূল আলোচনার বিষয় বলে মনে হয়। বিবর্তনের ধারায়, ক্রমশঃ রুচি এবং সামর্থ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা উপন্যাসে ক্রমশঃ চরিত্র জেগেছে, মন জেগেছে!

বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লেখা শুরু করেন, সে আমলে, কিংবা তার আগেও, গল্পের ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোনো টানই যে না-থাকতো তা' নয়। সে সব গল্পে, সে-যুগের দাবি-দাওয়াও একেবারেই যে না ফুটেছে, তাও নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্‌গা-জোড়ের কিছু কিছু বাস্তব ছবি এবং তারই মধ্য দিয়ে কল্পিত প্লট গেঁথে তুলতেই লেখকরা উৎসাহ বোধ করেছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' ছিল এই ধরনের 'চিত্রোপন্যাস'। দৃষ্টান্ত হিসেবে সে-কালের জনপ্রিয় ঐ বইখানির ওপরেই দৃষ্টি সংবদ্ধ রেখে বলা যেতে পারে যে, সে-গল্পে পাশাপাশি অনেকগুলি খণ্ড-চিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে; পৃথক পৃথক চিত্রগুচ্ছের মধ্যে গভীর বা অকাট্য তেমন কোনো যোগ অবশ্যই চোখে পড়ে নি! ঠকচাচার মতন চিরস্মরণীয় চরিত্রও সে-গল্পে আছে বই কি। গল্পের আসল নায়ক মতিলাল তার পাশে ম্লান হয়ে গেছে। আর, অন্যান্য উপাদানের কথা না তুলেও একথা বুঝতে বাধা নেই যে, 'আলালের ঘরের দুলাল' বইখানিতে ঘনসংবদ্ধ কোনো প্লটের অস্তিত্বই নেই! আরো আগে 'নববাবু বিলাস' প্রভৃতি সমাজচিত্রের মধ্যেও এইসব লক্ষণই দেখা গিয়েছিল। সে-কালের এই ছিল সাধারণ স্বভাব। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক যুগ-সূচনার লক্ষণ দেখা দেয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম যথার্থ চিত্তাকর্ষক 'প্লট' পরিবেষণ করলেন।

'গল্প' এবং 'প্লট' কথা দুটির প্রভেদতত্ত্বটি এই সূত্রে একবার ভেবে দেখা দরকার। বিশেষ বিশেষ সময়ধারার মধ্যে আশ্রিত

নানা ঘটনার প্রবাহ বা পারম্পর্যের ধারণাটুকুই 'গল্প'; অন্য পক্ষে, 'প্লট' হোলো এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কার্য-কারণগত যোগ। 'গল্পে'র মধ্যে সময়গত ধারার বোধটুকুই প্রধান; কিন্তু 'প্লট'-এর সার্থকতা পাঠকের কার্য-কারণবোধের দর্পণে!

উপন্যাসের পরিণতির ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই 'প্লট'-এর সাবালকত্ব-প্রাপ্তি! অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব-চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু 'প্লট'-এর ত্রুটি কোনো ভালো উপন্যাসের পক্ষেই গুণের কথা নয়। তবে, এক ধরনের শিথিল-প্লটের উপন্যাসকেও জনপ্রিয় হতে দেখা গেছে। বাংলায় শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও কার্য-কারণের আবশ্যিক সম্পর্ক উপেক্ষা করে খুব বেশি এগিয়ে যাবার প্রশ্রয় নেই। আয়তনে ছোটোই হোক্ আর বড়োই হোক্, সার্থক উপন্যাসে বর্ণনীয় ব্যক্তি, ঘটনা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি সমস্ত উপাদানই পরস্পর সু-গ্রথিত, সু-সংযুক্ত এবং সু-পরিকল্পিত হওয়া দরকার। অর্থাৎ, লেখকের মনের পরিণতি দরকার। এবং পাঠকের পরিণত মন ব্যতিরেকে লেখকের এই সিদ্ধি কোনো কালেই সম্ভব নয়। কারণ, পাঠকের দিক থেকে দাবি না জাগলে লেখকের দিক থেকেই বা সৃষ্টি ঘটবে কেন?

পরিণত মনন-ক্ষমতা ব্যতিরেকে 'প্লটের' উৎকর্ষ ঘটানো সম্ভব নয়। নিছক গল্প-পাঠের কৌতূহল এক জিনিস,—আর, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নানান্ মানুষের নানান্ আচরণের যোগটি উপলব্ধি করে জীবন-রঙ্গসমারোহের বিস্ময়রস হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য অন্য জিনিস। মননের গুরুত্ব বা আবশ্যিকতার কথা এই দিক থেকেই ভেবে দেখা দরকার। আমাদের সাহিত্যে যখন উপন্যাসের দৃষ্টান্তই দেখা দেয়নি, সে আমলে আমাদের সাহিত্যশিল্পীরা যে মননহীন ছিলেন, বা দুর্বল মননে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্র যে ভারাক্রান্ত ছিল, সে কথা নয়। উপন্যাসের প্রসঙ্গে যখন 'মনন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন উপন্যাস-রীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশনীয় মনক্রিয়ার কথাই বুঝিয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে উপন্যাস-রূপেরই পরিণতি ঘটেনি। ফলে, সে-যুগের 'উপন্যাস'-সূচনাকারী রচনাগুলির মধ্যে বাস্তব চিত্র এবং বাস্তব প্রসঙ্গ থাকতো বটে,—ইতিহাসের দিকে সে-যুগের লেখকদের আগ্রহের চিহ্নও দুর্লভ নয় [যেমন ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসে],—কিন্তু, উপন্যাসে বর্ণিত 'চরিত্রে'র ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কার্যকলাপ ইত্যাদির ফলে গল্পবস্তুর কার্য-কারণ-

ঘটিত চিত্তাকর্ষক অন্বয়ের অকাট্যতা তখনো দেখা দেয়নি। প্লটের আসল কথা হোলো গল্প বা আখ্যানবস্তুর মধ্যে এই কার্যকারণাত্মক অন্বয় রক্ষা করা।

'প্লট' সম্বন্ধে এই মন্তব্যের পরে 'সংঘট' বা situation-এর কথা স্মরণীয়। দেশ, কাল, পাত্র,—এই তিনের যোগেই বিশেষ সংঘটের বিশেষত্বের উদ্ভব। সব রকম গল্প-উপন্যাসের মধ্যেই দেশ-কাল-পাত্রের সমাবেশ ঘটে থাকে। কিন্তু এও মনে রাখা দরকার যে, এই তিনের সমাবেশ ঘটলেই, তাকে ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট সংঘট-চেতনার দৃষ্টান্ত বলা চলেনা। গল্পধারার আভ্যন্তরীণ কার্য-কারণের যোগ তখনই পরিণত মননের স্বাক্ষরবাহী হয়ে ওঠে, যখন বিচিত্র সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথোচিত সতর্ক থেকে, লেখক তাঁর বিভিন্ন চরিত্রের ভাবনা বেদনার নানা আচরণ রূপায়িত করেন,—এবং পাত্র-পাত্রীর এই জাতীয় কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই গল্পের প্রবাহ যখন সচল হয়ে ওঠে! এই রকম গল্প-প্রবাহের মধ্যে যে-লেখক নিপুণভাবে তাঁর আপন কালের রুচি, বিশ্বাস এবং মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের স্বাদ সঞ্চার করতে পারেন, তাঁরই উপন্যাসে সত্যিকার 'আধুনিক সংঘট' জন্মগ্রহণ করে।

ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাস দেখা দেবার অনেককাল আগে, প্রাচীন গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে Aristides নামে এক লেখক কতকগুলি কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাঁর বাসস্থানের নাম অনুসারে সেই সব কাহিনী 'Tales of Miletus' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মূল রচনাগুলি লুপ্ত হয়ে গেলেও অ্যারিসটিডিস-এর অনুকরণে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সে আদর্শের যে-সব অনুকরণ দেখা গেছে, পণ্ডিতদের চোখে, সেইসব নকলের মধ্যেও সমকালীন সমাজ-জীবনের ব্যঙ্গ-কৌতুকময় সমালোচনার দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে। তারপর, খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনাকালে Lucian-এর বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে আবার সমকালীন সমাজের ছায়া পড়েছিল। তারও বহুকাল পরে য়ুরোপীয় মধ্যযুগের পুরোহিতসমাজ এবং নারীসমাজের ছায়া পড়েছিল ইটালির নানান্ উপন্যাসে। প্রসিদ্ধ ইতালীয় গল্পকার গিয়োভ্যানি বোক্যাশিওর আগে জন্মেছিলেন ফ্রান্সেস্কো দা বার্বারোনা (১২৬৪-১৩৪৮ খ্রীঃ)। মানব-সংসারের যথাযথ বাস্তব ছবি আঁকবার দিকে এঁদের সকলেরই বিশেষ ঝোঁক ছিল। খ্রীষ্টাব্দের পনেরোর শতকের শেষ নাগাদ ফ্রান্সেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা গেছে। স্বদেশে বিদেশে, উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তবতার ঝোঁক

পুরোনো, পরিচিত ব্যাপার। কিন্তু 'আধুনিক সংঘট' বললে শুধু 'আধুনিক' যে-কোনো প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র বোঝায় না।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবার আগে বিষয়টি আরো পরিস্ফুট করবার জন্যেই বিদেশী সমালোচকের দেওয়া এ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা স্মরণ করা আবশ্যক। একজন আলোচক এই দিকটির বিশ্লেষণসূত্রে দেখিয়েছেন যে, সমাজের 'সমকালীন' দাবি-দাওয়ার চৈতন্য ফীলডিং-এর উপন্যাসে যে পরিমাণে দেখা গেছে, রিচার্ডসনের উপন্যাসে সে পরিমাণে নয়। থ্যাকারে এবং ট্রলপ্ উভয়েই তাঁদের নিজের নিজের যুগের ঐতিহাসিক উপাদান বা তথ্যগত মাল-মশলা জমিয়ে গেছেন বহু পরিমাণে। কিন্তু ডিকেন্স যেমন গভীর অন্তর্বোধের গুণে তাঁর ডেভিড কপারফিল্ডের ইউরিয়া হীপ (Uriah Heep) চরিত্রটিকে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, সে রকম সামর্থ্যের দৃষ্টান্ত পূর্বোক্তদের রচনায় বড়োই দুর্লভ! যথার্থ যুগচেতনার ফলেই ইউরিয়া হীপ্‌কে ডিকেন্স আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁর 'ব্লিক হাউস'-এর (Bleak House) মধ্যে সে-যুগের আভ্যন্তরীণ শক্তি-সংঘর্ষের নিপুণ রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন তিনি। থ্যাকারে বা অ্যাণ্টনি ট্রলপের লেখাতে যুগবিশেষের বহুতর তথ্যের সরবরাহ ঘটলেও সে সব লেখাতে যুগোচিত সংঘট-বোধের পরিচয় নেই। এই ভাবে তুলনা করে সমালোচক জানিয়েছেন যে, 'বর্তমানের' চেতনা আর সমকালীন জীবন-সংঘটের বোধ ঠিক এক জিনিস নয়।[১৫] 'সমকালীন সংঘট-বোধ' উক্তিটির অভীষ্ট অর্থ এই যে, বিশেষ ঔপন্যাসিক যে বিশেষ যুগেরই অধিবাসী, সে সত্য, এবং সেই যুগের বিশেষত্বও তাঁর জানা চাই। সেই যুগের বিশেষ যে-সব দাবি-দাওয়ার মধ্য দিয়ে অন্য কালের সঙ্গে তার পার্থক্য অনুভব করা যায়, সেই সব দাবি-দাওয়ার প্রকৃত অনুভূতি ব্যতিরেকে পূর্বোক্ত সংঘট-বোধ অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়।[১৬]

১৫। 'Awareness of the contemporary situation is not quite the same as awareness of the present.'—Walter Allen প্রণীত 'The Novel of To-day' (১৯৫৫ নভেম্বর) দ্রষ্টব্য।

১৬। 'By the novelist's awareness of the contemporary situation, we mean the novelist's sense of the age in which he lives, his intuitive feeling for the stresses and pressures that make it what it is and distinguishes it from other times.'—ঐ, পৃঃ ২০।

জে. ডি. স্কট এবং পি. এচ্. নিউবি, দু'জনেই অতি আধুনিক উপন্যাস-লেখক। প্রথম ব্যক্তি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। তাঁর 'The End of an old Song' বইখানির মূল কথক যিনি, সেই প্যাট্রিক শ (Patrick Shaw) চরিত্রটির মধ্যে স্কট নিজেই যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ রচনার আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লেখক একদিকে যেমন রোম্যাণ্টিক জাতীয়তাবোধ ('Romantic nationalism') পর্যালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি জাতীয়তা-বিশ্বাসী চরিত্রের রূপোদ্ঘাটন করেছেন (সমালোচক বলেছেন : 'A study in national character')। সেই সমালোচকের কথা থেকেই আরো জানা যায় যে, আমাদের এই আধুনিক বা বর্তমান কালেরই বিশেষ এক সমস্যার পরিচয় আছে এই গল্পের পাত্রপাত্রীর মধ্যে। ঐশ্বর্যময় অতীতের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার স্মৃতি নিয়ে, প্যাট্রিক শ'কে জীবনের পথ চলতে হয়। প্যাট্রিকের বন্ধু Alstair-এর মধ্যে স্কট একটি গ্রাম্য বালকের রূপ ফুটিয়েছেন। সেই বালকটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধী। তার লক্ষ্য ব্যাপ্তির দিকে!

শিল্পকৌশলগত বিশেষত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে J. D. Scott-এর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি রবার্ট লুই স্টিভেনসন এবং জোসেফ কনরাড-এর ধারাতেই লিখে থাকেন। আর, নিউবির সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি ডি-এচ লরেন্সের অনুসারী,—বা তাঁরই আদর্শে প্রভাবিত। লরেন্সের 'The Rainbow' এবং 'Women in Love' বই-দুখানির মধ্যে দৃশ্য বস্তু রূপায়ণের যে জাদু দেখা যায়, নিউবির লেখাতেও নাকি বর্ণনার সেইরকম সজীবতাই (সমালোচক বলেছেন 'hallucinatory quality') বিদ্যমান। নিউবির অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে ১৯৫০-এর পরে লেখা 'A Step to Silence', 'The Retreat' এবং 'Picnic at Sakkara' বই-তিনখানির নাম করা চলে। তাঁর 'A Step to Silence'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র Oliver Knight। ১৯৩৭ সালে এক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যায়তনের ছাত্রাবস্থায় Hesketh নামে এক প্রবীণ ছাত্রের সঙ্গে সহপাঠী হিসেবে অলিভারের আলাপ হয়েছিল। Oliver-এর নিজের বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। Hesketh তার জীবনে ইতিপূর্বে অনেক কাজেই নিষ্ফল হয়েছে। অবশেষে সে এসে জুটেছে শিক্ষকদের সেই বিদ্যাভবনে। হেস্কেথের জীবনে তার ভাঁড়ামি আর তার আন্তরিকতা, এই দুইয়ের ভেদ বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অলিভার সত্যিই তার পক্ষপাতী

হয়ে উঠেছে। শেষে একদিন অন্যান্য শিক্ষকদের সামনেই ক্লাস নিতে বাধ্য হয়ে হেস্কেথ অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে লোক-হাসানো ব্যবহার করে বসে। ফলে, তাকে কলেজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অলিভারও কলেজ ছেড়ে দিয়ে বিমান-বাহিনীতে যোগ দেয়।[১৭]

উপন্যাসে সমকালীন সংঘট-চৈতন্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে এই বইখানির কাহিনী এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনার বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে। এই অবস্থাবৈশিষ্ট্যের গুণে এ-কাহিনী ব্যক্তিগত গল্পের স্তর থেকে উঠে জায়গা পেয়েছে আরো ব্যাপক, আরো বিস্তীর্ণ এক চরিতার্থতার মধ্যে। সমালোচক বলেছেন: 'কালের বিচিত্র লক্ষণ,– যুদ্ধ যখন আসন্ন, সেই ১৯৩৭ সালটাই যেন উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[১৮]

যে বিদ্যাভবনে শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা চলেছে, সেখানকার আইন-কানুনে,—সেখানকার অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠানে এবং অকাট্য সব বিধি-নিষেধের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। হেস্কেথ প্রাণপণে তার পরিবেশের যুক্তিহীন দাবী মেটাবার চেষ্টা করে। বড় করুণ সে প্রয়াস! অন্য পক্ষে, তার বন্ধু অলিভারের কাছে সেই নীরস বিধি-বিধানের কোনো দামই নেই! যে যুগ প্রাণের দিকে চোখ বুজে থাকতে চায়,—সেই রকম অকালে, প্রাণ-সচেতন, কিন্তু প্রথাভীরু মানুষের কপালে অদৃষ্ট যা লেখবার তাই লিখেছিলেন। হেস্কেথ-কে তাড়িয়ে দেওয়া হয়,—অলিভার তার সাধ্যানুসারে বিদ্রোহ করে।

নিউবির 'দি পিক্‌নিক্ অ্যাট সাক্কারা'তে ('The Picnic at Sakkara') ইংরেজ এডগার পেরি (Edgar Perry) হলেন কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর ছাত্র মৌটিয়া খাশলাৎ (Mautiya Khaslat) মিশরের জাতীয় আন্দোলনের যে বিশেষ মনোভাবের বাহক, পেরির কাছে সে-ভাবটি

১৭। এইখানে সমালোচক বলেছেন, 'Newby is also like Lawrence in that he manages to catch his characters at the very moment of living, before the ntellect has had time to intervene, rationalize and generalize the moment experienced.' এ ছাড়া বিশেষভাবে নিউবির এই বইখানি সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে: 'On one level, then, the novel deals with that disillusionment which is part of growing up, but this familiar subject is given unusual significance because of the circumstances in which the action is played out.'

১৮। The circumstances of the time itself—1937, with war just round the corner—become almost a character in the novel.'

দুর্বোধ্য। পেরি যে কেবল মিশরের আন্দোলনের ব্যাকুলতা বোঝে না, তা নয়,—তার নিজের স্ত্রীর জগৎটাই বা সে কতটুকু বোঝে? সে মহিলাটি তাঁর নিজের বিশ্বাস আর সংস্কার নিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। নিউবি তাঁর এই উপন্যাসে মিশরের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এই বিশেষ পারিবারিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ সমাবেশ ঘটিয়ে সমকালীন সংঘট-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর The Retreat উপন্যাসে Oliver Knight বলেছেন: জেন আর আমি, দুজনে একই অরণ্যে পথ হারিয়েছি; পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি নিরন্তর। পালাবার পথ নেই। আমাদের শুধু চলতেই হবে।' অলিভার নাইটের মধ্যে আধুনিক কালের এই নিরুপায় মনোভাবই চোখে পড়ে।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সমকালীন পরিস্থিতি,—পরস্পর-প্রতিফলনশীল এই দুই বিষয়ের,—এই অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্বের অরণ্যে হারিয়ে গেছে নিউবি-র নায়ক।[১৯]

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে, বাংলা উপন্যাস-প্রবাহে প্লটের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস একটি প্রত্যাশিত ব্যাপার হিসেবেই স্বীকার্য; কারণ পুরোবর্তী প্রবীণরা প্লটের চর্চা যথাসাধ্য করে গেছেন। উনিশ শতকের 'বাবু'র গল্প থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের আমল অবধি এ বিষয়ে অনেক চর্চা ঘটে গেছে—এবং তার ফলে, প্লট-সৃষ্টির বিশেষ ঐতিহ্যই দাঁড়িয়ে গেছে। একালের যথার্থ 'আধুনিক' উপন্যাসে আমরা তাহলে কোন্ বিশেষ লক্ষণের বিশেষ প্রাধান্য আশা করব? 'প্লট' তো ভালো ভাবে বাঁধতেই হবে, চরিত্র' তো বিশ্বাসযোগ্য, সংগতিময় এবং বিস্ময়জনক হওয়া দরকারই। এসবের সার্থকতার বেশ বোধগম্য মান দাঁড়িয়ে গেছে এখন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্ত',—রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের 'জ্যাঠামশাই' দৃঢ়তায় কিংবা স্বাভাবিকতায় অতুলনীয়। অপেক্ষাকৃত ছোটো আয়তনের গল্প-প্রবাহের মধ্যে দুটিই বিস্ময়জনক সার্থকতার দৃষ্টান্ত। তাঁরা অপেক্ষাকৃত বড়ো ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টির নমুনা রেখে গেছেন। কিন্তু একালে যাঁরা বাংলা উপন্যাস লিখে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হবেন, তাঁদের উপন্যাসে এ-সবের অতিরিক্ত আর কোন্ বিশেষ লক্ষণের চরিতার্থতা

১৯ 'The Newby hero is lost in a wood, a wood made up both of personal relationships and of the contemporary situation, which for Newby mirror each other.'

পরিস্ফুট হবে? উপন্যাসের পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া প্রত্যাশিত ব্যাপার। সমারসেট মম্ বলেছেন যে, জগতের সেরা ঔপন্যাসিক হিসেবে বল্‌জাক্-এর কথাই তাঁর মনে পড়ে এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ এবং শান্তি' বইখানিই তাঁর শ্রদ্ধা দাবি করে। কারণ, 'যুদ্ধ ও শান্তি'র মধ্যে ইতিহাসের ঘটনা-সমারোহের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিচিত্র চরিত্রের সমৃদ্ধি দেখা গেছে। মমের কথা বাংলায় অনুবাদ করে নিয়ে বলা যায় যে, ঐ বইখানির মধ্যে মনুষ্যজীবনের সম্পূর্ণ ছবি ফুটেছে। তিনি সে-উপন্যাসের অন্তর্নিহিত দর্শনেরও উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের ধারা-র অন্তর্লীন নিয়ন্ত্রী শক্তির তাৎপর্য বুঝেছিলেন টলস্টয়। তাঁর সেই বিশেষ বিশ্বাসের মর্মকথা এই যে, কেবল বড় বড় স্মরণীয় মানুষেই যে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা নয়; দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য শক্তির তাড়নাতেই মানুষের ইতিহাস বদ্‌লে যায়, —সেই অনতিপরিচিত, অনতিজ্ঞাত শক্তির ইচ্ছাতেই এ-সংসারে মানুষের জয়-পরাজয় ঘট্‌ছে।

পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যের দিকে নজর রেখে এইসব কীর্তির কথা আজ বাংলা উপন্যাসের ছোটো-বড়ো সব লেখকেরই ভেবে দেখা দরকার। টলস্টয় যেমন তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি'র মধ্যে সামগ্রিক জীবনবোধের নমুনা রেখে গেছেন, ফ্লবেয়ার যেমন যথার্থ বাস্তবের আগ্রহ সঞ্চার করে গেছেন, একালে তেমনি আধুনিক জীবন-পরিবেশের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বের, (অর্থাৎ একালের লেখকদের আন্তরিক সন্ধানের গুণেই) নতুনতর আবিষ্কার দরকার। কেবল কলকারখানার বর্ণনা, ইতিহাসের বিশেষ পর্বের তথ্যমাত্র পরিবেষণ, কিংবা এইরকম অন্য কোনো বহিরঙ্গ-সমৃদ্ধির মুদ্রাদোষটুকু মেনে নিলেই চলবে না। জীবনবোধের সংস্পর্শ ছাড়া এসব পদার্থ মুদ্রাদোষ নয়তো কি? কলকাতার পুরোনো আমলের বনেদী জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা হয়তো কিছুদিনের জন্যে পাঠকের মন ভোলাতে পারে,—কিন্তু সে আর কতদিন? 'পথের পাঁচালী'র করুণ রসের যুগও আমরা পার হয়ে এসেছি। এখন সেসব কথাও অতিক্রান্ত অধ্যায়। জমিদারের খেয়াল আর বদ্‌খেয়ালও পুরোনো হয়ে গেছে। কয়লাখনির মজুর, পদ্মানদীর মাঝি, বীরভূমের বেদে ইত্যাদি নানান্ শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে। একালের লেখকরা যদি শুধু বিষয়-নির্বাচনের এই বৈচিত্র্য দেখাতে চান, তাহলে তাঁরা হয়তো পদ্মা ছেড়ে ইরাবতী ধরবেন,—বীরভূম ছেড়ে বাঁকুড়া! কিন্তু সে পথেও সিদ্ধির সম্ভাবনা নেই! অথবা, বিষয়টা যাই

হোক্, কোনো কোনো লেখক হয়তো তাঁদের রচনায় কৌশলের ওপরেই বেশি জোর দিচ্ছেন। তাতেও সার্থকতা নেই। ইংরেজি উপন্যাসে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বা জেম্‌স্ জয়েস্ এই আঙ্গিক বা প্রযুক্তির ওপরে চূড়ান্ত মনোযোগ দিয়ে গেছেন। মনের প্রবাহধর্ম ভালো করে দেখাতে গিয়ে তাঁরা যে বিশেষ রীতি দাঁড় করিয়েছিলেন, তাকে বলা হয়েছে 'চৈতন্যস্রোতের রীতি'। কিছুদিন আগেও সেই রীতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে ইংরেজি উপন্যাসের ছোটো বড়ো বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে। ১৯১৪ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে জয়েসের Ulysses লেখা হয়। ডাবলিনের অধিবাসী ইহুদী লিওপোল্ড্ ব্লুমের (Leopold Bloom) মাত্র একটি দিনের [চব্বিশ ঘণ্টারও কম] জীবনকথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছিলেন জয়েস। হোমরের 'অডিসি' কাব্যের এক-একটি সর্গের সঙ্গে জয়েস তাঁর 'ইউলিসিস্'-এর এক একটি অধ্যায়ের আখ্যানগত এক রকম যোগ দেখিয়েছিলেন। একালের মানবজীবন-পরিবেশের অনেক কিছুই ঐ চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ডাকঘর, সাধ'রণের স্নানের ঘর, খবরকাগজের আপিষ, শৌচাগার, মদের দোকান, গির্জা, পতিতালয় সব কিছুই 'ইউলিসিস'-এর মধ্যে জায়গা পেয়েছে। সেই সঙ্গে লেখকের গদ্যের কসরৎ, পাণ্ডিত্যের প্রক্ষেপ এবং বহুতর বৈদগ্ধ্যের সমারোহ লক্ষ্য না করে উপায়ান্তর নেই! একালের ইংরেজি উপন্যাসে উদ্ভট মৌলিকতার প্রবর্তক হিসেবে তাঁর খ্যাতির অন্ত নেই। সাহিত্য-রীতির অভিনবত্বের দিক থেকে তো বটেই, তা ছাড়া ইংরেজি ভাষাবিবর্তনের ধারাতেও তাঁর নিজস্ব অভিনবত্বের প্রভাব রইলো। আর, যে সব 'বাস্তব' আচরণ এতোদিন সভ্য সমাজে গ্রন্থভুক্ত হতে সংকোচ বোধ করতো, জয়েসের রীতির দাক্ষিণ্যগুণে আগেকার আমলের সেই সব কুণ্ঠিত বাস্তবতাও সাহিত্যের পংক্তিতে জায়গা পেয়ে গেল! টলস্টয়, ডষ্টয়েভস্কি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রুশ লেখকরাও বাস্তব জীবনের রূপায়ণে কুণ্ঠিত ছিলেন না। চেকভ্‌কে বাস্তব আনুগত্যের দিক থেকে কারো চেয়ে খাটো বলা চলে না। এঁরা সকলেই মানুষের মনের বিচিত্র তত্ত্ব যথোচিত সমাদরের সঙ্গে স্বীকার করতেন। মার্সেল প্রুস্ত্, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ প্রভৃতি লেখক-লেখিকাও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিষ্ঠা বজায় রেখে বাস্তবতার চর্চা করে গেছেন। জয়েসেরই সমকালে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের প্রথম উপন্যাস The Voyage Out প্রথম ছাপা হয়। তারপর উত্তরোত্তর অন্যান্য নানা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সেই পথ-

সন্ধান ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়েছে। বের্গসঁর প্রভাব ছিল তাঁরও মনে, প্রুস্তেরও মনে। কতকটা নতুন তত্ত্ববোধের মধ্য দিয়ে এবং কতকটা লেখার বিশেষ কায়দা চর্চার সমবায়ে প্রুস্ত্, জয়েস, উল্‌ফ্ প্রভৃতি লেখকগোষ্ঠী যে মৌলিকতা এনেছিলেন, সে কিন্তু খুব বড়ো কীর্তি নয়!

এ-কথা বার বার মনে হয় যে, আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিককে এই ধরনের জৌলুষের মোহ ত্যাগ করতে হবে। কারণ, পৃথিবীতে কোনো জৌলুষেরই দীর্ঘস্থায়ী দান নেই! আজকের জৌলুষ কালকের আবর্জনা-স্তূপে জায়গা পায়। অপর পক্ষে, সব যুগেই মানুষ কিছু-না-কিছু স্থায়ী বিশ্বাস অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। আমাদের অনেক বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি বটে, তবু আমরা কি নতুন কিছুই পাইনি? পুরোনো কালে যা যা ছিল, তার কিছুই কি আজ বাকি নেই? সনাতন বা বহু দীর্ঘ-মেয়াদী কোনো ভরসা কি চোখে পড়ে না? কোনো আশা কি অবশিষ্ট নেই? ঔপন্যাসিককে সেই স্থায়ী অবলম্বনের কথাই ভাবতে হয়। ইংরেজিতে অনেক পূর্বসংস্কার তিরোহিত হয়েছে, বটে। একজন বেশ বলেছেন—অলডাস্ হাক্সলির কল্পনা খুঁজেছিল 'নতুন সাহসী দুনিয়া'—'Brave New World'। পরে কিন্তু যা এলো, তার চেহারা অন্যরকম। নতুন সাহসী দুনিয়া নয়, এলো 'পতিত-জমি'! দেখা দিলো এলিয়টের গ্রন্থনাম —'The Waste Land'!

বিজ্ঞান নিয়ে এলো অ-বিশ্বাস। বিদ্রূপের কালি ঘন হয়ে উঠলো পোড়-খাওয়া আদর্শবাদীর কলমে। হাক্সলি তাঁর 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্টে'র (Point Counter Point) মার্ক র‍্যামপিয়নের (Mark Rampion) মুখ দিয়ে বলেছেন—চাই 'পুরো এবং খাঁটি মনুষ্যত্ব। খবরকাগজ-পড়ুয়া নয়, নাচগান আর রেডিও-পাগল নয়। শিল্পপতিরা যেসব মাপা আমোদ বরাদ্দ করেছেন, তার ফলে, কাজেও যেমন, অবসরেও তেমনি মানুষ ক্রমশঃ বোকামির যন্তর হয়ে উঠবে। কিন্তু তাঁদের রুখতে হবে। মানুষ হবার চেষ্টা কর।'

এতো কথার পরেও কিন্তু সেদেশে সময়ের মর্জি বদলায়নি। হাক্সলি বৌদ্ধদর্শন, বেদান্ত এবং 'তাও'-মত সম্বন্ধে অনুশীলনে আত্মসমর্পণ করেছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুনিয়ার অবস্থা কী রকম হবে, সে বিষয়ে তাঁর ভাবনা ফুটেছে ১৯৪৯-এ প্রকাশিত তাঁর 'এপ অ্যাণ্ড এসেন্স' (Ape and Essence) বইয়ের মধ্যে। তারপর ১৯৫৫-তে বেরিয়েছে তাঁর 'The Genius and the Goddess'।

আশাভঙ্গ, বিদ্রূপ, অবিশ্বাস,—কিংবা মনস্তত্ত্বের মারপ্যাঁচে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ,—কিংবা কোনো অভিনবত্ব সন্ধানের মনোভাব,—কেবল এইসব বেড়ার মধ্যে বাঁধা পড়লে উপন্যাসের যথার্থ আদর্শ যে কী, তা আমাদের স্রষ্টাদের নজর এড়িয়ে যাবে। জগতে ভালো মন্দ দুই-ই আছে। এই দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতির নিত্য নতুন অভ্যুদয় ঘটছে। সেই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে উপন্যাসের লেখককে অনেক খবরও রাখতে হয়, আস্বাদনও পেতে হয়। এবং নানা বই পড়তে পড়তে, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পেতে পেতে, ক্রমশঃ তাঁর মনে জীবনানুভূতির একরকম ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দেখা দেয়! এই বিশেষ ইন্দ্রিয়টি যতক্ষণ না দেখা দেয়, ততক্ষণ আহরণের চিহ্ন কিছুতেই মোছে না। ততক্ষণ পরিশ্রমটা সর্বত্র চোখে পড়ে। পরিশ্রম দরকার। কিন্তু পরিশ্রমের কোনো দাগ যেন না থাকে, সেদিকেও সত্যিকার আত্মশোধনের মনোভাব বজায় রাখা চাই।

পরিশ্রম ছাড়া সিদ্ধি হয় না, সে কথা মানতে আপত্তি নেই। কিন্তু এ-কালের বিশেষ সংকটের মধ্য দিয়ে চিরকালের মনুষ্যত্বকে যতক্ষণ ধরা না যাচ্ছে, ততক্ষণ যথার্থ সার্থক আধুনিক উপন্যাসের সম্ভাবনা কোথায়?

মনুষ্যত্ব নৈরাশ্যজীবীও নয়, কায়দাসর্বস্বও নয়। জীবনের পথ কেবলই সরলরেখা থেকে বক্ররেখায় পরিণত হচ্ছে,—উত্তরোত্তর সে বক্রতা বেড়েই চলেছে। এ সবই স্বীকার্য। অর্থনীতির বিবর্তনে, সমাজের এক স্তরের প্রাধান্য গিয়ে অন্য স্তরের, অথবা সর্বস্তরেরই মুক্তি ঘটতে পারে। আগে আমাদের দেশে কৃষক-শ্রমিকের দিকে সাহিত্যের মনোযোগ যে ভাবে পড়েছিল, আজ আর সে ভাবে পড়ে না। আমাদের দেশের ১৯১৯-১৯২১-এর আন্দোলনের সময়ে হিন্দীতে প্রেমচাঁদের 'প্রেমাশ্রম' উপন্যাস বেরিয়েছিল। তাতে ভারতবর্ষের কৃষক-জীবন, গান্ধীজীর সেবাধর্ম এবং টলস্টয়ের আদর্শ সবই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়েছিল। মনে পড়ে, বাংলাতেও একালের মনোজ বসু কিংবা বনফুল কিংবা তারাশঙ্করের একাধিক উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রাম, কৃষক, জমিদার ইত্যাদির কথা আছে। তাঁদের অভিজ্ঞতা ঠিক যে একই ধরনের, সে কথা এক্ষেত্রেও বলা চলে না। তাঁরা যে ধারাবাহিকভাবে একালের জমিদারদের অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বছরের অবস্থা পরিবর্তনের আসল রূপটি অনুসরণ করে গেছেন,—তাঁদের বই পড়ে

সে কথাও ভাবা চলে না। আমাদের এই বর্তমান শতক তার প্রথমার্ধ উত্তীর্ণ হয়ে ইতিমধ্যে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে শেষার্ধের দিকে। সেই সঙ্গে এগিয়ে চলেছে বহু স্তরে বাঁধা দেশের অশান্ত জীবনধারা। অর্থে অতি-মনোযোগ এবং পরমার্থে ক্ষীণ অবিশ্বাস,—এক নিশ্বাসে এইটুকু বললেই জাতির বর্তমান পরিচয় সম্যক্‌ভাবে ব্যক্ত হয় না। হয়তো সাধারণ মনোধর্ম হিসেবে এ যুগের পক্ষে এ-মন্তব্য অপ্রযোজ্য নয়। তবু অনেক ব্যতিক্রম আছে,—অনেক ভেদ, বৈষম্য, বৈচিত্র্য আছে। সব দিকে নজর রেখেই যুগের মহাকাব্য লিখতে হবে।

আগেকার আমলে, জীবনের গতিবেগ এখনকার তুলনায় নিঃসন্দেহে কম ছিল। ইলিয়া এরেনবুর্গ ঠিকই বলেছেন—'আমাদের মহিমান্বিত পূর্বগামীদের পক্ষে সাহিত্য-রচনা এখনকার তুলনায় অনেক সহজ ছিল, কারণ তাঁরা যে সমাজের বর্ণনা করে গেছেন, সে সমাজে পরিবর্তন ছিল অতিশয় মন্দগতি!' আজ জীবনের জটিলতা, আর, বেগ বেড়েছে বটে,—কিন্তু মানুষের হৃদয়,—তার আবেগ বা বিশ্বাসের সত্যিকার রূপান্তর ঘটেছে কি! যথার্থ যুগ-সংঘট চাই একালের যথার্থ উপন্যাসে। একদল বিকারগ্রস্ত মানুষ কিংবা একটা বিশেষ জমিদার-বংশ, খানিকটা অস্বাস্থ্যের হাওয়া,—কিংবা দুশ্চরিত্র, মাতাল, গুণ্ডা,—অথবা দেশসেবার বড়োবড়ো বাঁধা বুলি,—ত্যাগের সুবুদ্ধি, সন্ন্যাসের শুভাদর্শ, এই সব কথা অনেক বলা হয়েছে,—অনেক রাজনীতি-বাতিকে, ধর্ম-বাতিকে, মনস্তত্ত্ব-বাতিকে এবং কায়দা-বাতিকে বাংলা উপন্যাসের পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে। সেই পূর্বকথা মনে রেখে নতুন স্রষ্টাকে পথ চলতে হবে। পাঠকরাই বা তাঁকে বিধি-নিষেধের ফিরিস্তি দেবেন কেন? পাঠকের অনুচ্চারিত অভিপ্রায় তো কালের দেয়ালেই লেখা আছে। এরেনবুর্গ বলেছেন—'পাঠক যখন কোনো একটা উপন্যাসের পাতা খুলে পড়া শুরু করে, তখন সে এই আশা রাখে যে, তার সহকর্মী, সমকালীন অন্যান্য মানুষ, তার বন্ধু এবং শত্রু, সকলের কথাই লেখক তার চেয়ে বেশি জানেন,—এমন কি তার নিজের সম্বন্ধেও লেখকের কাছ থেকেই সে পূর্ণতর ধারণার আশা রাখে।' একালের ঔপন্যাসিক এই কথাটি মেনে নিয়ে যদি কাজে নামেন, তাহলেই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাসের সর্বজনমান্য নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটতে পারে। তা' না-হলে, নব যুগের সম্ভাবনা আরো পেছিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

শুধু বিদেশের কথাই নয়। এদেশের ভাবুকদের মধ্যেও উপন্যাসে নতুন মনোভঙ্গির জল্পনা দেখা দিয়েছিল সেই 'কল্লোল' পর্বেই। সেই উৎসাহের ফলেই, তারাশঙ্করের প্রথম প্রবেশকালে বাংলা উপন্যাসে নতুন নতুন নানা অনুশীলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বিষয়বস্তু এবং রীতির সেই নতুনত্বের আন্দোলনে, মাত্রা বজায় রেখে চলা সত্যিই বেশ শক্ত কাজ। সেদিক থেকে তারাশঙ্করের দক্ষতা এবং দুর্বলতার প্রসঙ্গ এইবার ভেবে দেখা দরকার।

*
* *

॥ অভিজ্ঞতা, আবেগ ও মাত্রাবোধ ॥

সেদিন সকালে তারাশঙ্কর বাবুর টালার বাড়িতে গিয়েছিলুম। তখন তাঁর লেখা-পড়ার কাজ চলছিল। তিনি তাঁর ডেস্কের ওপর একখানি পাণ্ডুলিপি রেখে কাজে মগ্ন ছিলেন। ঘরের মেঝেতে ফরাশ পাতা। প্রবেশ-দ্বার পেছনে রেখে আমি তাঁর সামনা-সামনি এগিয়ে বসলুম।

তিনি যেখানে বসেছিলেন, তার ডাইনে, বাঁয়ে এবং পেছনের দেয়ালেও বইয়ের তাক। আমার ডানদিকের দেয়ালে, দরজার মাথায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি। সেই ছবিরই আর-একটু বাঁদিকে, আর-একটু নিচে আর-একখানি ছবি—প্রেমেন্দ্র মিত্রের উজ্জ্বল চোখ-মুখ-ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ! তার নিচে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের নিদর্শন পোড়া-মাটির সুন্দর একটি ঘোড়া।

আরো বাঁয়ে বইয়ের তাক। সেই তাকের ওপরদিকের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ, আরো বাঁয়ে শরৎচন্দ্রের। অদূরে অচিন্ত্যকুমার। অচিন্ত্যকুমারের কাছেই সজনীকান্ত দাস। শরৎচন্দ্রের কাছাকাছি একটি বুদ্ধমূর্তি। তারপর আরো বই। বইয়ের ওপর চোখ রাখলে চোখে পড়ে বৈষ্ণব ভাবোদ্দীপনার ছোট একখানি পট। চোখ সেখান থেকে ত্বরায় আকৃষ্ট হয় অন্যদিকে,—ডাইনে বাঁয়ে। ডানদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, বাঁদিকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের।

কলম রেখে তারাশঙ্কর বললেন: 'আমি প্রথমে এসেছিলুম 'চৈতালী ঘূর্ণী' নিয়ে। দেশের তখনকার ভাঙনের দিকটাই আমি বিশেষভাবে দেখিয়েছিলুম। 'কালিকলম' পত্রিকাতে আমার 'শ্মশানের পথে' বেরিয়েছিল। মনে আছে 'প্রবাসীতে' প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছিলেন—চৈতালীর কাল ঘূর্ণী অগ্রদূত কালবৈশাখীর!

অনেকদিন আগেকার কথা মনে মনে অনুভব করে নিলেন তিনি। কলমের ক্যাপ খুলে পাণ্ডুলিপিতে আবার কী যেন লিখলেন একটু। তারপর আবার কলম রেখে বললেন: 'মনে রেখো আমার প্রথম লেখা কিন্তু 'রসকলি'।

আমি বললুম: 'রসকলি' এবং 'কবি' এক ধারার আদিতে, 'চৈতালী ঘূর্ণী' আর এক ধারার সূচনায়।

তিনি বললেন: হাঁ—'রসকলি', 'কবি', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ইত্যাদি লেখার মধ্য দিয়ে একটা ধারা;—'চৈতালী ঘূর্ণী', 'পঞ্চগ্রাম' 'গণদেবতা', 'কালিন্দী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আর একটা ধারা দেখা যায় বটে।

আমি আবার বললুম: আপনি একদিকে কল্পনাপ্রিয় কবি, অন্যদিকে নানা তথ্য-সন্ধানী সামাজিক আপনার সাহিত্য-চিন্তার সঙ্গে রাজনীতি কিন্তু বড়ো বেশি রকম জড়িয়ে গেছে!

তিনি ডানদিকে জানলার বাইরে চোখ রেখে কী যেন ভাবলেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। চোখ ফিরিয়ে বললেন: উনিশ শ' একুশ সালে গান্ধীজীর গণ-আন্দোলন দেখেছিলাম। ফলে; সেদিন আমার নিজের দেশ এই বিশাল ভারতবর্ষের মধ্যেও গণবিপ্লবের রূপ দেখতে পাবো বলে মনে খুবই আশা জেগেছিল। তার আগে রুষ-বিপ্লবের কথা শুনেছি। সেই আন্দোলনের স্বপ্নটাও মনের মধ্যে কাজ করেছিল বোধ হয়।

.........কিন্তু দেশের কোন্ সার্থকতার ছবি আমার মনে জেগেছিল জানো?

প্রশ্ন শুনে 'পঞ্চগ্রাম'-এর কথা মনে এলো।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

দেয়ালের তাক থেকে 'পঞ্চগ্রাম' বইখানি নামিয়ে তারই শেষ কয়েক পৃষ্ঠা আমাকে পড়তে বললেন।

সে-কাহিনীর নায়ক দেবুকে মনে পড়লো। মনে পড়লো বালবিধবা স্বর্ণর কথা। গ্রামের মেয়ে স্বর্ণ অনেক দুঃখের ধাক্কায়, নিজের চেষ্টায় লেখা-পড়া শিখেছিল। স্বর্ণর আগেকার ইতিহাস,—তার বাপ তিনকড়ি-কে,—তিনকড়ির সঙ্গী ছিদাম ডাকাতকেও,—দায়রা বিচারে ডাকাতির অপরাধে তিনকড়ির সেই মেয়াদের সিদ্ধান্ত,—এবং সেই সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর চরের জঙ্গল, শ্মশান, অন্ধকার, জ্যোৎস্না সবই মনে এলো।

উপন্যাসের শেষ দিকে, সেই দেবু আর স্বর্ণ দেখা দিয়েছিল আবেগে থরথর, আশ্চর্য কোনো-এক রাত্রির নির্জনতায়।

তাঁকে সেই জায়গাটা পড়ে শোনালুম :

'রাত্রি চলিয়াছে ক্ষণ-মুহূর্তের পালকময় পক্ষ বিস্তার করিয়া। আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন ঘটিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ আকাশে প্রথম-পাদ পার হইয়া দ্বিতীয়-পাদের খানিকটা অতিক্রম করিল। ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকিত শরতের আকাশ শুভ্র ছায়াপথ আকাশবাহিনী নদীর মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; শুভ্র ফেনার রাশির মত ও-গুলি নীহারিকাপুঞ্জ। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের রূপান্তর ঘটিতেছে; চোখে দেখিয়া বুঝা যায় না।

দেবু স্বর্ণকে বলিয়া চলিয়াছে—তাহার যে কথা বলিবার ছিল। তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানো কথা। নূতন যুগের আমন্ত্রণ—নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায় নূতন আশায়, নূতন পরিবেশ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভরা ধর্মের সংসার—

বই থেকে চোখ ফিরিয়েছিলুম লেখকের দিকে। তাঁর স্থির মূর্তি থেকে দৃষ্টি সরে গিয়ে তাঁরই ঘরের বুদ্ধমূর্তিটির দিকে চোখ পড়েছিল—পৃথিবীর ভূমিতে যাঁর করাঙ্গুলি ন্যস্ত!

আবার পড়তে লাগলুম :

'দেবু বলিল—তোমার আমার সে সংসারে সমান অধিকার; স্বামী প্রভু নয়—স্ত্রী দাসী নয়—কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলবো আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের—শিশুদের, আমি পড়াব ছেলেদের যুবকদের। তোমার আমার উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার।'

সেদিন হঠাৎ মনে পড়েছিল হাক্সলির 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্টে'র সেই মার্ক র‍্যামপিয়নের উক্তি—'চাই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব! সম্পূর্ণ এবং খাঁটি মনুষ্যত্ব!'

লেখক বললেন : শুধু ময়ূরাক্ষী চরের এই দেবু-স্বর্ণর সংসারেরই ছবি নয় ওটা। আমি সারা দেশের সম্বন্ধে ঐ কল্যাণের কথা,—ঐ শ্রীর কথাই ভেবেছি।

আমার হাত থেকে বইখানি নিয়ে অতঃপর তিনি নিজেই পড়ে শুনিয়েছিলেন আমাকে :

'শুধু তাহাদেরই নয়—পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার স্বায়ের সংসার; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে,—ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম; মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট, সবল-দেহ—আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলাফেরা করিবে।.........'

তিনি গভীর আবেগের সঙ্গে পড়েছিলেন। শুনতে শুনতে শ্রোতার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল জানলার বাইরে সূর্যস্নাত আকাশের দিকে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী কালের আমাদের এই সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের সঙ্গে মনে মনে সে ছবি মিলিয়ে নেবার কাজ চলছিলো কতকটা নিজেরই অগোচরে। বিশ্বাসও ছিল, সন্দেহও ছিল! পাশাপাশি দুই-ই সত্য, দুই-ই অকাট্য! মার্চ মাসের রোদ পড়েছিল তাঁর বাড়ির বাগানে। সেখানে বড়ো বড়ো দুটি জিনিয়া ফুটেছিল তখনো। তাঁর প্রকাণ্ড কুকুরটি পাশে বসে ঝিমুচ্ছিল। সব মিলিয়ে সে এক অবিস্মরণীয় সকাল!

তারাশঙ্কর লক্ষ্য-সচেতন, আবেগবান, ভাবুক। তাঁর মত আছে, পক্ষ আছে,—একরকম নিখিল-মানবপ্রীতি সত্ত্বেও তাঁর সম্প্রদায়-চেতনা আছে! সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি যে এক জনহিতকর সাধনায় নিযুক্ত আছেন, সে-বিষয়ে তিনি সংশয়হীন। তাঁর জীবনে সাহিত্য-সাধনার ঠিক আগেকার পর্বটি গেছে রাজনীতি-চর্চায়। সে পর্বে তিনি যা পাননি, সাহিত্যের পথ তাঁকে সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে বলেই তাঁর বিশ্বাস। উনিশ শ' চব্বিশ-পঁচিশ সালে তাঁদের অঞ্চলে যখন মহামারী দেখা দেয়, সে-সময়ে ছ'মাসে তিনি ত্রিশ-চল্লিশটি গ্রামে ঘুরেছেন। উনিশ শ' তিরিশ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি পাবার আগেই তিনি আর রাজনৈতিক আন্দোলনে ফিরে যাবেন না বলে মনে মনে সংকল্প নিয়েছিলেন। সেই থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়েছিলেন বটে, কিন্তু সমাজের সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করবার সংকল্প ছাড়েন নি। জেলে থাকতে-থাকতেই তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণী' এবং 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দু'খানির পত্তন হয়েছিল। সেই উনিশ শ' তিরিশ

খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ধরে থাকেন,—যদিও তার আগেই তেরশ' বত্রিশ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'নাম্নুর পথে' নামে তাঁর একটি কবিতা ছাপা হয় এবং তারও আগে থেকেই তিনি সাহিত্য-চর্চায় মাঝে মাঝে আগ্রহ বোধ করেছেন। লাভপুরে সে আমলে নাটক লেখার এবং অভিনয় করবার রুচি ছড়িয়ে পড়েছিল। নাট্যকার হিসেবে লাভপুরের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি ছিল। তিনি তারাশঙ্করের আত্মীয়। তাছাড়া গ্রামের নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ও নাটক লিখতেন। হরি স্বর্ণকারের ছিল অভিনয়ে আগ্রহ। সেই হরিও 'গোরু-মানুষ' নামে এক প্রহসনের লেখক হয়ে ওঠে। সেকালের পারিপার্শ্বিক সেই নাট্যরুচির হাওয়াতেই তিনিও নাটক লেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন। অনেক ভাবনার পরে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অবলম্বন করে একখানি নাটকও তিনি লিখে ফেলেছিলেন! নির্মলশিবই ছিলেন তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম গুরু। কংগ্রেসের কাজ আর নাট্যকার হবার উৎসাহই ছিল সে-পর্বে তারাশঙ্করের প্রধান অবলম্বন। তারপর পরিণত জীবনে রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম-বোধ,—বক্তৃতার ঝোঁক এবং নাটকীয়তার আগ্রহ নিয়েই তিনি কথাসাহিত্যে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর শিল্প-কর্মে ক্রমশঃ পরিমার্জন ঘটেছে। আউল-বাউল-কবিওয়ালাদের ঐতিহ্য,—সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ,—শরৎচন্দ্রের অনুকরণ—এবং তারই পাশাপাশি কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আগ্রহও দেখা গেছে তাঁর লেখাতে।

কিঞ্চিৎ দূরবর্তী হলেও এই সূত্রে আরো একটি প্রসঙ্গ মনে পড়ে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে ব্যঙ্গরস-প্রধান গল্প-উপন্যাস রচনার দক্ষতায় যাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বাংলা বারোশ' একাশি সালে ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' প্রকাশিত হয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' সে-বইখানির প্রশংসা করেছিলেন। তখনকার বাঙালী সমাজের মধ্যে প্রগতিনিষ্ঠ শাখা ছিল ব্রাহ্মসমাজ। 'কল্পতরু'তে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত নরনারীর এই প্রগতিচর্চার বিরুদ্ধে বেশ কটাক্ষ বর্ষণ করা হয়েছিল। শুধু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে একাজে হাত দিয়েছিলেন, তা নয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামে যে প্রহসনখানি

লিখেছিলেন, তাতেও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নব্য বাঙালীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তী রীতির অনুসরণ করেছিলেন ইন্দ্রনাথ। আবার ইন্দ্রনাথের নিজস্ব ঢঙ্‌টির প্রভাব পড়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতে'। দুজনেই ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েছিলেন 'কমলাকান্ত' নাম,—এবং ইন্দ্রনাথ আত্মগোপন করেছিলেন 'পাঁচু ঠাকুর'-এর আড়ালে। কিন্তু কোনো ছদ্মনামের আশ্রয় না নিয়ে, সরাসরি স্বনামে আসরে নেমেছিলেন সে-যুগের 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। উনিশ শতকের শেষ দিকে, নবম দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর বহুশ্রুত 'মডেল ভগিনী' বইখানি প্রথম ছাপা হয়। তাঁর অন্যান্য ব্যঙ্গরচনার মধ্যে 'কালাচাঁদ', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'নেড়া হরিদাস', 'বাঙ্গালী চরিত' এবং 'মহীরাবণের আত্মকথা'ও বেশ প্রসিদ্ধ।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল ভগিনী'র প্রসিদ্ধির কারণ ছিল প্রধানত দুটি: প্রথমতঃ সমকালীন সমাজচিত্রে তাঁর বিশেষ মনোযোগ,—দ্বিতীয়তঃ তাঁর ব্যঙ্গরস-দক্ষতা। সে কথা ভাবতে গেলে ইংরেজি 'উপন্যাসের কালানুক্রমিক আলোচনায় বহু-ব্যবহৃত এই মন্তব্যটি মনে পড়া স্বাভাবিক যে, ইংরেজি উপন্যাসের পরিণতির পথে রিচার্ডসন দিয়েছিলেন ভাবাতিরেক, ফীল্‌ডিঙের কলমে উৎসারিত হয়েছিল হাস্য-পরিহাস, স্মলেট এনেছিলেন প্রাণোচ্ছলতা—আর, স্টার্ন এসে তাতে ভাবালুতা এবং হাস্য-পরিহাসের চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন!

যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখাতে ফীল্ডিং এবং স্টার্নের সম্মিলিত প্রভাবের কথা বলা হয়ে থাকে। উপন্যাসের গঠনে কাহিনী এবং চরিত্র-সংঘাতের দিকে অভিনিবিষ্ট থাকবার অভ্যাস, ইংরেজিতে ফীল্‌ডিঙ্ অথবা স্টার্ন, দুজনের কা'রও মধ্যেই তেমন দেখা যায় না। বাংলায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখাতেও তাই। তবে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংহতির দিকে গভীর মনোযোগ না দিলেও এইসব রচনায় তিনি যে উপন্যাসের গঠনাদর্শ সর্বপ্রকারে অতিক্রম করেছেন, তা বলা যায় না। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'মডেল ভগিনী'র কথাই ধরা যাক। ব্রাহ্ম ধর্ম এবং ব্রাহ্ম সমাজনীতির বিরুদ্ধে নানা কটাক্ষ-কণ্টকিত এই বইখানিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থূল আবরণের ভারে ঔপন্যাসিকের উদার মনন যে বহু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীকুমারবাবু

ঠিকই বলেছেন: 'স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়া সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।'

অতিকথনের মতোই অতিরঞ্জন বাঙালীর স্বভাব-নিহিত। ব্যঙ্গরচনায় অতিরঞ্জনের দৃষ্টান্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রনাথ—যোগেন্দ্রচন্দ্র—চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি লেখকদের সময় অবধি সমভাবে বিদ্যমান। 'মডেল ভগিনী'র মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁর যে লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যবোধের তাগিদেই তাঁকে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তারাশঙ্কর অবিশ্যি ঠিক যোগেন্দ্রচন্দ্র বা ইন্দ্রনাথের সমধর্মী নন বটে, কিন্তু অতিকথনের দোষ থেকে সত্যিই মুক্ত নন তিনি। এ লক্ষণ তাঁর স্বভাবগত বিশেষত্বের মধ্যেই গণ্য।

যে-কোনো যুগেই প্রগতি-বাদীদের সঙ্গে দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস, নীতিবোধ এবং রুচির বিরোধ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। উনিশ শতকে বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজের অনুসৃত নীতি এবং রুচির বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী সনাতনীরা যে কতকটা ক্রোধ-বিরক্তি-জনিত অস্বস্তির ভাব পোষণ করবেন, সে তো খুবই স্বাভাবিক কথা। 'মডেল ভগিনী'র লেখক ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্ম পরিবার-বিশেষের তৎকালীন নৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর সমকালীন প্রাচীনপন্থীদের ক্রোধ, বিরক্তি, এবং উত্তেজনাবোধের ঐতিহাসিক মনোভাবটি নানা কথায় গ্রথিত করে গেছেন। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে! আজ এতোকাল পরে সাম্প্রদায়িকতার অতিরেক এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ক্ষতচিহ্নগুলি বর্জন করে দেখলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমাজ-চেতনার এবং তাঁর গল্প রচনার সামর্থ্যের তারিফ করতে বাধা নেই। বিদ্রূপাত্মক অতিরঞ্জনের ফলে তাঁর হাতে হাস্যরস স্থূলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বটে,—এমন কি কমলিনীর প্রেমাভিনয়ের বর্ণনাতেও সেই দৃষ্টিরই প্রভাব চোখে পড়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিদ্রূপকে তিনি ঘৃণার জ্বালায় পর্যবসিত হতে দেননি কিংবা ক্রোধের অসংযম কোথাও ঔপন্যাসিকের ব্যাপক দৃষ্টিকে সত্যিই বিশেষ আচ্ছন্ন করেনি।

কিন্তু 'কল্পতরু' বা 'মডেল-ভগিনী' সত্যিকার সার্থক, উঁচু দরের উপন্যাস নয়। তারাশঙ্কর যে কালে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকরা তার বহুকাল আগেই একে একে বিদায় নিয়েছেন। ইতিমধ্যে উপন্যাসের বিষয়, লক্ষ্য এবং শিল্পাঙ্গিকের বহুতর পরিবর্তন ঘটেছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে তবু তাঁর এক ধরনের সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। অতিরঞ্জন এবং নাটকীয়তার দিকে দু'পক্ষই আগ্রহী,—এবং কেবল এঁরা কেন,—উনিশ শতকের সমাজ-চিন্তাপ্রবণ ব্যঙ্গাশ্রয়ী সমূহ লেখকগোষ্ঠীটিরই এদিক্ থেকে একরকম সাদৃশ্য আছে তারাশঙ্করের সঙ্গে।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে যথার্থ মাত্রাবোধের সংযোগ না ঘটলেই অতিরঞ্জন দেখা দেয়। অতিরঞ্জনের নানা মূর্তি। কখনো শিথিল ব্যঙ্গে, কখনো বা বিরক্তিকর বাগ্মিতায় তার প্রকাশ ঘটে থাকে। রাজনীতি হোক্, সামাজিক দোষের সমালোচনা হোক্, ধর্মবোধের আহ্বান হোক্—লেখকের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, শিল্পের অপরিত্যাজ্য মাত্রাবোধ ব্যতিরেকে কোনো শিল্পই তার নিজস্ব সার্থকতায় পৌছোয় না।

বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্কর দু'জনেই একালের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এই মাত্রাবোধের দিকে দু'জনেরই বেশ কিছু অভাব চোখে পড়ে।

কুচবিহার সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হিসেবে বিভূতিভূষণ যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি ছাপা হয় তের শ' তিপ্পান্ন সালের আষাঢ় সংখ্যার 'কুচবিহার দর্পণে'।—তের শ' পঁয়ষট্টির 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় সে-লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়। বিভূতিভূষণ তাঁর সেই বক্তৃতাতে বলেছিলেন:

> 'এ আমরা যেন আদৌ ভুলিনে যে কোন রচনায় আধুনিক যুগের সমস্যা আছে কি না, রাজনীতির ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ না ঘোলাটে দুর্ভিক্ষের কথা ঠিক করে বলা হল কি না—এসব দেখে সাহিত্য বিচার হয় না। আজকাল নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, মন হয়ে এসেচে নিস্তেজ। সমালোচনার আদর্শ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াচ্চে। জীবনের শাশ্বত ধ্রুব সত্যকে আমরা এখন অস্বীকার করে চলেছি।......সাংবাদিকতা ও সাহিত্য যে এক জিনিস নয় এ কথা আমরা ভুলতে বসেচি।'

সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের এই ঘেঁষাঘেঁষি-ঘটিত একালের দুরবস্থার দিকে তর্জনী-সংকেত করেই তাঁকে কিন্তু সতর্ক হতে হয়েছিল। বাংলার সমসাময়িক লেখকসমাজ এ-কথায় যাতে তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট না হন, কতকটা সেই কারণেই বোধ হয়, তিনি তাঁর এই লেখাতেই তারাশঙ্কর, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং

মনোজ বসুর তিনখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করে সেগুলির মধ্যে 'শাশ্বত সাহিত্যে'র সম্ভাবনা বা আভাস আছে বলে স্বীকার করেছিলেন। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক সামাজিক জীবনের প্রকৃত সম্পর্ক যে কী ছিল, তাঁর এ মন্তব্যে সে কথাও ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর মতে :

'আগষ্ট আন্দোলনের ব্যাপক সত্তা ছিল না। যে দুটি জিনিস খুব বেশি দোলা দিয়েচে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে—ব্লাক-মার্কেট ও মন্বন্তর—সে দুটি বহু লেখকের উপজীব্য স্বরূপে একই করুণ রাগিনীর একঘেয়ে আলাপের মত বিস্বাদ হয়ে পড়েচে ক্রমশঃ। তবু স্বীকার করতে হবে তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর', প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা।'

তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, এর আগেই রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যার আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয় 'বঙ্গশ্রী' আপিষেই। মোহিতলাল তাঁর 'শ্মশান ঘাট', 'মেলা', 'শ্মশানবৈরাগ্য'—এবং 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর 'ঘাসের ফুল' গল্পগুলি পড়েছিলেন। তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন' বইখানিতে, 'ঘাসের ফুল' পড়ে তিনি যে খুবই খুশি হয়েছিলেন, সে-কথারও উল্লেখ আছে। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর গুরুর তল্পি বয়ে বেড়িয়েছেন শুনেও তিনি বোধ হয় খুশিই হয়েছিলেন। তারপর তাঁর রাজনীতি-সম্পর্কের কথাও মোহিতলালের জানতে বাকি ছিলনা। তারাশঙ্কর নিজে বলেছেন :

'তারপর যখন শুনলেন যে, আমি জেল-খাটা স্বদেশীওয়ালা এবং এক সময় কিছুদিনের জন্য ঘরেও পুলিসের নজরের উপর নজরবন্দী ছিলাম, তখন তাঁর মুখ গম্ভীর হোলো—অপ্রসন্নতাই বলবো তাকে। বললেন, এ পথে চলতে হলে ও-সংস্রব চলবে না। ধর্ম নইলে মানুষ বাঁচে না, প্রতিটি মানুষেরই একটা একটা ধর্ম আছে, কিন্তু যারা ধর্মপ্রচারক হয় তারা নিজেরাই হয় ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট ; ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়,—নিজের অন্তরে দাও।........তা ছাড়া,

রাজনীতি হোলো সাময়িক—কালে কালে পালটায়; কিন্তু সাহিত্য-ধর্ম শাশ্বত!’

আরো আগে, সম্ভবতঃ উনিশ শ’ আটাশ খ্রীষ্টাব্দে তারাশঙ্কর একবার কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। তিনি কিন্তু দীক্ষা দেননি, কারণ এই দীক্ষার্থীকে তিনি অন্য ধাতের মানুষ বলে চিনতে পেরেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার মধ্যেই ইহলোকের অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত মন্ত্র আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে সে শিক্ষার আশঙ্কার দিকটাও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা লোককে নাস্তিক করে—এই ছিল তাঁর ধারণা। তিনি নিজে লিখেছেন:

‘কথাটি তখন আমার মনে রেখাপাত করেছিল। এবং আন্দোলন, জেল ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ও জেলের মধ্যে ইউরোপীয় বিপ্লব-বাদের ইতিহাস ও দর্শন কিছু পড়াশুনা ও আলোচনার ফলে মনের গতি এমনই পশ্চিমাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ওই গুরুটিকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এই উপদেশের জন্যে।

তাঁর নিজের আরো নানা লেখার মধ্যে য়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে তাঁর এই অতি-সতর্ক বিমুখতার বৃত্তান্ত তিনি নিজেই বলেছেন। গল্প-উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচনে দেশের অতিক্রান্ত আচার এবং পরিত্যক্ত সামাজিক দোষ সম্বন্ধে উৎসাহ দেখানোটা যে সংগত নয়, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে শরৎচন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্কর উভয়েই আবার উপন্যাসে রাজনীতি সম্বন্ধে এ কালের ফ্যাশানের নিন্দা করেছেন। রাজনীতি নিয়ে বিভূতিভূষণ অবিশ্যি অণুমাত্র মাথা ঘামাননি। তারাশঙ্কর কিন্তু মোহিতলালের পরামর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েও রাজনীতির প্রসঙ্গ বার বার এনে ফেলেছেন। তাঁর মনের গঠনের মধ্যেই সে-সংশ্রব অনিবার্যভাবে বিদ্যমান।

পশ্চিমী বিদ্যার নাস্তিক্য-সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তিনি একটু বেশি সজাগ। পরিণত বয়সের আত্মকথা শ্রেণীর লেখার মধ্যে তো বটেই, এমন কি তাঁর

উপন্যাসের মধ্যেও মাঝে মাঝে এসব প্রসঙ্গে তাঁর বেশ বক্তৃতার ঝোঁক দেখা দেয়। ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা-নিষ্ঠা বজায় রাখা সম্বন্ধে তাঁর যে আদর্শের কথা তাঁর পাঠকমাত্রেরই পরিচিত, এসব লক্ষণ তাঁর সেই নিজস্ব আদর্শের সঙ্গেই জড়িত। এ তাঁর অপরিত্যাজ্য প্রবণতা! তাঁর সমস্ত শৈথিল্যই আন্তরিক। তাঁর সমস্ত স্খলনই শিল্পী হিসেবে তাঁর যথার্থ সংযমের অভাব-জনিত ব্যাপার!

*

* *

॥ সমাজ ও উপন্যাস ॥

'পঞ্চগ্রামে'র সমাজ-কল্যাণ প্রচারক তারাশঙ্কর যে অবেগসম্পন্ন মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই। 'নভেল' যে আধুনিক কালের 'পুরাণ', বাংলায় সে-কথাও এই শতকের প্রথম পাদান্তের আগেই নানা সূত্রে বলা হয়েছিল। তের শ' তেইশ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার 'সবুজপত্রে' শ্রীমতী ননীবালা গুপ্তার 'নভেল—কেন পড়ি' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে তিনি আমাদের প্রাচীন কালের লোকশিক্ষাব্রতী পৌরাণিক আখ্যানমালার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশংসা করলেও এই মন্তব্য জানাতে দ্বিধাবোধ করেন নি যে, এখনকার নভেলের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে, তাতে আধুনিক 'আর্ট' জিনিসটার একান্ত অভাব। কথা-প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন যে, প্রহ্লাদ-চরিত্রের পৌরাণিক গল্পটি যদিও তাঁর কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হয়েছিল, তবু সে-গল্পের 'অস্বাভাবিকতা' তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। তাঁর নিজের কথায়: 'শিক্ষা হিসাবে এর জোড়া পাওয়া ভার। কিন্তু এর আখ্যানবস্তু চিত্তাকর্ষক নয়—আমাদের পক্ষে! যতই ধর্মের ছাপমারা থাক না—কিছুতেই এ অবিশ্বাসী মনের প্রত্যয় হয়না যে 'করীর পদচাপনে' কেউ 'প্রাণে' বাঁচতে পারে!' নভেলে সে-রকম অবাস্তবতা কোনো মতেই প্রশ্রয় পেতে পারে না।

শ্রীমতী ননীবালা গুপ্তার সে-প্রবন্ধটি 'সবুজপত্রের' বহুবিশ্রুত বৈদগ্ধ্যের চিহ্নবাহী না-হলেও, আমাদের আধুনিক বাংলা উপন্যাসের কথা-প্রসঙ্গে সেটি মনে পড়বার কারণ আছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় প্রচ্ছন্ন, আত্ম-কথার ভঙ্গি অবলম্বন করে তাঁর 'বিনুর বই'-এর মধ্যে জানিয়েছেন যে বিনু—'আর্ট' কথাটা—সবুজপত্রেই পায়। কথাটা তার মনে তখন থেকে গাঁথা।'

উপন্যাস একদিকে জনশিক্ষার বাহন, অন্যদিকে তা আবার 'আর্ট'। প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং তাঁদের গুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই 'সবুজপত্রের' অনুষঙ্গ মনে রেখেই 'বিনু' উপলব্ধি করেছিল যে, 'তাঁদের চোখ চতুর, কান চতুর, রুচি চতুর। তাঁদের মন চতুর।'

অতঃপর টলস্টয়ের সাহিত্য পড়ে 'বিনুও ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে একমত হোলো যে সব চেয়ে সার্থক সৃষ্টির লক্ষ্য হবে জনসাধারণ বা পীপ্‌ল্।'

বিনুকে এ কথাও বলতে হয়েছে যে—'লোকসাহিত্যের জানলাগুলো কেটে দরজা বসালে সাহিত্যের ঘর আলো বাতাসে ভরে যায়। লোকসাহিত্যের একটু আধটু পরিবর্তন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্য। সাহিত্যের ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজির আছে। ফাউস্ট ছিল লোকসাহিত্য। গ্যয়েটে তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করলেন। গ্যয়েটের আগে মার্লো।'

বিনু নিজের সেই ভাবনাসূত্রেই আরো বলে গেছে যে, 'প্রেমের মতো আর্টের সবটাই দেওয়া, দু'হাত খালি করে বিলানো। কেউ দু'হাত ভরে ফিরে পান, কেউ তারও বেশি। আবার কারও কপাল মন্দ, যা পান তা সামান্য, হয়তো কিছুই নয়।'

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতন ভূয়োদর্শী দু'জন আর্টিস্ট সে যুগে ছিলেন বটে, তবু বাংলা সাহিত্যের সে-পর্বে—সেই তেরশ' তেইশ সালে, বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যথার্থ ঔপন্যাসিক-অভিজ্ঞতা এবং ঔপন্যাসিক-আর্টের চর্চা যে আশানুরূপ ভাবে উৎসাহিত হয়নি, সে সম্বন্ধে মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে 'সবুজপত্রের' প্রবন্ধ-লেখিকা শ্রীমতী গুপ্তার এই কথাগুলিতেঃ

> 'শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নভেলের পাঠকসংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিস্তৃতির তুলনায় তার গভীরতা বাড়ছে না। কাজেই লেখক যখন নভেল লেখেন, তখন তাঁর সামনে থাকে ভাব-প্রবণ, উৎসুক এক অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়। তাদের মনোরঞ্জন আর শিক্ষা-বিধানই হয় তাঁর কাজ। এ-ক্ষেত্রে নভেলের উচ্চতম আদর্শের পরিণতি-সম্ভাবনা কোথায়?—কাজেই নভেল আশানুরূপ হচ্ছে না বলে বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের পক্ষে এর প্রতি একেবারে বিমুখ হওয়া মোটেই উচিত নয়।'

ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাসের বহুধা গতি দেখা গেয়েছিল উনিশ শ' খ্রীষ্টাব্দের আগেই। বাংলায় ননীবালা গুপ্তা যখন তাঁর ঐ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তার প্রায় পঁচিশ বছর আগে বর্তমান শতকের সূত্রপাত হয়েছে। সে-দেশে উপন্যাস বা 'নভেল' তার আগেই সু-অনুশীলিত সামগ্রী হিসেবে স্বীকৃত এবং উপন্যাসের মাধ্যমে কেউ-বা সেখানে ধর্ম, রাষ্ট্রচিন্তা এবং সুনীতির

কথা শিখিয়েছেন, কেউ-বা চরিত্রের গভীর মনোলোকে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। হেনরি জেম্‌সের মনস্তত্ত্ববীক্ষা এই দ্বিতীয় অভি-মুখিতার উদাহরণ। আবার, টমাস হার্ডি, ওয়েসেক্স অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিসীমা রক্ষার দিকেই নিমগ্নচিত্ত! উভয় ক্ষেত্রেই উপন্যাস কতকটা সংকুচিত হয়ে বৃহৎ মানবসমাজ থেকে সরে এসেছিল। সে অপসরণ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞতার দিকে! মানুষের ব্যাপক এবং সর্বান্বয়ী জীবন-সত্যের দিক থেকে এইভাবে সরে আসা, আর যাই হোক,—উপন্যাসে পূর্ণ-দৃষ্টির সাধনা নয়।

পূর্ণদৃষ্টির অধিকার মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ইচ্ছে করলেই কোনো একজন লেখক রাতারাতি জীবনবিচিত্রার পূর্ণ-দর্শক হয়ে ওঠেন না। এবং এ-বিষয়ে চুলচেরা বিচারে এগিয়ে গেলে, মানুষের পক্ষে পূর্ণদৃষ্টি আদৌ সম্ভব কি না, সে-বিষয়েও সন্দেহ দূর হয় না। লেখকরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের দেশে, কালে, রুচিতে, বিশ্বাসে বাঁধা। এ বন্ধন উপেক্ষা করা বা অস্বীকার করা সংগত নয়।

লেখকদের নিজের নিজের দেশ-কালের সীমাবিভাগ মেনে চলতে হয় বলেই এক-এক পর্বে এক-একরকম উপন্যাস-চর্চার রেওয়াজ দেখা যায়। একালে বিধবা-বিবাহে অথবা মদ্যপানের কুফলে অথবা ব্রাহ্মসমাজের দিকে বাংলা উপন্যাসের মনোযোগ নেই এই কারণেই। সামনের দশ-বিশ বছরের মধ্যে মহাশূন্য-পরিক্রমা, ঈশ্বরবাদ এবং পৃথিবীর স্থানসংকোচ সম্বন্ধে নানা চিন্তায় হয়তো পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্য ক্রমশঃ অভিনিবিষ্ট হতে থাকবে! শরৎচন্দ্রের আমলে বাংলার নারীসমাজ এবং পল্লীসমাজ সম্বন্ধে অনুরূপ মনোযোগ দেখা গেছে। লেখক যেমন নিজের সমকালীন সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, সমাজও তেমনি যোগ্য লেখকের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে। আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ যখন তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে-সময়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' বেরিয়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চারুবিকাশ দত্ত। তিনি লিখেছেন: 'শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' যখন 'ভারতী' মাসিকখানির পাতায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন চট্ট-গ্রামের বিদ্রোহী নেতা সূর্য সেন ও আমি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের গ্রেপ্তার এড়াইয়া পলাতক জীবন যাপন করিতেছি। সেই সময় আমি, সূর্যবাবু, নগেন

সেন, হরিনারায়ণ চন্দ শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানায়। চট্টগ্রামের দুইটি যুবক কর্মী বিনয় সেন ও প্রমোদ চৌধুরী (পরবর্তী কালে আলিপুর জেলে গোয়েন্দা হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত) আমাদের সঙ্গে আছে।—'পথের দাবী'র সব্যসাচীর চরিত্র ও জীবন আমাদের সেদিনের পলাতক জীবনের উপর গভীর রেখাপাত করে।'

চারুবিকাশ দত্তের এই আত্মকথা থেকেই জানা যায় যে 'ভারতী'তে মাসে মাসে প্রকাশিত 'পথের দাবী'র প্রত্যেক কিস্তিই তাঁরা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। তাঁর নিজের কথায়—'পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমরা যখন ইহার গুণাগুণ লইয়া আলোচনায় ব্যাপৃত হইতাম তখনও সূর্যবাবুর ধ্যান ভাঙিত না। সব্যসাচীর বিপ্লবী চরিত্রের এই অনুধ্যান করিতে সূর্য সেনকে সেদিন দেখিয়াছি।' এবং তারই ফলে—'পরবর্তী কালে সূর্য সেন হইয়া রহিল এক জীবন্ত সব্যসাচী'।

চারুবিকাশ নিজে 'ব্যাপক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিপোষক' রূপে সেকালের 'অনুশীলন দলের' অনুগামী হন। সূর্য সেন ছিলেন 'যুগান্তর'-দলভুক্ত। উনিশ শ' আঠারো সালে বহরমপুর কলেজ থেকে সূর্য সেন বি-এ পাশ করেন। তার আগে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে তিনি 'ন্যাশান্যাল হাই স্কুলে' শিক্ষকের কাজে যোগ দেন। তাঁর এই শিক্ষক-জীবন শুরু হবার আগেই ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন ইত্যাদি অনেকেই মুক্তি-সংগ্রামে আত্মদান করে গেছেন। তাঁরা প্রেরণা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে। সূর্য সেন তাঁর নিজের ছাত্রদের মধ্যে সমুচিত উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে সেই 'আনন্দমঠ'-এর ওপরেই নির্ভর করেছিলেন। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী-তীরে তাঁর প্রিয় ছাত্র রাখাল দে (পরে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিতদের একজন), সুকুমার এবং দলিল রহমানের সঙ্গে কথাসূত্রে 'আনন্দমঠ'-এর জীবন-দান এবং ভক্তি-সাধনা সম্পর্কিত আলোচনার স্মৃতি এবং স্বাদেশিকতাব্রতের উল্লেখ আছে চারুবিকাশবাবুর ঐ বইখানির মধ্যে।

লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এই পারস্পরিক প্রভাবের কথা যেমন ধর্তব্য, তেমনি আবার লেখকদের নিজেদের জীবনে বিশেষ চিন্তা, মতবাদ, অধ্যাত্মদৃষ্টি ইত্যাদির ক্রমাভিব্যক্তির কথাও মনে রাখা দরকার। উপন্যাসের স্রষ্টা যিনি, তাঁকেও তাঁর নিজের জীবন-সাধনার পথে এক ধারণা-সমাহার

থেকে অন্যতর ধারণা-প্রকৃতির দিকে উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে হয়। তাই একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন পর্বের উপন্যাসে দৃষ্টিভেদ অথবা চিন্তাভেদ ঘটাও স্বাভাবিক। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না বলেই শোনা যায়। 'ধর্মানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানির মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আঠারো শ' চুরানব্বুই সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রীশবাবুর স্মৃতিকথাতে বলা হয়েছিল, যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলতেন—'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম, এক সময়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল। এখন সে সব গিয়াছে।' হেমেন্দ্রনাথ আরো দেখিয়ে দিয়েছেন যে ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্কিম-মানস প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কালীনাথ দত্ত বলেছিলেন: 'বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত।' কিন্তু পরে ক্রমশঃ সে-ভাব কেটে গেছে। 'রজনী'তে শচীন্দ্রনাথকে বলতে শোনা গেছে: 'আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া মনে করি জগতে চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ়তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি। যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না।' বঙ্কিম যখন কাঁঠালপাড়ায় বাস করতেন, সে-সময়ে রাধাবল্লভের অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছে 'অশ্রুপূর্ণ হৃদয়ে' তিনি যে নানা কথার উল্লেখ করতেন, সে-বিষয়েও নজীর আছে। বারো শ' চুরাশি সালের মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শেষাংশ ছাপা হয়েছিল। তার বছরখানেক পরে যখন সে-উপন্যাস প্রথম বই হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন উন্মাদ অবস্থায় গোবিন্দলালের মৃত্যু-বর্ণনা প্রত্যাহার করে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন—'গোবিন্দলালকে আত্মহত্যাকারী অবিশ্বাসী না করিয়া শান্তিগতচিত্ত ভগবদ্ভক্ত রূপে তাহার পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে।' প্রথম জীবনের যুক্তিবাদী, নাস্তিক্যপ্রবণ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিণত জীবনের এই আস্তিক্য-বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভেদতত্ত্ব অস্বীকার করা সমীচীন নয়। হেমেন্দ্রনাথ এ-সব কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এই সূত্রে তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পরে তাঁর মন পুরোপুরি ধর্মালোচনাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েছিল। পূর্ণচন্দ্রের কথা

উদ্ধৃত করে তিনি এ-মন্তব্য সমর্থন করেছেন। বাংলা ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়,—তাঁর পিতৃবিয়োগের পরে,—'আনন্দমঠের' যে-অংশ ছাপা হয়েছিল, তাতে স্বাদেশিকতার সঙ্গে তাঁর ধর্মভাবের গভীর অন্বয়তত্ত্বটুকু বেশ স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল।

লেখকদের এই ধরনের ব্যক্তি-জীবনের ঘটনাধারা খুঁটিয়ে দেখলে যেমন ব্যক্তি-মানসের পরিবর্তন চোখে পড়ে, মানব-সংসারের জাতিগত এবং দেশগত অভিব্যক্তির ইতিহাসেরও সেই রকম নানা পরিবর্তেনের কথা ভোলবার নয়। উপন্যাস যদি আধুনিক মানব-সমাজের পুরাণ বলে গণ্য হয়, তাহলে আধুনিক সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের নতুনতর দিগন্ত-সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের অভিমুখিতার ক্ষেত্রেও সত্যিকার পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকবে কেন? সেই ভাবনা-সূত্রেই বছর তিরিশেক আগেকার একটি বাংলা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে।

তেরশ' ছাব্বিশ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় সুহৃৎচন্দ্র চৌধুরী 'উপন্যাসের গতি' নামে সংক্ষিপ্ত একটি প্রবন্ধে বিশ্বের উপন্যাস-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন: 'জাগতিক অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্য-কলারও সময়ে বিকাশ, পূর্ণস্ফূর্তি ও পরিণাম আছে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে সাহিত্যে শাখা-বিশেষের স্ফূর্তি নষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যে যুগের যাহা বিশেষত্ব তাহাকেই একেবারে চরমে লইয়া তোলা। এইরূপে কোনও একটি সাময়িক বিশেষত্বকে একান্ত-ভাবে চর্চা করিতে গেলে ফল এই দাঁড়ায় যে, সেই শাখা-বিশেষ আপনার ভারেই একদিন আপনি ভাঙ্গিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ যখন সেই বিভাগ বিশেষের কোনও এক নির্দিষ্ট ভাবের চর্চা অত্যন্ত পুরাতন ও একঘেয়ে হইয়া পড়ে, তখন সমাজের লোকেও তাহার চর্চা ছাড়িয়া দেয়।—কিন্তু উপন্যাসের গতি ও স্ফূর্তি এই দুইটি কারণে নষ্ট না হইয়া বিশেষভাবে অন্য কোনও কারণেও হইতে পারে। মনে হয় কোনও সময়ে নূতন উপকরণ বস্তুর অভাবেই উপন্যাস-লেখকগণ উপন্যাস-সৃষ্টিতে বাধা পাইবেন।'

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার এই মন্তব্যটি বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক প্রাচুর্যের ওপর কিছু পরিমাণে আলোকপাত করে। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎ-চন্দ্রের আয়ুষ্কালের মধ্যেই 'কল্লোল'-পর্বের উপন্যাসে নতুন উপকরণ-বস্তুর

অনুসন্ধান ব্যাপারে যে রকম আগ্রহ দেখা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পরে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিপুল চাঞ্চল্য, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, যুদ্ধের অবসান, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, দেশ-বিভাগ, উদ্বাস্তু ও বেকার-সমস্যা ইত্যাদি বহু বিচিত্র পরিস্থিতির ভূমিকায় বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে সেই উপকরণ সন্ধানের অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সাঁওতাল, বেদে, নাগা প্রভৃতি অদিবাসী প্রসঙ্গ,—বর্মা, আন্দামান, য়ুরোপ, মার্কিন মুলুক ইত্যাদি দূর দেশ-দেশান্তরের কথা—বিত্তবান, নিবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের মনোভঙ্গির রূপায়ণ,—পণ্ডিত ও নিরক্ষর,—প্রেমিক ও বণিক,—উদাসী এবং আসক্ত, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি ও সমষ্টির কথা আমাদের গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের উপন্যাসে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে। অথচ প্রায় চল্লিশ বছর আগে উনিশ শ' উনিশ সালের সেই সমালোচনাতে সুহৃৎচন্দ্র চৌধুরী কতকটা ব্যাপক ভাবে বিশ্বের উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ 'সম্পূর্ণ নূতন উপকরণে নবভাবের উপন্যাস রচনা করা বর্তমানে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন দেশ কি এমন কোনো সভ্য কি অসভ্য জাতি নাই, যাহার মধ্য হইতে কোনও না কোনও সাহিত্যের উপন্যাসে নায়ক বা ঐরূপ কোনও চরিত্র আংশিকভাবে গৃহীত হয় নাই। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস, সাহিত্য-বিশেষে উপন্যাসের উপকরণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।'

আজকাল আমাদের সাময়িক পত্র-পত্রিকায় উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা মোটেই কম হয় না। কিন্তু এখানে এই বিশেষ প্রবন্ধটি উল্লেখ করবার একটি বিশেষ যুক্তি আছে। উপন্যাসে উপকরণ-বৈচিত্র্যের ব্যাপকতার উল্লেখ করে সুহৃৎচন্দ্র অতঃপর লিখেছিলেনঃ 'মানুষ এ পর্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাই উপন্যাসের উপকরণেও ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এখনও উপন্যাসকারগণ নূতন কিছুর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাসের যাহা প্রাণস্বরূপ, বোধ হয়, এতদিন তাহাই উপন্যাসকারগণ-দ্বারায় উপেক্ষিত হইয়াছে। মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে আঁকিয়া এ পর্যন্ত কোনও উপন্যাস-কারই দেখান নাই। কেহ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা বলিতে পারিনা। জীবনের শিল্পী প্রত্যেকেই আংশিকভাবে জীবনের ঘটনা-বিশেষকে বা সাময়িক ঘটনাবলীবিশেষকে লইয়া নিপুণভাবে শিল্প রচনা

করিয়াছেন, সমগ্র জীবনের শিল্পী ত কেহই হইতে পারেন নাই।—কোনও মহাত্মার একখানি আদর্শ জীবনচরিতে তাঁহার শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ধক্যের চরম অবস্থা পর্যন্ত সুন্দর পরিস্ফুট চিত্র দেখিয়া যে আনন্দ পাই, কোনও উপন্যাসকার কি সমগ্র জীবনের ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আনন্দ দিতে পারেন না?"

উপন্যাসের রীতি এবং বক্তব্য সম্বন্ধে তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' ছাড়া তাঁর আরো কোনো কোনো লেখা স্মরণীয়। সেই সূত্রেই এসব কথা মনে এলো। উপন্যাসের আদর্শের মধ্যে জীবন-চিত্রণের যে বিস্তার এবং পূর্ণতার আদর্শ নিহিত আছে, সুহৃৎচন্দ্র সেই অনস্বীকার্য লক্ষ্যের দিকেই আমাদের ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হবার অনেকদিন আগেই তাঁর ঐ প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। হয়তো 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে তাঁর বাঞ্ছিত আদর্শের দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর মতাবলম্বী পাঠকরা উত্তরকালে খুশি হতে পেরেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' আরো আগেকার রচনা। তাতেও মানুষের জীবনকে অপেক্ষাকৃত সমগ্রভাবে রূপায়িত করবার প্রয়াস ছিল। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখবার সামর্থ্যটা মানুষের পক্ষে কতদূর সম্ভব বলে কল্পনা করা যেতে পারে, সে-কথাও এই সূত্রে ভেবে দেখা দরকার। একথা মানতেই হয় যে, বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে আবদ্ধ মানবজীবনই আমাদের চোখে পড়ে থাকে। এক যুগের বিশ্বাস অন্য যুগে অটুট থাকে না; এক দেশের আচার অন্য দেশে সমাদর পায় না। মানুষের দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নিত্যরূপ যেটা, হয়তো সেই খণ্ডতা-অতিশায়ী অন্তর রূপ সত্যিই অপরিবর্তন-স্বভাব! কিন্তু আমাদের বাইরেটা তো কেবলই বদলে যাচ্ছে! আমাদের সেই পরিবর্তনশীল অনিত্যের লক্ষণগুলোই উপন্যাস-লেখকের আগ্রহের বিষয়। তাই দেশ-কাল-ঘটনাবিশেষের ওপর তাঁকে বিশেষ জোর দিতে হয়। 'সমগ্র জীবনের শিল্পী কেহই হইতে পারে না'—সুহৃৎচন্দ্রের এই মন্তব্যটি এই আবশ্যিক সীমারই স্বীকৃতি, ওটিকে ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মনে করা সংগত নয়।

কিছুদিন আগে ইংরেজি সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের কথাসূত্রে একজন সমালোচক 'স্বাভাবিক মানুষ' এবং 'উদারপন্থী মানুষ' ('Natural man' এবং 'Liberal man')—এই দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজি গল্প-উপন্যাসে উদার-

পন্থী মানুষেরই আদর ছিল। পরের শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সেই শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠা দেখা গেছে। হার্ডি, হাউসম্যান্, গলস্‌ওয়ার্দি, আর্নলড বেনেট, ওয়েল্‌স্, বার্নাড শ' প্রভৃতি লেখকরা,—তাঁর মতে, উদারপন্থী মানুষেরই ছবি এঁকে গেছেন; কায়দা-কৌশলের নানাবিধ ভেদ সত্ত্বেও এঁরা ছিলেন সেই শ্রেণীরই রূপকার। আর, ১৯১০-এর পরে লরেন্স, হাক্‌স্‌লি, হেমিংওয়ে ফক্‌নার প্রভৃতি গল্পকারের কলমে রক্তমাংসের খণ্ড-মানবতার দিকেই বেশি আনুগত্য লক্ষ্য করা গেছে। তাঁরা নাকি 'Natural man' এরই পক্ষপাতী।

পরিশেষে তিনিও কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় এই কথা জানিয়েছিলেন যে, মানব-কল্যাণব্রতী বা প্রগতি-অভিপ্রায়ী 'উদারপন্থী', আর রক্তমাংসের দাবি মেনে-চলা 'স্বাভাবিক',—এই দুই ভিন্ন দলের মধ্যে একই মানবজীবন-নিরীক্ষার দৃষ্টিক্ষেত্র দেখা যাবে। একদিকে প্রগতি, অন্যদিকে স্থূল আসক্তি,—এই দুইয়ের মধ্যে,—এই দোটানার মধ্যেই মানুষের জীবন প্রবাহিত! তা হলে প্রশ্ন এই দাঁড়ায় যে, যাঁরা সমগ্রভাবে মনুষ্যজীবন আঁকতে চাইবেন, তাঁদের পক্ষেও কি অভ্যস্ত প্রথার পথ ছাড়বার উপায় আছে? তা যদি না থাকে, তাহলে নতুনত্বের সম্ভাবনা কোথায়? নতুনত্ব কি শুধু আঙ্গিকে,—ভঙ্গিতে,—কৌশলেই সম্ভব?

প্রথম চিন্তাতে সেই রকমই মনে হতে পারে,—কিন্তু আরো ভেবে দেখলে অন্য পথও চোখে পড়ে। পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, প্রগতি-অধোগতি ইত্যাদি অভ্যস্ত দ্বৈত চিন্তার পরে, আমাদের একালের বিশ্বাসে বিজ্ঞানের নির্মোহ ক্রমাভিব্যক্তির চিন্তাই ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করছে। অর্থাৎ নৈতিক বা পারলৌকিক কোনো রকম শুভাশুভ-চিন্তা ছাড়াও জীবন-সত্যকে অন্য দৃক্‌কোণ থেকে দেখা সত্যিই সম্ভব। একালে লেখকদের গভীরতর চিন্তায় সৃষ্টিরহস্য সত্যিই যতো রহস্যময়,—নীতিজ্ঞান অথবা ধর্মসংস্কার ব্যতি-রেকেও তা যে-রকম আমাদের জ্ঞানের অতীত এবং মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর বলে বোধ হচ্ছে, আগেকার কালে ঠিক সে-রকম ছিল না! এদিকে বিশেষ এক রকম আত্মচৈতন্য ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। এ কালের ঔপন্যাসিককে হয়তো সেই নতুন মনোভঙ্গির সাহায্যে মানব-জীবনের নতুনতর সামগ্রিক ধারণা আয়ত্ত করতে হবে। উপন্যাসের প্রচলিত যে ধারার সঙ্গে পাঠকরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সেই অভ্যস্ত ধারা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের উপন্যাস যে

কোন্ পথে চলবে, সে সম্ভাবনা সম্যকভাবে ধারণা করা ত্বরূহ! বিশ্বাস নয়, অবিশ্বাস নয়,—পাপ নয়, পুণ্যও নয়,—জীবন কি শুধুই অকারণ, অকারণ চলা? জীবনের সে ধারণা কি আমাদের ধাতে সইবে?

তথাকথিত 'পুর্ণদৃষ্টি'র ব্যাপ্তি যে সত্যিই কতোটা বিস্তৃত হতে পারে, সে বিষয়ে নিজের নিজের সামর্থ্য অনুসারে অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর কোথায়? তবে, সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকুই নিশ্চিত ভাবে বোঝা যায় যে, দেশে-কালে বেষ্টিত ঔপন্যাসিক-মাত্রেরই মন নিজের-নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে দিনে দিনে, ধীরে ধীরে এক দৃষ্টি থেকে অন্য দৃষ্টির দিকে এগিয়ে থাকে। সেই গতি অনুসারে প্রত্যেক ঔপন্যাসিক এবং প্রত্যেক গল্প-লেখক নিজেদের লেখার মধ্যেই জীবন-সমালোচনার এক-একরকম ধারাবাহিকতা আর বিবর্তনের চিহ্ন রেখে যান।

সমালোচকের মনে তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' অথবা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সঙ্গে ফ্রয়েড এবং মার্কসের প্রসঙ্গ যেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক, তেমনি আবার, জমিদারী কাজের কথা, শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ, এ-দেশের গত তিরিশ চল্লিশ বছরের এবং তারো আগেকার তথাকথিত এই 'আধুনিক' যুগের নানা ঘটনার উল্লেখ, ইঙ্গিত বা বিশদ পর্যালোচনার প্রসঙ্গও ভোলবার নয়। জীবনের অভিজ্ঞতাই তো গল্প হয়ে ফুটে ওঠে, উপন্যাস হয়ে দেখা দেয়! মানুষের সমস্ত খণ্ড ঘটনার সমাহার যদি এক সঙ্গে একত্র করে দেখা সম্ভব হোতো, তাহলে রাজনীতি, সমাজচর্চা, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি মানুষের যাবতীয় বিদ্যা বা বৃত্তির অন্তর্নিহিত এই গভীর কথাটাই হয়তো সম্পূর্ণভাবে ধরা দিতো যে, এ-জীবন কী উপায়ে সুখে সার্থক করে তোলা যায়, দেশে দেশে সেই চেষ্টাই মানুষের একমাত্র চেষ্টা! সেদিন, তাঁর টালার বাড়িতে তাঁর সেই লেখা-পড়ার ঘরে বসে নিজের গল্প উপন্যাসের কথা-প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর তাই এক সময়ে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন:

> দেখ, গন্ধীজীর সেই উনিশ শ' একুশের আন্দোলন নিজের চোখে দেখেছি। রুশ-বিপ্লবের কথাও ভেবেছি। রুশ-বিপ্লবের ধারণা থেকেই—আমাদের দেশে গণবিপ্লবের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনে চিন্তা জেগেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছি যে, জাতির জীবনে 'সুখ' এক সুদূরপ্রসারী সাধনার ফল! মর‍্যালিটি ছাড়া সুখ হয় না।

দেখ, সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্ব এ সংসারে চিরকালের জিনিস। সৎকে কোথায় পাবে? ঈশ্বর-সাধনার মধ্য দিয়েই সে অবস্থায় পৌঁছোনো যায়। জীবনে যে জায়গাটাতে মানুষকে দাঁড়াতে হয়,—যে উৎস বা যে 'সোর্স' থেকে সত্যিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, সেটা কখনোই অসৎ হতে পারে না। ঈশ্বর সাধনা তো জীবসান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে বলে না!

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল সেদিন। বইয়ের তাক থেকে নিজের লেখা 'বিচারক' বইখানি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে সে বইয়ের শেষ দিকের দুটি অনুচ্ছেদ পড়তে হয়েছিল আমাকে। সেই অনুচ্ছেদ দুটি এই :

'গুলিবিদ্ধ হয়ে মরণোন্মুখ মানুষ আজ অক্রোধের মধ্যে রাম নাম উচ্চারণ করতে পেরেছে। যুদ্ধে আহত মরণোন্মুখ মানুষ নিজের মুখের জল অপরের মুখে তুলে দিয়ে বলেছে—'তোমার প্রয়োজন বেশি। Thy need is greater than mine।

নিষ্ঠুরতম অত্যাচারেও মানুষ অন্যায়ের কাছে নত হয়নি; ন্যায়ের জন্যে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছে। দুর্বল বিপন্নকে রক্ষা করতে সবল ঝাঁপ দিয়েছে বিপদের মুখে, নিজের মৃত্যু বরণ করে দুর্বলকে রক্ষা করেছে। বিবেচনা করতে সময়ের প্রয়োজন হয়নি। চৈতন্যের নির্দেশ প্রস্তুত ছিল। চৈতন্য জীব-প্রকৃতির অন্ধ নিয়মকে অবশ্যই অতিক্রম করেছে।'

উপন্যাসে কাছের সমাজের ছায়া পড়বেই। সেটা না ঘটাই তো অস্বাভাবিক। কিন্তু নিকট দেশ-কাল-ভাবনার কথা তাতে যতোই প্রতিফলিত হোক, মানব-সত্যের অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর, স্থায়িতর উপলব্ধি ব্যক্ত করবার দিকেই কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের আগ্রহ দেখা যায়। তারাশঙ্কর সেই দলের লেখক এবং এ-কথা শুধু যে উপন্যাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তা নয়। বোধ হয়, কোনো কোনো গল্পকারের মধ্যেও এ সত্য সমান সত্য! অন্ততঃ তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে একথা বললে অন্যায় হবে না যে, গল্প এবং উপন্যাস দুই বাহনের মধ্য দিয়েই গভীর এবং সুদূরব্যাপী মানব-সত্যের কথা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। নিজের কালের খণ্ড সত্যটুকু কোনো ভাবেই উপেক্ষা করেন নি তিনি। তবে, বক্তব্যের দিক থেকে

তাঁর যদি কিছু বিশিষ্টতা থাকে, তাহলে সেটা এই যে, তাঁর নিজের দেশে-কালে ব্যক্ত মানব-সত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি অকুণ্ঠ ভাবে আশাবাদী! মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজগঠন ইত্যাদির মধ্যে তিনি ত্যাগ, অহিংসা, সত্য এবং ধর্মের প্রাধান্যই লক্ষ্য করেছেন!

তারাশঙ্করের লেখাতে রাজনীতি খুব বেশি মিশে আছে বলেই এ-দিকটা সতর্কভাবে দেখা দরকার। তিনি সাম্যবাদী না গান্ধীবাদী—এ ধরনের প্রশ্নই বা অসংগত মনে হবে কেন? ১৯৫১-৫২ থেকে শুরু করে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাম্যবাদের আলোচনায় তিনি খুবই অনুরাগী ছিলেন। মনে পড়ে, তারই কাছাকাছি সময়ে,—তেরশ' একান্ন সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছোটো গল্পের একখানি সংগ্রহ সম্পাদনা-সূত্রে শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকাতে লিখেছিলেন: 'সাহিত্যিক আজ আর শূন্যচারী স্বপ্নবিহঙ্গম হয়ে থাকবেন না, মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিকব্রত গ্রহণ করবেন। এ দাবী যুগের, এ দাবী স্বাধীনতার। কিছুদিন আগেও তারাশঙ্কর তাঁর একটি অভিভাষণে স্পষ্টাক্ষরেই এই কথাটি বলেছেন।' সাহিত্যিকের 'সৈনিকব্রত' সম্বন্ধে সম্পাদকের এই ঘোষণা সত্ত্বেও সে-সংকলনে তারাশঙ্করের যে গল্পটি ছাপা হয়েছিল, তাতে সামান্য কিছু কলহের কথাও ছিল বটে, কিন্তু কলহের মীমাংসা সম্বন্ধে তিনি যে পথ দেখিয়েছিলেন, সে কোনো উগ্র শাক্তভাবের পথ নয়! তাকে বরং বৈষ্ণবোচিত সহিষ্ণুতা বলা যেতে পারে। তাঁর সেই গল্পটির নাম 'শেষ কথা'।

লাট ভরতপুরের জমিদার সাউবাবুরা কোনো এক আদিকালে পদ্মাপার থেকে এসে বসেছিলেন। 'প্রজারা সব বেকুবের দল',—সরল, বিশ্বাসী চাষী মাত্র। জমিদারীর সীমানা নিয়ে সাউবাবুদের সঙ্গে হলদীবাড়ির সাঁই-বাবুদের হঠাৎ যখন ফৌজদারী ঝগড়া বেধে যায়, তখন সাঁইবাবুদের পাইকের দল ভরতপুরের পাশের লাট—লাট ধর্মপুরে চড়াও হয়। তখন সাউবাবুদের তরফে ভরতপুরে সাজ সাজ রব উঠলো। সেই অবস্থায়, ভরতপুরের চাষীদের মোড়ল বুড়ো লালমোহন পাণ্ডেকে নিয়েই তারাশঙ্কর তাঁর 'শেষকথা'তে গল্পকার এবং জীবন-সমালোচক হিসেবে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে তোলবার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই জীবন-সমালোচনার মর্মকথাটুকু এই:

বুড়ো লালমোহন পাণ্ডে ভরতপুরের চাষীদের চাঁই। খাটো করে চুল ছাঁটা, দাঁতগুলি সব পড়ে গেছে, আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, বুড়ো ভাবনায় মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।
দলে দলে ভরতপুর লাটের লোকেরা এসে বুড়োকে ঘিরে বসলো।
সসম্মানে হাত জোড় করে বুড়ো ফোকলা দাঁতে—মায়ের কোলে শিশুরা যে হাসি হাসে আপনার বাপখুড়ো ভাই বোনদের দেখে—সেই হাসি হেসে বললে, আসুন পঞ্চ।'

তখন গৌরপুরের একজন প্রজা ক্ষুব্ধ হয়ে এই প্রস্তাব করে যে, সাউবাবুরা যখন তাদের জমির মালিকানী মানছে না, তখন সাউদের পক্ষে সাক্ষী না হয়ে তারা বরং সাঁইদের পক্ষেই সাক্ষী হতে পারে।

বুড়ো লালমোহন তাতে কিন্তু গররাজী। তার অসম্মতির কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়,—কারণ এই—'বুড়ো ঘাড় নাড়তে লাগল, উঁহু পাপ হবে।'

তারাশঙ্করের 'শেষ কথা-'তে তাঁর এই পাপ-পুণ্য-চিন্তা, এই অধ্যাত্মবোধ, ভগবানে বিশ্বাস—অর্থাৎ মানব-জীবনের এই রকম কয়েকটি চিরকালের কথারই সহজ অভিব্যক্তি!

সেদিন, তাঁর নিজের সাহিত্য-সাধনার কথা বলতে বলতে তাঁর মুখে সেই বিশ্বাসের প্রসঙ্গই আবার দেখা দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন:

'সুভাষচন্দ্রের আমি খুবই ভক্ত।...১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমার ইণ্টানমেণ্ট হয়। তখন থেকে,—কিংবা তার কিছু আগে থেকেই শুরু করে উনিশ শ' তিরিশ পর্যন্ত আমার সক্রিয় রাজনীতি-জীবনের বিস্তার ধরলে ভুল হবে না।...জীবনের যে-সব অধ্যায় পেরিয়ে এসেছি, সবটা এক ধারায় দেখতে পাই এখন। আমাদের কুলধর্ম তান্ত্রিক। আমি কিন্তু মনে মনে বৈষ্ণব হতে চেয়েছি।...বিরোধ ঘটেছে বইকি। ...ফিরেছি আবার শক্তিমন্ত্রে।...জীবন যে কী বিপুল সমগ্রতা!...আমার বাবা 'তারা' প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেরশ' চারের আশ্বিনে,—কোজাগরীর আগের রাত্রে।

ঠিক সেই কথার পরেই তাঁর প্রিয় বুদ্ধমূর্তিটির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিগেস করেছিলুম,—'ওটির ইতিহাস কী? বলুন শুনি'।

—ও! রেঙ্গুনের এক ভদ্রলোক ওটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রসন্ন হাসি ফুটেছিল তারাশঙ্করের মুখে।

তাঁর চীন-ভ্রমণ, রুশ-ভ্রমণের কথাও উঠেছিল সেদিন। বিনোবা ভাবের ভূদান-প্রসঙ্গও উঠেছিল। গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেছিল বার বার।

তারপর উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য কী, সে-বিষয়েও তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করেছিলুম কথার মধ্যে। তিনি নিজের লেখাতে কাটাকুটি করেন কেন, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করতে ভুলিনি। তিনি যখন উপন্যাসের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ দু'একটি কথা বলছিলেন, আমি তখন এ-কালের আরো দু'একজন বাঙালী লেখকের কথা ভাবছিলুম। অন্নদাশঙ্কর অবিশ্যি অনেকদিন আগেই তাঁর ধারাবাহিক 'এপিক-উপন্যাস' লিখেছিলেন। গোপাল হালদার সে তুলনায় আরো সাম্প্রতিক লেখক। 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' ইত্যাদির মধ্যে তারাশঙ্কর যেমন এক পর্বের কথা বলেছেন, 'উজান-গঙ্গা'র (প্রথম মুদ্রণঃ ১৩৫৭ শ্রাবণ) 'নিবেদন' অংশে গোপাল বাবু তেমনি জানিয়েছেনঃ

> 'এ গ্রন্থের ঘটনাকাল মোটামুটি ভাবে ১৯২৭ থেকে ১৯৩০; এবং রচনাকাল ১৯৩৪-৩৫। দেরিতে প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক কথা এখন অনাবশ্যক মনে হয়েছে। পূর্বেকার লেখার অনেক তাই কাটছাঁট করতে হয়েছে। বাঙালী ভদ্র শ্রেণীর পতনের পরিচ্ছেদ আমি কয়েকটি প্রবীণ মানুষের চোখে দেখতে চেষ্টা করেছি—প্রথম 'ভাঙনে' (১৯৪৭), তারপর 'স্রোতের দীপে' (১৯৫০)—আর এখন এই শেষ খণ্ডে—'উজান-গঙ্গায়।'

এই 'নিবেদন'-এর তারিখ ছিল তেইশে জুলাই, ১৯৫০। তারাশঙ্কর ছিলেন তখনকার বাংলা উপন্যাস লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক যশস্বী। গোপাল হালদার তাঁর ঐ নিবেদনে তাঁর আগেকার লেখাতে কাটছাঁটের যে কারণ দেখিয়েছিলেন, তারাশঙ্করও সেই কারণেই কাটছাঁট করেছেন। সে-কাজ সব লেখককেই করতে হয়। কেউ একটু বেশি করেন, কেউ একটু কম।

সেদিন, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে বলেছিলুম, 'আজ আমার কলেজের সময় হয়ে এলো। এবার উঠি দাদা।'

আমাকে কলেজ স্ট্রীটে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি বার করতে বলেই আবার যেন নিজের দিকে সম্পূর্ণভাবে তাকিয়ে দেখেছিলেন তারাশঙ্কর। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন: 'Faith তো অলঙ্ঘনীয় আশ্রয়। তাকে জীবন-নীতি বলতে পারি। কিন্তু জীবন-রীতির পরিবর্তন বার বার ঘটতে পারে!'

*

* *

॥ তারাশঙ্করের কলা-কৌশল ॥

উনিশ শ যাটের ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলা হিসেবে তের শ' সাতষট্টি সালের পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাস যা-কিছু ছাপা হয়ে গেছে, সেই লেখাগুলির কথা একসঙ্গে ভেবে দেখলে নিজের এই ব্যক্তিগত ধারণার কিছুতেই প্রতিবাদ করা চলে না যে, উপন্যাসের তুলনায় গল্প রচনার ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর শিল্প-দক্ষতার বেশি পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে বড়ো বেশি তথ্যের ভিড়। তাতে আবেগ ভাবালুতায় না ঠেকা পর্যন্ত তিনি যেন থামতে নারাজ। তাঁর উপন্যাসের সূচনা বড় বেশি সাধারণ,—পরিণতি কেমন যেন মন্থরগতি,—উপসংহার প্রত্যাশিত এবং বিস্ময়হীন! মন্থরতা, অতিকথন এবং ভাবাবেগ তাঁকে পদে পদে বাধা দিতে থাকে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে বাধা তিনি কিছুতেই যেন কাটিয়ে উঠতে পারেন না। কিন্তু গল্পে তাঁর পথ অব্যাহত। গল্পে তিনি সংযমী, সংযতবাক্, সন্দেহাতীত ভাবে অব্যর্থ!

অবিশ্যি সব উপন্যাসেই তিনি যে সমান শ্লথগতি কিংবা সমান বৈচিত্র্যহীন, সে-কথা নয়। দু'একটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ আছে বটে। কিন্তু সাধারণ ভাবে তাঁর উপন্যাস এবং তাঁর গল্পের আবেদনের তুলনা করতে হলে সে-সব ব্যতিক্রমের কথা উহ্য রাখতে হয়।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'কবি' (১৩৪৮) এক ধারার আদিতে এবং 'চৈতালী ঘূর্ণী' যে আর এক ধারার আদিতে, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। 'কবি'র সূচনাটা তবু কিছু পরিমাণে কলা-সমৃদ্ধ বলতে আপত্তি নেই। তাতে বেশ নাটকীয় ভাবেই তিনি তাঁর কথা আরম্ভ করেছিলেন। সেই সূচনার কয়েক লাইন এখানে তুলে দেখা যেতে পারে:

'দস্তুরমত একটা বিস্ময়!

নজীর অবশ্য আছে বটে,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ; কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোম বংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না, সে বিষয়ে কোন

শাস্ত্রীয় নজীর নাই। বলিতে গেলে গা ছম্‌-ছম্‌ করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়া মানিয়া লইল।'

এইভাবে 'কবি' উপন্যাসের নায়ক ডোম বংশজাত বীরবংশী নিতাই-চরণের জীবনের প্রধান কথাটা এবং সেই সঙ্গে তাঁর এই 'কবি' উপন্যাসেরও প্রধান বিষয়বস্তুটি বইয়ের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই ব্যঞ্জিত হতে দিয়ে, তিনি অতঃপর নিতাইয়ের পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের পরিচয় দিয়েছেন। নিতাইয়ের রূপ-গুণ বংশের পরিচয় দিয়ে তিনি আবার লিখেছেন—'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; দীর্ঘ সবল কঠিনপেশী দেহ, রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙ। কিন্তু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।'

অট্টহাস গ্রামে মহাদেবী চামুণ্ডার পীঠস্থান। মাঘী পুর্ণিমায় চামুণ্ডা-পূজা উপলক্ষে সেখানে এক বিরাট মেলা বসে। সেই মেলাতে সে-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল নোটনদাস আর মহাদেব পালের আসবার কথা ছিল। মহাদেবের দল এসে পৌছোলো, কিন্তু আগের বারের গানে পুরো হিসেব মতন দক্ষিণা পাওয়া যায়নি বলেই নোটনদাস সেবারে যোগ দিলো না। সেই দুর্যোগে পড়ে উৎসব বিফল হতে যাচ্ছে দেখে, রোষে প্রমত্ত গ্রাম্য জমিদার ভূতনাথ যখন উপস্থিত কয়েক জনের ওপর চড়াও হয়ে ওঠেন, সেই সময়ে মহাদেব কবিয়ালই বলেছিল—'এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে, তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে।'

'কবি' উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে এইখানে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে। তারপর একে একে কুড়িটি অধ্যায়ে,—ছাপা বইয়ের মাত্র শ'দুয়েক পৃষ্ঠাতেই তারাশঙ্কর তাঁর সে উপন্যাস শেষ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের যেটুকু ঘটনা-পরিচয় এখানে সংক্ষেপে দেখা গেল, তাকে অবান্তর বাহুল্য বলা চলে না। কথায় কথায় নোটনদাসের চাতুর্য, ভূতনাথের রাগ, রাখহরির রসিকতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ দেখা দিয়ে গেছে তারই মধ্যে। চরিত্রের বৈচিত্র্যে, কথাবস্তুর সহজ এবং মসৃণ গতিতে 'কবি' উপন্যাস সত্যিই ভারহীন, সুখপাঠ্য রচনা হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, নিতাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু রেলস্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান রাজালাল বায়েন, রাজালালের বউ,—তারই

ছোটো বোন এবং 'রাজা'র শ্যালিকা,—রাজার দেখাদেখি নিতাইও যাকে 'ঠাকুরঝি' বলে ডাকতো,—চায়ের দোকানদার বিপ্রপদ,—ঝুমুর গানের পুরো একটি দল এবং সেই দলের দীর্ঘ কৃশতনু গায়িকা বসন,—রেল-লাইন ধরে, দুধের ঘটি মাথায় বসিয়ে দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মতন, প্রতিদিনের আগন্তুক নিতাইয়ের প্রণয়িনী ঠাকুরঝির মূর্তি,—নানা সুখস্মৃতির মাধুর্যময় একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ—এবং সেই গাছকে ঘিরে, ঠাকুরঝিকে ঘিরে নিতাইয়ের গান-বাজনা—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে',—আবার আশ্চর্য সেই বসন ওরফে বসন্ত,—যার সম্বন্ধে নিতাইয়ের মনে হয়েছিল—'মেয়েটা যেন গল্পের সেই মায়াবিনী, প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ হইলে সে বেঁজী হয়, বিড়াল হইয়া বেঁজীরূপিণী তাহাকে আক্রমণ করিলে বেঁজী হইতে সে হয় বাঘিনী'—এরা সকলে মিলে,—মানুষ এবং প্রকৃতি পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখা দিয়ে, 'কবি' উপন্যাসের মধ্যে এমন এক সার্থকতা ঘটিয়েছে, যা তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিরল, কিন্তু তাঁর গল্পে যা মুহুর্মুহু দেখা দেয়! বিশেষ একটি গোষ্ঠী এবং বিশেষ এক ধরনের সমাজের ছবিই তিনি এঁকেছেন বটে, কিন্তু ধ্রুব, অখণ্ড মানব-সত্যের দিকে সে-গল্পের উন্মুখতা চিনে নিতে দেরি হয় না। সেখানে আবেগ প্রগাঢ়, আখ্যান সীমিত, ভঙ্গি রসিকের!

উপন্যাসে এই রসিকের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেখানেই তথ্যজ্ঞানী বা তত্ত্ব প্রচারকের উদ্দেশ্যবোধ প্রধান হয়ে ওঠে, সেখানেই সমুচিত কলা-কৌশলে বিঘ্ন ঘটতে থাকে। গল্পের সম্বন্ধেও সেই কথাই স্বীকার্য। তবে, ছোটোগল্প আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোটো হতে বাধ্য বলেই প্রগল্‌ভস্বভাব লেখককেও সে-ক্ষেত্রে সাবধান হতে হয়। তারাশঙ্করও তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে সাবধানে পথ চলেছেন। কিন্তু উপন্যাসের বিস্তার-গুণটুকু আবশ্যিক ভাবেই কতকটা সহজে লাভ করা যায় বলে, সে-ক্ষেত্রে তাঁকে প্রায়ই মাত্রা ছাড়াতে দেখা যায়।

উপন্যাসের শিল্প-বিশেষত্বের দিক থেকে নানা কথা ভেবে দেখা দরকার। সেই কথা-প্রসঙ্গে প্রথমেই উপন্যাসের 'প্লট' এবং সূচনা-রীতির কথা মনে পড়ে। এইবার সেদিকে একটু বিশদ ভাবে নজর দেওয়া যাক।

ঃ প্লট ও সূচনা ঃ

উনিশ শ আটাশ খ্রীষ্টাব্দে, শরৎচন্দ্রের তিপ্পান্নোত্তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ-সমিতি থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেই

অভিনন্দনের জবাবে তিনি নিজের উপন্যাস রচনার বিশেষত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছিলেন। তাতে উপন্যাসের 'প্লট' সম্বন্ধে তাঁর আত্মচিন্তার নজীর পাওয়া যায়। তিনি যা বলেছিলেন, পরে, সেই কথাগুলিই এক ভাবে ছেপে বেরিয়েছে। তাতে ভাষার সমতা নেই বটে, কিন্তু মূল বক্তব্য বোধ হয় ঠিকই আছে। তিনি বলেছিলেন ঃ

> 'অন্যান্য গ্রন্থকারের যা নিয়ে বিপদ—প্লট পায় না—সেই সম্বন্ধে আমাকে কোন দিন চিন্তা করিতে হয় না। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নিই, তাহাদিগকে ফোটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিষ আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিষ কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাইবার জন্য প্লট দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে-সব আপনি আসিয়া পড়ে। আজকাল যাঁরা যাঁরা লিখিতেছেন, দেখি প্লটের উপর তাঁদেরও কোন দৃষ্টি নাই, চরিত্রগুলি ফোটাবার জন্য তাঁদের মুখে নানা কথা বার হয়—তাদের, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, আনন্দ এই ধারাতে আসিয়াছে, গল্পাংশ যা আছে তা বাধা পায় না।

শরৎচন্দ্র সেই সভাতে মুখে মুখে মুখে যা বলেছিলেন, এ-উদ্ধৃতি সেই ভাষণের 'রিপোর্ট' থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্রিয়াপদে-সর্বনামে সাধু-চলিতের মিশ্রণ হয়তো সেই কারণেই। শরৎচন্দ্র বক্তৃতা দিতে বড়োই কুণ্ঠিত হতেন। হয়তো সেই কুণ্ঠাবশতঃই ভাষার সমতাতে বাধা ঘটেছিল। ১৯২৮ সালের 'স্বদেশী বাজার'-এ তাঁর এই ভাষণ ছাপা হয়েছিল এবং পরে 'শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ' গ্রন্থমালার একাদশ সম্ভারে তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

উপন্যাস যে মনুষ্য-সংসারের গদ্যে লেখা কাহিনী,—এবং বিশেষ কালে, বিশেষ দেশে,—বিশেষ সমাজের প্রথাতে, আদর্শে, বিশ্বাসে অভ্যস্ত এক-একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাস্তব পরিবেশ এবং আত্মিক বোধ, বাসনা ইত্যাদি বিষয়ে সমবেদনাময় সমালোচনার দায়িত্ব যে উপন্যাস-লেখকদের অন্তরে অনুস্যূত হয়ে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তবে, সব আদর্শেরই তারতম্য বা হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। মনুষ্যত্বের দিকে যাঁদের বেশি ঝোঁক—মনঃপ্রবাহের উদ্ঘাটনে একাগ্রচিত্ত, সেই-সব ঔপন্যাসিকের কথা

আলাদা। জীবন-সমালোচনার কাজে তাঁরা যদিও বা আগ্রহী হন, তবে তা যে কতকটা পরোক্ষভাবেই,—তাতেও সন্দেহ নেই। ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত আনুকুল্যমাত্র অবলম্বন করে চৈতন্যের স্রোতকে ব্যক্ত হতে দেওয়াই তাঁদের কাজ।

এই প্রসঙ্গটি একটু বিশদভাবে দেখা দরকার।

বের্গসঁর দার্শনিক মতামতের ঢেউ থেকে ফরাসী সাহিত্যের আসরে এই বোধটি বিশেবভাবে দেখা দিয়েছিল যে, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র বুদ্ধিতে নয়,—সেটা বরং মানুষের বোধে,—তার অনুভূতিতেই আশ্রিত! অর্থাৎ জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা,—যা গভীরতম,—তাকে আমাদের এই সজাগ চৈতন্যের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। সে এক অর্ধচেতনার উপলব্ধি! দার্শনিকের অনুসন্ধানেই তা ধরা দেয়। অন্তরের গভীরে, মানুষ বুঝতে পারে যে, এ জগৎ কেবলই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় সরে যাচ্ছে,—এক রূপ থেকে রূপান্তরে! ফরাসী সাহিত্যে ফ্রয়েডের মনোবিকলন-সম্পর্কিত ধারণার ফল ফলবার আগেই সেখানে বের্গসঁর প্রভাব পড়েছিল। ফরাসী ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ৎ (১৮৭১-১৯২২) নিজে বলে গেছেন যে, ফ্রয়েডের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার আগেই বের্গসঁকে তিনি চিনেছিলেন!

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রুস্তের জন্ম হয় প্যারি নগরীর কোনো এক ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে। প্রথমে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তারপর ১৯১৪ সালে তাঁর কিছু প্রবন্ধের সংকলনও ছাপা হয়েছিল। রাস্কিনের লেখা থেকে তিনি কিছু অনুবাদের কাজও করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৯ সাল থেকেই নিজেকে তিনি যেন গুটিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সুবিপুল উপন্যাস লিখতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ তিরিশ বছর, আর, বিশ শতকের প্রথম দুটি দশক—মোট এই পঞ্চাশ বছরের ফরাসী সমাজের ছাপ পড়েছিল তাঁর লেখার মধ্যে। সর্বসমেত ষোলটি খণ্ডে সে উপন্যাসের কাহিনী প্রবাহিত। ইংরেজি অনুবাদে তাঁর বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'Remembrance of of Things Past'।

তাঁর সে উপন্যাস ঠিক গতানুগতিক কাহিনী নয়। প্রুস্ৎ সেখানে সুসম্বদ্ধ কোনো 'প্লট' পরিবেষণ করেন নি। বিশাল আয়তনের জন্যে তাঁর সে-রচনা স্মরণীয় তো বটেই,—তা ছাড়া সে-বইয়ের সম্বন্ধে ঠিক 'উপন্যাস'

কথাটা না বলে, তাকে এক-রকম আত্মজীবনী বললেই বোধ হয় ভালো হয়। লেখকের মনের পরিণতির স্তরগুলি সেখানে পর-পর, একে-একে দেখা দিয়েছে। প্রথমে দেখা দেয় রুগ্ন একটি বালক—ক্রমশঃ, তারই পরিণতির ধারায় এসে দাঁড়ায় চিন্তাগ্রস্ত একজন যুবক,—নানা জনের সঙ্গে তার মেলামেশা,—সে মেলামেশাও আবার সহজ নয়,—কেমন যেন ব্যাহত, কেমন যেন প্রয়াস-তাড়িত! অতঃপর তারই একাধিক প্রণয়ালোড়ন! এবং পরিশেষে, তার প্রায় স্থবিরত্বে গিয়ে ঠেকা! সংক্ষেপে এই হোলো ঘটনাধারা! চার-পাঁচ হাজার ছাপা পৃষ্ঠার মধ্যে তারই অসংখ্য আত্মীয়-পরিজনের ভিড় আসা-যাওয়া করেছে। মানুষের মিছিল চলেছে সময়ের নহর ধরে। সময়ের আনুগত্য করাই যেন মানুষের বিধিলিপি! সময় যেন প্রুস্তের সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিল!

ইংরেজিতে সে-উপন্যাসের ছাঁদকে বলা হয় Symphonic—অর্থাৎ নানা রকম ঘটনা, বর্ণনা, উল্লেখ আর অনুষঙ্গের সম্মিলন ঘটিয়ে, ঐকতান সংগীতের স্বাদ সঞ্চারের দিকেই যেন সে-ছাঁদের আগ্রহ! স্মৃতির সুতোতে, জীবনের ছোটো-বড়ো কতো ঘটনাই যে জড়িয়ে থাকে! রাত্রে আলো নিভিয়ে, বিছানায় গা ঢেলে দেবার পরেও কিছুতেই ঘুম আসতো না মার্সেলের। অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে কতো কথাই যে মনে পড়তো। সেদিন সে যে-বইটা পড়ছে, হয়তো তারই কোনো কথা। হয়তো, আর কিছু। মফস্বলের কোম্‌ব্রে শহরেতে জীবনের অতিক্রান্ত ক'টা দিন,—মায়ের সঙ্গে কবে যেন একদিন ভেনিসে যাওয়া হয়েছিল। ছেলেবেলায়, সেই কোম্‌ব্রেতেই মোশিয়েঁ সোয়ান নামে এক ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন এক রাত্রে। মার্সেলকে সে-রাত্রে খুবই তাড়াতাড়ি বিছানায় যেতে হয়েছিল। কখন যে সোয়ান উঠবেন,—কখন যে মা ফিরবেন মার্সেলের কাছে,—ভাবতে-ভাবতে কেমন যেন ভয় ঢুকেছিল মনের মধ্যে। অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল সমস্ত মন। তারপর, আরো কতোবার যে মনে পড়েছে সে-কথা। আরো অনেকদিন পরে, একদিন মায়ের কাছে বসে চায়ের সঙ্গে মিষ্টি এক টুক্‌রো কেক খেতে খেতে মনের মধ্যে দপ্ দপ্ করেছে সেই স্মৃতি! মনে পড়ে, কোম্‌ব্রে শহরে পার্কের পাশ দিয়ে চলে-যাওয়া সেই রাস্তাটা,—সেই পার্ক, যেখানে লিলাক্ আর হথর্ন ফুটতো থরে থরে। আর, নদীর পাড়ের সেই অন্য রাস্তাটাও। রাস্তায় বেড়াতে-বেড়াতে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হোতো—আর, সেই যাজক-মশায়ের

সঙ্গেও। সেই গান-লিখিয়ে মানুষটিকেই কি ভোলা যায়—নিজের মেয়ের সঙ্গে একটি বাজে মেয়ের বন্ধুত্ব হয়েছিল বলেই যাঁর নাকি মন ভেঙে গিয়েছিল, —এবং তারই ফলে, শেষটায় মরেই গেলেন তিনি! মোশিয়েঁ সোয়ানের স্ত্রীকেও মনে পড়ে। তাঁদের প্রেম! নাম তাঁর ওদেৎ-হ্য-ক্রেশি—সোয়ানের প্রেমিকা, সোয়ানেরই স্ত্রী। বিয়ের পরে সোয়ান কিন্তু বড়লোকদের সমাজই পছন্দ করতেন। তেমন তেমন জায়গায় যেতে হলে একলাই যেতেন। রাস্তায় বেড়াতে-বেড়াতে মার্সেল দু একদিন শ্রীমতী সোয়ানকেও দেখেছে,— তাঁরই সঙ্গে তাঁর মেয়ে গিলবার্টকেও। সেই মেয়েটিকে কী ভালোই যে লেগেছিল! কিন্তু ক্রমশঃ মার্সেলের সঙ্গ তার বড়োই একঘেয়ে মনে হতে লাগলো। শেষ হোলো সে পর্ব। সবাই মার্সেলকে স্থবির বলে ধরে নিলো। তারপর দিদিমার সঙ্গে সমুদ্রতীরে কিছুদিন। এবং সেখানে দেখা দিয়েছিল আর একটি মেয়ে। তাকে দেখামাত্র মুগ্ধ হয়েছিল মার্সেল। একদিন, কাছাকাছি আর এক শহরে বেড়াতে গিয়ে, মার্সেল তার বন্ধুর প্রণয়িনী ইহুদী অভিনেত্রী র‍্যাশেলকে দেখেছিল। তারপর দিদিমার সঙ্গে প্যারিতে ফিরে যাওয়া। সেখানে পথে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন সংজ্ঞা হারালেন দিদিমা। তাঁর অসুখ, তাঁর মৃত্যু। কী আশ্চর্য ভালো ছিলেন তিনি! তাঁর মৃত্যুর পরে সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল। শূন্য, শূন্য, শূন্য! দিদিমার সঙ্গে সমুদ্রতীরের সেই শহরে বেড়াতে গিয়ে যে মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল মার্সেল, অতঃপর সেই মেয়েটির সান্নিধ্য পাওয়া গিয়েছিল। অ্যালবার্টিন (Albertine) চলে এসেছিল প্যারি থেকে। মার্সেলের সন্দেহ-ব্যাধিতে,— তার ঈর্ষ্যাতে,—এবং তার নানারকম খেয়ালে প্রশ্রয় দিতে না পেরে, অ্যালবার্টিন শেষে জেরবার হয়ে ফিরে যায় সেই সমুদ্রতীরের শহর ব্যালবেকে। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একদিন মরলো সেই আশ্চর্য মেয়েটি! সে যখন কাছে ছিল তখনও সুখী হয়নি মার্সেল,—সে যখন ব্যালবেকে ফিরে গিয়েছিল তখন কিন্তু ভারি লক্ষ্মীছাড়া মনে হোতো নিজেকে। তার মৃত্যুর পরে তার একখানা চিঠি এসেছিল মার্সেলের নামে। হায় রে হায়! হায় রে হায়,— তাতে মার্সেলের কাছেই ফিরতে চেয়েছিল সে!

অ্যালবার্টিনের মৃত্যুর পরে পুরোনো আলাপীদের মধ্যে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছিল মার্সেল। কিন্তু সময় কি দাঁড়িয়ে থাকে? নিরন্তর বদলে যাচ্ছে সময়ের ঢেউ।

যুদ্ধের কটা বছর ভাঙা শরীর নিয়ে একটা স্বাস্থ্যনিবাসে কাটিয়েছিল মার্সেল। তারপর যখন প্যারিতে ফিরলো, তখন সোয়ান মারা গেছে,—র‍্যাশেলের স্বামীও যুদ্ধে গেছে,—মস্তো বড়ো নাম করা অভিনেত্রী হয়েছে তখন র‍্যাশেল। গিলবার্টেরও বিয়ে হয়ে গেছে তখন।

একদিন এক উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে মার্সেল গিয়েছিল চেনা বড়লোকদের বাড়িতে। সেখানে গিলবার্টের মেয়েকে দেখে আবার মনে পড়েছিল সময়ের কী অজস্র ঢেউ-ই না বয়ে গেছে ইতিমধ্যে! বুড়ো হয়েছে মার্সেল। সত্যি, খুবই বুড়ো হয়ে গেছে সে। আর লাইব্রেরি থেকে জর্জ স্যাণ্ড-এর লেখা একখানা উপন্যাস টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে তার মনে পড়ে যায় যে, অনেক, অনেক দিন আগে কোম্‌ব্রেতে থাকবার সময়ে, সেই অবিস্মরণীয় এক রাত্রে তার মা তাকে সেই বইখানাই পড়ে শুনিয়েছিলেন! স্মৃতির গভীরে হঠাৎ ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে—মোশিয়েঁ সোয়ান চলে যাচ্ছেন,......কোম্‌ব্রের সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে তিনি যখন বিদায় নিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন এই ঘণ্টা বেজেছিল। আর মার্সেলের মনে হয়েছিল যে এ বাজনা সে কোনোদিনই ভুলবে না। সময়,......আশ্চর্য সময়,......সব-কিছু সংহার করে করে এগিয়ে যাওয়া সময়!

প্রুস্‌ৎ এইভাবেই তাঁর স্মৃতিকথাময় সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখেছিলেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, প্রথাগত রীতিতে, কল্পনাবলে, ঘটনা বা চরিত্র গড়ে তোলবার চেষ্টা করেননি তিনি। যেসব ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাঁর মনে স্থায়ী রেশ রেখে গিয়েছিল, সেই সংবেদন ধরে-ধরেই তাঁর কলম এগিয়ে গেছে এক অভিজ্ঞতা থেকে অন্য অভিজ্ঞতার দিকে!

প্রুস্‌ৎ তাঁর এই স্মৃতি-জগতের অভিনিবেশ-সূত্রে শোপেনহাবারের ভাব-জগৎ সম্পর্কিত বিশ্বাসের খুবই কাছাকাছি গিয়েছিলেন বলে কোনো কোনো সমালোচক উল্লেখ করেছেন। বের্গসঁ এবং শোপেনহাবার ছাড়া ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গেও তাঁর নাকি সাদৃশ্য আছে। যুক্তি-তর্ক বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেয়ে এক লহমার গভীর উপলব্ধির ওপরেই ওয়ার্ডস্বার্থও তো জোর দিয়ে গেছেন!

স্মৃতির প্রবাহে যে-সব গল্প পর পর ঘটে গেছে, প্রুস্‌ৎ তাঁর বইয়ের মধ্যে সেগুলিকে আলাদা-আলাদা সাংকেতিক শিরোনামে সাজিয়ে গেছেন।

সব মিলিয়ে দেখলে ক্রমানুস্যূত একটি ধারার ধারণা জাগে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণতার বিচারে একথা মানতেই হয় যে, এই সব অংশ-বিভাগ সত্যিই বড়ো আলগা ধরনের। আঁটসাঁট 'প্লট' বলতে যা বোঝায়, সে-জিনিস তাঁর এ লেখাতে অনুপস্থিত। আর একথাও ভোলবার নয় যে, তিনি তাঁর এই সুবিপুল উপন্যাস লিখতে অনেকটা সময় নিয়েছিলেন। এ লেখা অনেক বছর ধরে লেখা হয়েছিল বলেই তাঁর মন, এ-বইয়ে, একমাত্র বা একই আবেগময় কোনোরকম সুখের বা দুঃখের মেজাজে একনিষ্ঠ থাকা উচিত ছিল বলা ঠিক নয়। তাঁর শব্দের ইশারা, শব্দবন্ধের মৌলিকতা,—তাঁর অনুষঙ্গ-বিলাস এবং সব-চেয়ে বেশি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাটিই তাঁর শক্তির পরিচায়ক। তবে, উপন্যাসে অবচেতন-লোকের অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসী যাঁরা, ফরাসী-সাহিত্যে প্রুস্ৎ সেই দলের অগ্রণী ছিলেন বলেই সজ্ঞানে প্লটের ভাবনা ভাবা তাঁর ধাতে সয়নি।

'প্লট' বিষয়ে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে যে মন্তব্যটি পাওয়া গেছে, সে কিন্তু একেবারে আলাদা ব্যাপার। শরৎচন্দ্র মোটেই অবচেতন-লোকের উদ্‌ঘাটন ঘটাতে চাননি।

প্রুস্ৎ-এর বই বেরিয়েছিল ১৯১৩ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অবচেতন-লোকের ধারা-বিবরণী রচনার ঝোঁক হয়তো সেই সূত্রেই ইংলণ্ডে-আয়ার্লাণ্ডে পৌঁছে থাকবে। জেম্‌স্ জয়েসের 'ইউলিসিস' প্রকাশিত হয় উনিশ শ বাইশ সালে। জয়েসের কথা এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ডাবলিনের ঘর-বাড়ি, পথ, দোকান, আপিস, ইস্কুল, হাসপাতাল, পতিতালয় ইত্যাদি কতো কী যে ভিড় করে দেখা দিয়েছিল তাঁর সে বইখানির মধ্যে! উনিশ শ চার সালের ষোলই জুন। সেই একটিমাত্র দিনের কাহিনী তাঁর 'ইউলিসিস'!

'ইউলিসিস্,-এর গল্পটা মোটামুটি এই: বাক্ মুলিগান নামে চিকিৎসাবিদ্যার এক ছাত্র সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ওপরে উঠে, দাড়ি কামাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল সে। একটু পরেই স্টিফেন ডিডেলাস নামে এক আইরিশ যুবা সেই সিঁড়িতে দেখা দিলেন। ডিডেলাস নিজে লেখক এবং শিক্ষক। মুলিগানের মুখে রোদে-উজ্জ্বল সমুদ্রের প্রশংসা শুনে ডিডেলাসের মনে পড়লো তাঁর মায়ের মৃত্যুশয্যার ছবি। বছরখানেক আগে, প্যারি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ একদিন

মায়ের সেই শেষ অসুখের অবস্থাটি দেখতে যেতে হয়েছিল ডিডেলাসকে। মা তাঁকে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। তিনি কিন্তু কিছুতেই সে মিনতি রাখতে পারেননি! অতঃপর এই ভাবেই,—সেই ষোলই জুন তারিখের এক একটি তুচ্ছ, ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে করতে ভূরি ভূরি স্মৃতিচিত্রের ভিড়ের মধ্য দিয়ে জেম্‌স্‌ জয়েস ডাবলিনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র প্লটের ভাবনা ভাবতেন না বলেছেন বটে, কিন্তু সে কখনোই প্রুস্‌ৎ বা জয়েসের মতন নয়। তিনি বরং প্রয়াসহীন স্বতঃস্ফূর্ততার উদাহরণ। যেমন প্লটের ব্যাপারে, তেমনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও—খুবই সহজ হতে পেরেছিলেন তিনি। দু'একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁর এই সহজ সাধনার প্রকৃতি বুঝে দেখা যেতে পারে।

তেরশ' কুড়ি সালের কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত,—এবং তারপর, ১৩২১ সালে,—'যমুনা' পত্রিকাতে তাঁর 'চরিত্রহীন' প্রথমে অংশতঃ ছাপা হয়। ১৩২৪ সালের কার্তিকে, অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম দিকে, বইয়ের আকারে সে লেখা প্রথম ছাপা হয়। তাঁর সেই 'চরিত্রহীন' বইখানির প্রথম অনুচ্ছেদটি এই রকম:

> 'পশ্চিমের একটা বড় সহরে এই সময়টায় শীত পড়ি পড়ি করিতেছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের এক চেলা একটা সৎকর্মের সাহায্যকল্পে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই সহরে আসিয়া পড়িয়াছেন! তাঁহারই বক্তৃতা-সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপদ-মর্যাদানুসারে যাহা কর্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই প্রস্তাব লইয়া একদিন সকালবেলার কলেজের ছাত্রের দল উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িল।'

উপন্যাসের শিল্পরূপের আলোচনায় লেখকদের সূচনা-রীতি তুলনামূলক ভাবে একটু খুঁটিয়ে দেখতে আপত্তি নেই। 'চরিত্রহীনে'র পরে শরৎচন্দ্রের আরো অনেক বই লেখা হয়েছে। তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' প্রায় চোদ্দ বছর পরের বই। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ থেকে ১৩৩৮ সালের বৈশাখের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে—এবং মাঝে মাঝে, দু'এক সংখ্যা বাদ দিয়ে দিয়ে সে লেখা প্রথমে ছাপা হয়। অতঃপর ১৩৩৮ সালের বৈশাখে,—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা

যে পরিমার্জিত ও 'বিশেষভাবে প্রথমাংশে পরিবর্তিত' 'শেষ প্রশ্ন' বই হয়ে বেরোয়। 'শেষ প্রশ্নের' প্রথম অনুচ্ছেদটি 'চরিত্রহীন'-এর প্রথম অনুচ্ছেদের তুলনায় আয়তনে কিছু বড়ো। তারও প্রথম কয়েক লাইন তুলে দেওয়া গেল :

> 'বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালী পরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা সহরে বসবাস করিতেছিলেন। কেহ বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়াহুড়া ছাড়া ইহাদের অতিশয় নির্বিঘ্ন জীবন। বাদশাহী আমলের কেল্লা ও ইমারৎ দেখা ইহাদের শেষ হইয়াছে, আমীর-ওমরাহগণের ছোট বড়, মাঝারি ও আ-ভাঙা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে; এমন যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, তাহাতেও নূতনত্ব আর কিছু নাই।'

আগ্রা সহরে ভ্রমণক্লান্ত এই বাঙালীদের এই শ্রান্তির পরিচয়ই 'শেষ প্রশ্নের' প্রথম অনুচ্ছেদের প্রধান বক্তব্য। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'প্রৌঢ়-বয়সী ভদ্র বাঙালী সাহেব' আশুতোষ গুপ্ত এবং তাঁর কন্যা মনোরমা এসে দেখা দিয়েছেন। তৃতীয় অনুচ্ছেদে এই পিতা-পুত্রীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা শেষ করেই, চতুর্থে শরৎচন্দ্র কলেজের প্রফেসার অবিনাশ মুখুজ্যেকে এনেছেন। অতঃপর গল্পের ধারা অবাধে এগিয়ে গেছে।

বইয়ের আকারে 'পল্লীসমাজ'এর আবির্ভাব ঘটে 'চরিত্রহীন'-এর আগের বছর—১৫ই জানুয়ারি, ১৯১৬। ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'পল্লীসমাজ' প্রথম বেরুতে থাকে। তাঁর এই বইখানিরও আরম্ভটা খুবই সাদাসিধে রকম। যেমন :

> 'বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই যে মাসি, রমা কই গা ?
>
> 'মাসি আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা হলে রমা, কি করবে স্থির করলে ?'

এই সব দৃষ্টান্তের সর্বত্রই তাঁর প্রয়াসহীন সহজ রীতির বিশেষত্ব দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সূত্রে একটু তুলনা চলতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গোরা' প্রথমে বেরিয়েছিল 'প্রবাসী'তে। ১৩১৪ থেকে ধারাবাহিক ভাবে

'প্রবাসী'তে ছাপা হবার পরে ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে 'গোরা' বই হয়ে বেরোয়। শরৎচন্দ্রের যে নমুনাগুলি ওপরে দেওয়া গেল, 'গোরা'র সূচনাটা নিঃসন্দেহে সেই একই ধারার অন্তর্ভুক্ত। তার প্রথম অনুচ্ছেদটি এই :

'শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার বিরাম নাই ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কলেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড়ো এই যে কাজের শহর কঠিন-হৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।'

এই কলকাতা-বর্ণনার ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই বিনয়ভূষণকে আবির্ভূত হতে দেখা গিয়েছিল। বিনয়ভূষণ তার বাসার দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক-চলাচল দেখছিল। কাছের এক দোকানের সামনে আলখাল্লা-পরা এক বাউল গান শুরু করেছিল। সেই গান শুনতে শুনতে বিনয়ের চোখে পড়েছিল একটা দুর্ঘটনার দৃশ্য—'একটা ঠিকাগাড়ির উপরে একটা মস্ত ড়িগাড়ি আসিয়া পড়িল!' সেই দুর্ঘটনা-ব্যাহত ঠিকা গাড়িতেই যাচ্ছিলেন পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আর তাঁর মেয়ে। অতঃপর আখ্যানপ্রবাহ এগিয়ে যেতে বাধা কিসের?

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের দু-একখানি উপন্যাসকল্প রচনায় এই সাদাসিধে, সহজ ভঙ্গির হয়তো কিছু বদল হয়েছিল। কিন্তু গল্প-উপন্যাসের সূচনা-প্রকৃতিতে সাধারণতঃ তিনিও ছিলেন অনায়াস বর্ণনারই পক্ষপাতী। তবে, রবীন্দ্রনাথে, শরৎচন্দ্রে অথবা তাঁদের সমকালীন বা পরবর্তী সমস্ত ঔপন্যাসিকের মধ্যেই এই স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনায় কিছু-না-কিছু পরিমাণে নাট্যরস দেখা দিয়েছে। 'পল্লীসমাজ' বইখানির আদিতেই যেমন বেণী ঘোষালকে মুখুজ্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিতে দেখা গেছে,—'গোরা'তে যেমন কোনো-এক সকালের কলকাতায় বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে,—১৩৫০ এর বৈশাখে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

বনফুলের 'জঙ্গম'-প্রথম পর্বে তেমনি স্থান-কাল-চরিত্র বর্ণনার মধ্যেই নাটকোচিত দৃশ্যধর্ম অটুট রেখে বলা হয়েছিল :

'শঙ্কর তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডে অসম্ভব রকম ভিড়। সেই ভিড় ঠেলিয়া শঙ্কর হাওড়া স্টেশনে চলিয়াছে। দ্রুতবেগেই চলিয়াছে। পাশের দোকানে একটা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তাহার গতি-বেগকে আরও একটু বাড়াইয়া দিল। ট্রেনের বেশি সময় নাই। হস্টেলের ঘড়িটা নিশ্চয় শ্লো ছিল। ফুলের তোড়াটা ভাল করিয়া কাগজ দিয়া ঢাকিয়া আবার সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চারিদিকে যা ভিড়—ধাক্কা লাগিয়া তোড়াটা নষ্ট হইয়া না যায়!'

সেই বছরের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' থেকেও প্রথম অনুচ্ছেদটি তুলে দেখা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ এইভাবে তাঁর এ-বই আরম্ভ করেছিলেন :

'ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গর-সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদ্রি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলে কোন লোকই রাখে না।'

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' প্রথম বই হয়ে বেরোয় 'ইছামতী'র বছর তিনেক আগে—তেরশ সাতচল্লিশের ভাদ্র মাসে। 'ইছামতী'ও নদীর নাম, 'কালিন্দী'ও আর এক নদী! অন্ততঃ বিষয়-নির্বাচনের দিক থেকে দুজন সমসাময়িক লেখকের এ-সাদৃশ্যটুকু চোখে পড়বার মতন। উপন্যাস শুরু করতে গিয়ে তারাশঙ্কর যে-ভাবে তাঁর নদীর পরিচয় দিয়েছিলেন, বিভূতিভূষণও তাঁর স্বক্ষেত্রে কতকটা সেই রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। 'ইছামতী'র নমুনা দেখা গেছে। এবার 'কালিন্দী'র পরিচয় :

'নদীর ও-পারে একটা চর দেখা দিয়াছে।

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রহ্মাণী নদী—ব্রহ্মাণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ও-পারে

চর জাগিয়াছে! এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পুর্বে ওখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি, এখন কালী রায় হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।'

অতঃপর পরের অনুচ্ছেদেই তারাশঙ্কর সেই চর-সংক্রান্ত বিবাদের কথায় এগিয়েছেন। জমিদার রায়েদের মধ্যে প্রধানতঃ তুটি পক্ষে বিবাদ—একদিকে কূট-কৌশলী ইন্দ্র রায়, অন্যদিকে রায়েদের দৌহিত্রবংশের দাম্ভিক রামেশ্বর চক্রবর্তী। গল্পের সংসার ক্রমে বেড়ে গেছে অতঃপর! তারাশঙ্কর তাঁর অভ্যস্ত রীতিতেই এগিয়ে গেছেন।

বাংলা উপন্যাসের এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে 'প্লট'-এর সম্বন্ধে লেখকদের উপেক্ষার ভাব কোথাও নেই। আর, উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে আঙ্গিকের তারতম্য অন্যত্র যে-ভাবেই ঘটুক না কেন, অন্ততঃ সুচনার রীতি সব ক্ষেত্রে একই ভাবে দেখা দিয়েছে। সংক্ষেপে এ-বিষয়ে কোনো সাধারণ-সূত্র দিতে হলে বলা যেতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি বা স্থান সম্বন্ধে প্রয়াসহীন, সরল, সুবোধ্য একটু বর্ণনা—এবং তারই মধ্যে কিঞ্চিৎ নাটকীয় দৃশ্যধর্মের সঞ্চার—এই হোলো বাংলা উপন্যাসের সাধারণ সুচনা-প্রকৃতি। কালিন্দী, ইছামতী, পদ্মা, গঙ্গা,—এমন কি দূরের ইরাবতীও আমাদের ঔপন্যাসিকদের মনোহরণ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রথম কয় লাইনে বর্ষার মাঝামাঝি সময়ের পদ্মানদীতে মাছ ধরবার মরশুম যে কী রকম উত্তেজনার ব্যাপার হয়ে ওঠে, সেই বর্ণনার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল। তারপরেই ছোটো একটি তৃতীয় অনুচ্ছেদে কুবের মাঝির আবির্ভাব:

'কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও তুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।'

তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সুচনা বরং আর একটু নাটকীয়। পর পর ছোটো ছোটো তিনটি অনুচ্ছেদে সেখানে তিনি বজ্রাহত হারু ঘোষের মূর্তিটি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছিলেন:

'খালের ধারে প্রকাণ্ড বট গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানেই তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

হারুর মাথার কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মুক অবচেতনার সঙ্গে একান্নো বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। তার পর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।'

উপন্যাসের শিল্পরূপের আলোচনায় কেবল সূচনারীতির বিশেষত্ব খুঁটিয়ে দেখাটাই কিন্তু একমাত্র কাজ নয়। কথকতার বেগ, অধ্যায়-বিভাগের রীতি, সংলাপ ব্যবহারের কায়দা, ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে চরিত্রে অন্বিত করবার কৌশল, নানা চরিত্রকে কেন্দ্রীয় যোগে যুক্ত রাখবার বিদ্যা ইত্যাদি নানা দিকে নজর রাখা দরকার। 'প্লট'-কে যাঁরা প্রাধান্য দেন, তাঁদের কলমে এ শিল্প একভাবে দেখা দেয়,—আর 'প্লট'-কে যাঁরা প্রাধান্য দেন না, তাঁদের হাতে অন্যভাবে। শরৎচন্দ্র 'প্লট'-এর ভাবনা উপেক্ষা করেছিলেন মনে করা ঠিক নয়। তিনি 'প্লট'-এর অতিভাবনাই কেবল বাদ দিতে চেয়েছিলেন। সেটা কেবল তাঁর একলার কথা নয়। সব সার্থক ঔপন্যাসিকেরই সেই এক কথা। মগ্নচেতনার রাজ্যে বা অবচেতন-লোকে যাঁদের আগ্রহ, তাঁদের কথা অবিশ্যি আলাদা। বাংলা উপন্যাসে সে পরীক্ষাও হয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে, বাঙালী পাঠকের মনে তার তেমন আদর হয়নি। মনস্তত্ত্বপ্রধান বা মনোবিকলনী বাংলা ঔপন্যাসের কথা এ আলোচনায় যথা সময়ে ভাবা যাবে। এখন সে কথা থাক।

: কাহিনী কথকতা : উপন্যাসে বিভিন্ন সাহিত্য-রীতির মিশ্রণ :

উপন্যাসের নির্ভরযোগ্য কোনো সংজ্ঞা দিতে হলে, এবং তা সুবোধ্য করতে হলে, বলবার কথাটা সংক্ষেপে প্রকাশ করা সত্যিই দুঃসাধ্য। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের মন্থরতা এবং গল্পের ক্ষেত্রে তাঁরই সংহতি বা সংযমের কথা ভাবতে গিয়ে এই বহুশ্রুত ব্যাপারটিই আর একবার মনে এলো। তেরশ'

ছেচল্লিশ সালের আশ্বিন মাসে তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' প্রথম গ্রন্থাকারে দেখা দেয়। সে বইয়ের প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হয় তিনি যেন কেবল মাত্র স্থান-বর্ণনাতেই মন দিয়েছিলেন। তারপর, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই অবিশ্যি লাঘাটা বন্দরের বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির সাত-আনির মালিক কৃষ্ণদাস বাবুর শখের 'দেবীবাগ' বাগানের কথা এসে পড়েছে। এবং তারপর তৃতীয় অনুচ্ছেদে স্বর্গত কৃষ্ণদাস বাবুর বালকপুত্র শিবনাথকেও দেখা গেছে। ছাপা-বইখানির প্রথম পৃষ্ঠার শেষে এই তৃতীয় অনুচ্ছেদের সূত্রপাত। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি অধ্যায়ের ধারা ধরে এগিয়ে গেলে, পর পর দ্বিতীয়-তৃতীয় পৃষ্ঠাক্রম পেরিয়ে, নবম পৃষ্ঠা পর্যন্ত সেই শিবনাথ বালকটির বাল্যক্রীড়ারই বিশদ বর্ণনা দেখা যায়। সেই বর্ণনা-সূত্রেই শিবনাথের রক্ষক ভৃত্য শম্ভুর কথা বলা হয়েছে। নেকড়ের বাচ্ছা ধরবার জন্যে বালক-শিবনাথের ব্যগ্রতার কথা বেশ বিস্তৃত ভাবেই এসেছে,—ওপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তার মারামারি-প্রসঙ্গও বিশদভাবে বলা হয়েছে। এবং নবম পৃষ্ঠার শেষে বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের যেখানে শেষ হয়েছে, তারই কাছাকাছি এক জায়গায় দেখা গেছে যে, প্রতিবেশীদের ওপর দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে তার মা যখন তাকে শাসন করবার প্রয়োজন বোধ করেছেন, শিবনাথের 'অভয়দাত্রী' পিসিমা তখন বলেছেন :

'বেশ করেছে। ওদের বাপেরা চিরকাল আমাদের হিংসে করে এসেছে, এখনও অপমান করবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। এখন থেকেই আবার ছেলেদের আক্রোশ দেখনা!'

পিসিমার সেই কথা শুনে—

'মা হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, না না ঠাকুরঝি দেশে ঘরে ঝগড়া করা কি ভাল? তাহলে জানোয়ারে আর মানুষে তফাত কি?'

ঠিক এই কথার পরেই তারাশঙ্কর নিজে মধ্যবর্তী হয়ে তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ দুটি লাইন যোগ করেছেন :

'শিবনাথ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল নেকড়েগুলোর কলহের কথা। এক-এক সময়ে মাকে তাহার এত ভাল লাগে।'

উপন্যাসের পরিণতির পর্বে পর্বে,—জগতের উপন্যাস-প্রকারের বিবর্তনের স্তরে, স্তরে, তাতে ইতিহাস, স্মৃতিকথা, পত্ররীতি, ভ্রমণকথা, স্থানবর্ণনা,

নাট্যসংলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গল্প-রীতি এসে যোগ দিয়েছে। ফলে, সংক্ষেপ এবং শিথিলতা,—দ্রুত গতি এবং মন্থরতা, দুই-ই এতে মিশে আছে। প্রথমে স্থান বর্ণনা, তারপর বালক শিবনাথের ছেলে-খেলার দীর্ঘ বর্ণনা,—তারই মধ্যে কিঞ্চিৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে শম্ভু-শিবনাথের কিছু কিছু সংলাপ পরিবেষণের আয়োজন—এ-সব ব্যাপারে যতোই মন্থরতা ঘটে থাক, তবু তারাশঙ্কর তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র প্রথম পরিচ্ছেদে,—এই ন' পৃষ্ঠার মধ্যে সত্যিই অবান্তর কিছু বলেননি। তাঁর দ্রুততার কথা ভাবতে বসে উপন্যাসের ক্ষেত্র থেকে আবার গল্পের ক্ষেত্রে মন সরে যেতে চায়। একটি বিশেষ নমুনা মনে পড়ে। তেরশ' তিপ্পান্নোর 'সেরা গল্প' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৫) সম্পাদনা করেছিলেন নবেন্দু ঘোষ। সেই বইখানিতে মোট তেরটি গল্প ছাপা হয়। তারাশঙ্করের 'কামধেনু' সেই লেখাগুলির মধ্যেই জায়গা পেয়েছিল। সেই 'কামধেনু' গল্পটিতে 'নাথু' নামে এক ফাঁসীর আসামীর অপরাধের ইতিহাস দিয়েছেন তিনি। নাথু ছিল বিশেষ জাতের একটি গোরুর মালিক। সেই গোরুটিই নাথুর প্রাণ ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে একটি মায়াবিনী মেয়ের লোভে পড়ে তার সে 'কামধেনু'ও গেল, মেয়েটিকেও সে খুন করে বসলো! সে গল্পের শুরুতে দেখা যায় 'সেলে'র মধ্যে বন্দী নাথুর উদ্বেগ। কিন্তু নিজের আসন্ন প্রাণান্ত-সম্ভাবনা সম্বন্ধে যন্ত্রণার কথা ভাবছে না সে। সে ভাবছে তার গলার ফাঁসটার কথা—যে ফাঁস তাকে ইহজগৎ থেকে অন্য জগতে নিক্ষেপ করবে! ফাঁস লাগাবার সেই দড়িটা কি গোরুর অন্ত্রে তৈরী? ওয়ার্ডারকে সেই কথাই জিগেস করেছিল নাথু। সেই নাট্য-দৃশ্য থেকে বর্ণনীয় প্রসঙ্গে পাঠকের মনকে এগিয়ে দেওয়া কি সংক্ষেপে সম্ভব? তারাশঙ্কর সে কাজ যে কতো সংক্ষেপে করেছিলেন, সেই বিস্ময়কর কৌশলের নমুনা তোলবার জন্যেই মূল গল্প থেকে এইবার সেই কৌশলের অংশটুকু উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> 'ফাঁসীর দাড়িতে ঝুলে পাটাতনের নিচে অন্ধকার গর্তের মধ্যে শরীরের সকল স্নায়বিক অক্ষেপ শেষ হয়ে গেলে নাথুর দেহ স্থির হয়ে যাবে, চোখে দৃষ্টি থাকবে না, আরও বিকৃতি হবে অনেক; সে দৃশ্য চোখে না দেখাই ভালো। কিন্তু এই মুহূর্তে মন-হীন অথচ জীবন্ত নাথুর চেহারা দেখে শিল্পীর লোভ হবে ছবি আঁকতে, যোগপন্থী সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে ভাববে—খুনী লোকটা পেলে

কোন্ পুণ্যে এই বস্তু! নাথুর দেহ থেকে মন বেরিয়ে চলে গিয়েছে। বাইরের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে মনোলোকের গভীর অন্ধকার অবচেতনে প্রবেশ করেছে—একথা বললে তর্ক তুলব না, কিন্তু সবিনয়ে বলবো—আমার বিশ্বাস সেলের মধ্যে আবদ্ধ নাথুর মন ইঁট কাঠ লোহার স্থূল, কঠিন নিশ্ছিদ্র অবস্থানকে অতিক্রম করে লাল মাটির পাকা শড়ক ধরে চলে যাচ্ছে—এ আমি দেখতে পাচ্ছি।'

পাঠকদের মধ্যে যাঁরা যথার্থ সমালোচক-পাঠক, তাঁরা কখনোই এইসব দক্ষতার দিকে চোখ বুজে থাকতে পারেন না! সাধারণ পাঠক হয়তো বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের দিকটাতেই বেশি আগ্রহী। সাধারণ ঔপন্যাসিক যাঁরা, তাঁরাও বোধ হয়, সেই কারণেই প্রধানতঃ বিষয়ের ওপরেই জোর দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভূয়োদর্শী লেখক জানেন যে, উপন্যাসে স্থানবর্ণনা, নাট্যসংলাপ, পত্ররীতি, স্মৃতিকথা-ভঙ্গি ইত্যাদি যাবতীয় গল্পকৌশলের জায়গা আছে! এবং শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, যেখানে যা দরকার, সেখানে তাই ব্যবহার করতে হয়। তারাশঙ্কর সে-আবশ্যিকতা উপেক্ষা করেন নি। তবে সব জায়গায় সমান সফল হননি তিনি। কিন্তু সর্বত্র সমান সাফল্যের দাবি জগতে ক'জন ঔপন্যাসিকই বা করতে পারেন?

: উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে তারাশঙ্করের বিশ্বাস :

উপন্যাসের সমালোচনা-সূত্রে যে-সব শ্রেণী-বিভাগের কথা বলা হয়, এইবার সেগুলির কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তত্ত্বপ্রধান —বাংলায় এই তিনটি শ্রেণীর কথাই বেশি বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে Sociological, historical, bourgeois, psychological, local colour, crime, sentimental ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত বিভিন্ন উপন্যাস-শ্রেণীর উল্লেখ বিরল নয়। সম্প্রতি 'আধুনিক ভারতে উপন্যাসের ধারা' নামে একটি প্রবন্ধে তারাশঙ্কর লিখেছেন: 'কোন দুঃসাহসী সমালোচকও আধুনিক উপন্যাসে স্রষ্টার রূপকৌশল, জীবন-জিজ্ঞাসা, মানসিক গঠনভঙ্গি বা বিশেষ সামাজিক প্রবণতাকে কোন আইনের মাপকাঠিতে সীমাবদ্ধ করতে পারেন না। উপরন্তু ঔপন্যাসিক তাঁর সাহিত্যে সমগ্র জীবন কিংবা তার খণ্ডিতাংশকে রূপ দেবেন সে বিষয়ে তাঁর উপর কোন জুলুম চলতে পারে না।' তিনি রবীন্দ্রনাথের

'গোরা'কেই পূর্ব ও পশ্চিমের 'উভয় সভ্যতার সমন্বয়ের' প্রথম 'পরিণত ফসল' বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি এ-কথাও স্বীকার করেছেন যে মূল বিষয় হিসাবে দেশপ্রেম এবং রাজনীতি আমাদের উপন্যাসে পূর্বেই স্থানলাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। 'কিন্তু পূর্বতন উপন্যাসে জীবনকে প্রায় ইতিহাস বা অর্ধ-ইতিহাসের মতোই বিবৃত করা হোতো আর নাটকের চরিত্রগুলি প্রায়শঃই শাদা কালোর ছকে' ধরা হোতো। বাংলায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উড়িষ্যায় ফকিরমোহন সেনাপতি যদিও নিজেদের মধ্যবিত্ত জীবনস্তর থেকে নিম্নবর্তী কৃষক-শ্রমিক সমাজের দিকে দৃষ্টিক্ষেপের প্রয়াসী ছিলেন, সে-যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা কিন্তু 'উচ্চশ্রেণীর জীবনের প্রতিই বিশেষ আসক্তি' দেখিয়েছিলেন! এইসব মন্তব্য এবং শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যেই তিনি আধুনিক উপন্যাসে 'হার্ম স্বরগত ঐক্য থেকে 'সিম্ফনি' বা নানা স্বরের সমন্বয়-সাধনের অভিপ্রায়ের কথা বলে নিয়ে কৃষক-শ্রমিক সম্বন্ধে আমাদের অনতিপূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের অনভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এবং সেই সূত্রে 'অন্ততঃ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে' শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ও হৃদয়বোধের সমৃদ্ধির কথা স্বীকার করতেও দ্বিধা করেননি তিনি। তারপর নিজেদের যুগের কথায় পৌঁছে তাঁকে বলতে হয়েছে:

> 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-সমূহের ফলরূপ আমাদের জীবন ও সামাজিক অবস্থা যে কী রূপ পরিগ্রহ করবে কিংবা সোশ্যালিজমের ধীর অগ্রগতি আমাদের মধ্যে যে কী পরিবর্তন আনবে, সে বিষয়ে এখনও কিছুই বলা যায় না। যা কিছুই হোক না কেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে আমরা এক জাতীয়তা নিয়ে প্রসারিত হচ্ছি ও অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও আবিষ্কারের নতুন নতুন দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে। বৈচিত্র্য বেড়ে চলেছে। একজন সক্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে আমি জীবনে এই বৈপ্লবিক ব্যাপ্তিতে উৎসাহিত বোধ করছি।......আধুনিক উপন্যাস ক্রমেই সমাজ ও জীবনের অজ্ঞাত ও অবহেলিত বিচিত্র স্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং নতুন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনছে।'

অতঃপর উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশ্বাসের কথাও তিনি জানিয়েছেন:

"একথা অভ্রান্ত যে সাহিত্যে—বিশেষ করে উপন্যাসে জীবনের যথার্থ প্রতিফলনই মূর্ত হয়ে ওঠে।...তবে একথাও সত্য যে সাহিত্যিক অবসাদগ্রস্ত সমাজকে শুধুমাত্র আনন্দই দেবে না—জীবনকে সমৃদ্ধ করবার প্রচেষ্টাও তার থাকা চাই।...আমরা অতীতে মানব-সভ্যতার অগ্রগতি ও রক্ষাকল্পে যে ভূমিকা নিয়েছি বর্তমান কালে তাকে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।...বর্তমান ভারতবর্ষের আত্মবিস্মৃত সমস্ত পণ্ডিতদের তাই আজ আত্মসমীক্ষণের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং মনে হয় শেষ পর্যন্ত তারা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।...কোন বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের প্রতি জেহাদ ঘোষণা সামগ্রিক দৃষ্টিভংগির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।'[২০]

এ-কালের বাংলা উপন্যাসের শিল্প-রীতি বা কলাকৌশলের বিষয়ে কথা উঠলে একালের ঔপন্যাসিকের দৃক্‌কোণ বা জীবনবোধের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই ভেবে দেখতে হয়। তারাশঙ্করের এই প্রবন্ধটি সেই কারণেই স্মরণ করা গেল।

ঃ'কল্লোল' 'কালিকলম' পর্বের্ব আবহাওয়াঃ

বাংলা উপন্যাসের যে বিশেষ পর্বে তাঁর অভ্যুদয়, সাহিত্যের দিক থেকে তখনকার বিশেষ আবহাওয়াটা এই সূত্রে পুনরায় ভেবে দেখা দরকার। জীবনে যা ঘটে, ঔপন্যাসিক তাঁর আপন কালে, নিজের সাধ্য অনুসারে তারই এক রকম সমালোচনা করে যান। মধ্যযুগে য়ুরোপের সামন্ত-শাসনকালে বীরত্বের যে আদর্শ চালু ছিল, সতেরোর শতকে সারভান্টিস এসে তাঁর সাধ্যানুসারে তারই সমালোচনা লিখেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'ডন কুইক্‌সট' বইখানিতে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহুশ্রুত 'বাস্তবতা' ব্যাপারটা তো কেবলই পুনরায়োজন! বিষয়বস্তুর দিক থেকেও পুনরায়োজন, প্রকাশ-রীতির দিক থেকেও পুনরায়োজন! সাহিত্যে এই পুনরায়োজনের ধারা অন্তহীন। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক লেখকের মধ্যেই এই পুনরায়োজন এবং পুনর্যোজনার প্রয়াস দেখা দেয়। যুগের আবহাওয়া থেকেই উপন্যাসের আখ্যান-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত

২০। 'আধুনিক ভারতে উপন্যাসের ধারা'—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 'স্মারক' ত্রৈমাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা শারদীয়া ১৩৬৭।

হয়। আখ্যান-প্রকৃতি বা প্লটই আবার উপন্যাসে চরিত্র-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেই তত্ত্বটি সমুচিত ভাবে উপলব্ধি করবার জন্যে, অন্যান্য চেষ্টার মধ্যে সে-কালের—অর্থাৎ সেই উনিশ শ' পঁচিশ-তিরিশ থেকে উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের অনুরাগী, বিচক্ষণ এবং সে-সমাজের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতার দাবি করতে পারেন, এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছিলুম। এক দিন নয়, পর-পর,—বেশ ক'দিন ধরেই তাঁর সঙ্গে সে-আমলের বাংলা গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে আলাপ হয়েছিল। তিনি এখন প্রবীণ হয়েছেন, কিন্তু সাহিত্য ছাড়েন নি। নামধাম প্রয়োজনমতো গোপন রেখে তাঁর কোনো কোনো কথা এখানে ব্যবহার করবার অনুমতি পেয়েই তাঁর কথা গ্রন্থস্থ করা গেল। তিনি বললেন:

'তারাশঙ্করের লেখা আমি প্রথম পড়েছিলুম 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'কালিকলম' তখন চলছে। বাংলা সাহিত্যের আসরে নতুন ক্ষমতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার নজর ছিল তীক্ষ্ণ। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 'জাপান' 'চিত্রবহা' ইত্যাদি বইয়ের লেখক। তিনি অনামী ভাবে 'কল্লোল' পত্রিকার সমালোচনা করেছিলেন 'কালি-কলম'-এর মাসিক সাহিত্য-সমালোচনায়। তাতে তারাশঙ্করের 'কল্লোল-এ প্রকাশিত লেখার প্রশংসা ছিল। তারাশঙ্কর সে-কথা 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলে গেছেন। 'কল্লোল'-এর এই লেখার আগে তিনি ছিলেন অন্য পথের পথিক। লাভপুর-এর যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর আত্মীয়—তাঁর স্ত্রীর মাতুল। তাঁরই সান্নিধ্যে থেকে, সাহিত্য চর্চার দিকে আগ্রহ জেগেছিল তারাশঙ্করের।

'তারাশঙ্কর সে সময়ে একবার সিউড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে 'কালি-কলম' এর ছেঁড়া পৃষ্ঠায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনা ঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দের 'জোহান-এর বিহা' গল্প দুটি তাঁর চোখে পড়েছিল বলে শুনেছি। যতদূর মনে পড়ে, 'কল্লোল' আপিসে তিনি একদিন মাত্র গিয়েছিলেন। তিনি 'কল্লোল'-এর সেকালের আদর্শ কতোটা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সেটা ভাববার কথা।

'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। তারপর 'কালি কলম'-এর জন্যে তাঁর লেখা চেয়ে পাঠানো হয়। তাঁকে 'কালি-কলম' এর পুরো সেট উপহার দেওয়া হয়েছিল। 'কালি-কলম' সম্বন্ধে তাঁর সে সময়ে

বেশ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে তাঁর চিঠিতে 'কালি-কলম' সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধার কথা জানিয়েছিলেন।

'কল্লোল'-এর শেষ বছরে অচিন্ত্যকুমার পত্রিকা পরিচালনার ভার নিলে তারাশঙ্করের একটি লেখা 'কল্লোল'-এ ছাপা হয়।

'১৩৩৫-এর আশ্বিনে তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণের গল্প 'কালি-কলম'-এ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'কালি-কলম' ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৫ পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে এবং ১৩৩৬ এর চার সংখ্যা ছোটো আকারে প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' নিয়মিত ভাবে বেরিয়েছিল ১৩৩০ থেকে ৩৫-এর শেষ পর্যন্ত। 'মণিবজ্র ভারতী' ছিল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

'কল্লোল', 'কালি-কলম' পর্বের পরে তারাশঙ্কর যোগ দিয়েছিলেন 'উপাসনা' পত্রিকায়। সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁকে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন। 'শ্মশানের পথে' গল্পটি 'কালি-কলম' পত্রিকাতেই প্রথম বেরিয়েছিল। সেই গল্পটি বিশদ করেই তিনি 'চৈতালী ঘূর্ণী উপন্যাস লিখেছিলেন। একথা তিনি তাঁর চিঠিতে লিখে গেছেন। সেই সূত্রে তাঁর সমালোচকের উত্তরে তাঁর নিজের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছিলেন যে ভাঙনের কথা নয়, গঠনের কথাই তিনি লিখতে চান। শৈলজানন্দের 'ধ্বংস পথের যাত্রী' ছিল ধ্বংসেরই ছবি,—সমাজের নিম্নস্তরে নেমে 'লেখকের মন তাতে নতুন কালের কথাসাহিত্যের তথাকথিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিল।'

তারপরে তিনি এলেন সজনীকান্ত দাসের এলাকায়। 'বঙ্গশ্রী' এবং 'শনিবারের চিঠি'র সংস্পর্শের সূত্রপাত তখন থেকেই। সেই পর্বে 'বঙ্গশ্রী' আপিষে একদিন লেখকদের একটি মজলিসের কথা মনে পড়ে। প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত ইত্যাদি অনেকেই ছিলেন। সজনীকান্ত বললেন, আসুন একটা গল্প লেখা যাক, প্রত্যেকে এক এক লাইন লিখবো। তারাশঙ্করকে সেই সভাতেও দেখেছি,—কেমন যেন স্বতন্ত্র, কেমন যেন দূরবর্তী!

আমি বললুম: 'তারাশঙ্করের লেখা সে-সময়ে আপনাদের কী রকম লাগতো বলুন।'

প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন: 'তারাশঙ্করের লেখাতে আমি দেখেছি আন্তরিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ,—কিন্তু সব নিয়ে, কেমন যেন রুক্ষ প্রকৃতি তাঁর

সেই লেখাতে! তাঁর ভাষাও যেন তাঁর পটভূমির মতোই রুক্ষ। অনেকেই সে সময়ে সে ভাষা পছন্দ করতেন না। অনেকেই তখন বিভূতিভূষণকেই বরং বেশি পছন্দ করতেন। আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তারাশঙ্করের লেখার মধ্যে একটা তীব্র বা প্রগাঢ় আবেগের স্বাদ আছে। তাঁর লেখার মধ্যে প্রথম সাহিত্য পাঠের আনন্দ পেয়েছিলুম 'কবি' বইখানিতেই। তাঁর ছোটো-গল্প অবিশ্যি তার অনেক আগে থেকেই আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু বড় আয়তনের লেখার মধ্যে প্রথম 'কবি', তারপর 'আরোগ্য-নিকেতন', তারপর 'সপ্তপদী' এবং তারপর 'পঞ্চপুত্তলী' এবং 'বিচারক', এই কটি লেখাই বিশেষভাবে মনে পড়ে। তবে, 'কবি'র শেষটা আমার কাছে কতকটা আকস্মিক বা abrupt মনে হয়েছিল। 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর 'জীবন মশাই' চরিত্রটি আমার খুবই সজীব এবং সম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি বেড়েছে। সাহিত্যের সাধনা তাঁর ক্ষেত্রে সত্যিই সাধনা! কলকাতায় আসবার পরে প্রথম থেকেই তাঁর বাস ছিল বাগবাজার অঞ্চলে। ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছিলেন বরানগরবাসী। তারপর ১৯৪২-এ বাগবাজারে ফিরে ১৯৪৮ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। সেই আটচল্লিশ সালেই টালার নতুন বাড়িতে উঠে যান। সেদিন একজন আমাকে বললেন তারাশঙ্করকে তিনি পথের ধারে, বাগবাজারের এক বাড়ির সামনের রোয়াকে গভীর রাত্রে একলা বসে থাকতে দেখেছেন! কখনো কখনো ঐ ভাবে একা বসে বসে গভীর ভাবনায় মগ্ন থাকতে দেখা যেত তাঁকে—যেমন কলকাতায়, তেমনি বাইরেও। তিনি অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, তাঁর সাহিত্যে অভিজ্ঞতারই স্বাক্ষর।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে,—সুদূর অতীতের স্মৃতি থেকে বর্ত্তমানে ফিরে এসে তিনি বললেন: 'রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশ সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ প্রভৃতিকে 'শনিবারের চিঠি' যেভাবে সমালোচনা করেছে, আমার বিশ্বাস তারাশঙ্কর কখনোই সে রীতির সমর্থন করেন নি। আমার বিশ্বাস সজনীকান্ত এবং তারাশঙ্কর উভয়ে উভয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলেন সে সময়ে। 'শনিবারের চিঠি' কয়েক সংখ্যায় তারাশঙ্করের নাম ছাপা হয়েছিল সহকারী সম্পাদক হিসেবে। সে বোধ হয় পুলিশের নজর থেকে তারাশঙ্করকে রক্ষার ব্যবস্থা মাত্র।'

আর একদিন তিনি বললেন :

সেদিন আপনাকে ভুল বলেছি। লাভপুর থেকে তারাশঙ্কর প্রথম যখন কলকাতায় আসেন, তখন তিনি বাগবাজারে থাকতেন না। বাগবাজারে বাস করতেন আরো পরের আমলে। সে কথা যাক—এখন অন্য কথা শুনুন[২১]। 'কল্লোল'-এ মোহিতলালের দুটি কবিতা ছাপা হয়—একটি 'প্রেতপুরী' আর একটি শোপেনহাবার সম্পর্কিত। তখন পটুয়াটোলাতে 'কল্লোল'-এর আপিষ।

'শনিবারের চিঠি'-র শুরু থেকেই সে-দলের লক্ষ্য ছিল নজরুলকে আক্রমণ করা। মোহিতলালও তখন 'শনিবারের চিঠিতে' আসেন নি। তখন সজনীকান্ত, যোগানন্দ ইত্যাদি ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র বিধাতা! মোহিতলাল তখন নজরুলের অনুরাগী। মোহিতলাল নজরুলকে বড়ো-কবি করে তোলবার প্রয়াসী হয়ে তাঁকে ইংরেজি এবং সংস্কৃত কবিতা পড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নজরুল তাঁর অধ্যাপনা মেনে নিতে রাজী হননি! আর একটা কথা মনে পড়ে—'কালি-কলমে' মোহিতলালের প্রকাশিত লেখাগুলির একটি তালিকা বেরিয়েছে এ-কালের 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায়। সেটিও উৎসাহী পাঠকের কাজে লাগতে পারে। 'কালি-কলম'-এর শেষ দিকে প্রেমেন্দ্রের 'মাটির ঢেলা' এবং 'নীপুদা', অন্নদাশঙ্করের 'স্রষ্টা' ইত্যাদি রচনা লেখকদের নাম না করে মোহিতলালকে আমি শুনিয়েছিলুম। মনে আছে মোহিতলাল খুবই খুশি হয়েছিলেন। যতোদূর মনে পড়ে, 'উত্তরা'তে ১৩৩২ নাগাদ ('কালি-কলম' -এর আগে) 'তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র' নামে অধ্যাপক মহেন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।'

২১। লাভপুর থেকে প্রথম দিকে তারাশঙ্কর কলকাতায় এসে উঠতেন বালিগঞ্জে যতীন দাস রোডের এক বাড়িতে। তারপর মনোহর পুকুর রোডে এক খোলার ছাদওয়ালা বাড়িতে প্রায় বস্তি-অঞ্চলেও থেকেছেন। 'ধাত্রীদেবতা' রচনা শেষ করে 'কালিন্দী' শুরু করেছেন যখন, তখন হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) 'শান্তিভবন' নামে এক মেস-বড়িতে ছিলেন। সেখানে মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়ায় পিতা-পুত্রেও ছিলেন কিছুদিন। একথা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি। অতঃপর মাস তিনেক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের কাছে মোহনবাগান রো-তে ছিলেন। ১৯৪০-এ তিনি বাগবাজারে কাশীনাথ দত্ত রোডে উঠে যান। তারপর ১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাড়িতে বাস শুরু হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

আমি বললুম : মহেন্দ্র রায় সেকালে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন বটে। তেরশ' পঁয়ত্রিশে 'জীবন ও আধুনিক সাহিত্য' নামে একটি লেখার মধ্যে তিনি বলেছিলেন—'বর্তমান কালে মানুষ যেন জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় সন্দিহান হয়ে উঠেছে।'

তিনি বললেন : 'তেরশ' পঁয়ত্রিশের সেই সন্দিহান' অবস্থাটা মনে রাখা দরকার। তারাশঙ্কর সে সন্দেহের বোঝা বাড়াননি। তিনি বরং বিশ্বাস এনেছিলেন,—তারাশঙ্করের বিশ্বাসটা সত্যিই আন্তরিক ব্যাপার!'

এর পর আবার একদিন সেই সাহিত্যরসিক প্রবীণ পাঠকটির সঙ্গে দেখা হোলো। আগেকার কথার জের টেনে তিনি বললেন :

'বিচিত্রা' বের হয়েছিল ইতিমধ্যে (১৩৩৪)। রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গ' বের হবার পরে মোহিতলাল তারই বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ সমালোচনা নিয়ে এলেন। 'কালি-কলম'-এ সে লেখাও ছাপা হয় নি। 'কালি-কলম'-এর প্রকাশক ছিলেন শিশির নিয়োগী। তাঁকে ডেকে মোহিতবাবু বললেন : 'এ লেখা আপনারা ছাপতে পারবেন না, জানতুম। এ লেখা সজনীকান্ত দাসের। আমি চললুম 'শনিবারের চিঠি'তে যোগ দিতে।' এই বলে সত্যিই চলে গেলেন তিনি! তার পরেও তাঁর কয়েকটি লেখা 'কালি-কলম'-এর দপ্তরে জমা ছিল। সে-সব লেখা একে একে ছাপা হয়। আশ্চর্য যোগাযোগ—'কালিকলম'-এ তাঁর শেষ লেখাটির নাম ছিল 'বিদায়বাণী'!

'মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'তে যোগ দেবার পরেই সে পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়। মোহিতলালের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত আমরা কোনোদিনই মেনে নিতে পারি নি, যেমন,—তিনি বলতেন যে, 'সবুজপত্রে'র আগেকার লেখাতেই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা,—পরের লেখাতে তিনি নাকি স্বধর্মভ্রষ্ট! দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিতে বাঙালীর নাকি যথার্থ দক্ষতা ছিল না এবং বর্তমানেও নাকি তা নেই!

'কালিকলম' বের হবার আগে 'প্রবাসী'তে মণীন্দ্রলাল বসুরই বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। 'ভারতী' দলের প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তখন নামকরা লেখক। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তখন ভূরি পরিমাণে লেখেন। সে-সময়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ধার ভোঁতা হয়ে এসেছিল। 'কল্লোলে' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল। নরেন্দ্র দেবেরও একটি উপন্যাস

বেরিয়েছিল 'কল্লোলে'। 'কল্লোল'-এর তৃতীয় বর্ষ যেটা, সেই বছরটাই ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ। মণীশ ঘটকের 'কালনেমি' গল্পও সেই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল। সম্পাদক দীনেশরঞ্জনের সাহিত্যবোধ যে খুব উঁচু দরের ছিল, তা নয়। প্রেমেন্দ্রের প্রথম গল্প বের হয় 'প্রবাসী'তে—'শুধু কেরাণী' আর 'গোপন চারিণী'। 'কল্লোল'-এ সে গল্পের প্রশংসা বেরিয়েছিল। সংহতি'তে (১৩৩১ এর আষাঢ় সংখ্যায়) প্রেমেন্দ্রের 'দেবতার জন্ম হোলো' বের হয়। তারপর একে-একে :তাঁর আরো কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়। তাঁর একখানি একাঙ্ক 'কথানাট্য' বেরিয়েছিল সেই 'সংহতি'তেই।

'তারাশঙ্কর কৃষক-শ্রমিকের কথা বলেছেন অনেক জায়গায়। সে-কথা মনে করলে 'সংহতি'র কথাই আবার মনে পড়ে। 'সংহতি' ছিল শ্রমজীবীদের পত্রিকা। সাহিত্যের আসরে সে কাগজের খুবই প্রভাব ছিল সে-আমলে। আমাদের সমাজের বিশেষ একটি স্তর সম্বন্ধে আগ্রহ ছড়িয়েছিল সে-পত্রিকা। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সংহতি'র লেখা এইসূত্রে বার বার মনে পড়ে।

'মনে আছে, বারীন ঘোষের ভবানীপুরের বাড়িতে মণীন্দ্রলালের একটি ছোট-গল্প পড়ে শোনাতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে, বড়োই অসংগত,—বড়োই অস্বাভাবিক তাঁর সে রীতি! 'কালিকলম'-এ তাঁর কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছিল বটে। 'সংহতি'তে শৈলজানন্দের উপন্যাস বেরিয়েছিল ; তার প্রথম লাইনটাই বোধ হয় এই ভাবে শুরু হয়েছিল : 'কারখানায় সিটি বাজে'। সে-লেখা উপন্যাস হিসেবে তুচ্ছ, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ভোলবার নয়। এর পরেই আমরা পেয়ে গেলাম প্রেমেন্দ্রের 'পাঁক'! সে বইয়ের কোনো কোনো অংশ আশ্চর্য। মনে আছে, ভোরের কলকাতার বর্ণনা। ছাপাখানার শ্রমিক, রেলের শ্রমিক ইত্যাদি কতো যে শ্রমিকপ্রসঙ্গ! শ্রমিকদের কথা, 'সংহতি'তে ধারাবাহিক ভাবেই ছাপা হয়েছে। তারাশঙ্কর যে তাঁর অজস্র লেখার মধ্যে সমাজের সেই নিম্ন-স্তরের কথায় এসেছেন, সে হয়তো সেই প্রেরণাসূত্রেই!

'সংহতি'র প্রথম সংখ্যার (১৩৩০) সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি ছিল জ্ঞানাঞ্জন পালের লেখা। সে-সংখ্যার এক কপি মহীশূরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে, আর এক কপি শিলঙে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ আশীর্বাদ পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন একটি প্রবন্ধ। তার নাম 'সংহতি'। 'রাশিয়ার চিঠির' আগেকার লেখা সেটি।

'অসহযোগের সময়েই প্রথম 'বিজলী' বেরিয়েছিল (১৩২৭-২৮) বারীন ঘোষের সম্পাদনায়। পরে নলিনীকান্ত সরকার সে-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তারপর শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদক ছিলেন তেরশ একত্রিশের শেষ দিকে। তেরশ বত্রিশের শেষ পর্যন্ত সেই ধারাতেই ছাপা হয়। তেত্রিশের শুরুতে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে 'বিজলী' বেরিয়ে যায় দীনেশরঞ্জনের হাতে। সাপ্তাহিক হিসেবে 'বিজলী'র সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার কথা চিরকাল মনে থাকবে। এই 'বিজলী'তেই জগদীশ গুপ্তের 'তিনটি চুমা' গল্প বেরিয়েছিল। 'পল্লীশ্মশান'ও তাঁরই লেখা। 'বিজলী'তেই তাঁকে আমি প্রথম আবিষ্কার করি। তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে জনপ্রিয় হবার খুবই আগ্রহ দেখা যায়। তাঁর ভাষা কেমন যেন আর্কেইক archaic ধরনের,—আমার বার বার মনে হয়েছে যে, তাঁর মননের সূক্ষ্ম প্রকৃতি সর্ব-সাধারণের অধিগম্য নয়। তারাশঙ্করের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের বোধ হয় কোনো মিলই চোখে পড়ে না। তবে, তারাশঙ্করেরই মতন রবীন্দ্রনাথকে তিনিও খুবই শ্রদ্ধা করতেন। জগদীশ তাঁর নিজের প্রথম গল্পের বই 'বিনোদিনী' রবীন্দ্রনাথের নামেই উৎসর্গ করেন।

তখনকার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় 'বিজলী' সম্বন্ধে বিপিন পাল লিখেছিলেন —'a sprightly weekly'! চতুর্থ বছরে 'বিজলী' সাবিত্রীপ্রসন্নের হাতে এলো। তখন সুবোধ রায় ছিলেন সহকারী সম্পাদক। 'বিজলী'র সঙ্গে মুরলীধর বসু এই সময়েই জড়িত হন। 'কল্লোল'এ সুশান্ত সেন ছদ্মনামে মুরলীধর বসুই গল্প সমালোচনা করেছিলেন কিছু দিন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মশক্তি' বের হয় সে সময়ে। প্রমথ চৌধুরীও সে-পত্রিকায় লিখেছেন।

আমি বললুম: ধূর্জটিপ্রসাদের কথা বলুন একটু।

—'ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার। সবুজপত্রে 'দাদার ডায়েরি' লিখতেন তিনি। 'উত্তরা'তেও তিনি লিখতেন। তাঁর 'অন্তঃশীলা' আমার ভালো লেগেছিল। দিলীপ রায় 'কল্লোল'এ বিশেষ লেখেননি। তিনি যখন দ্বিতীয় বার বিলেতে যান, সে সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঔপন্যাসিক হিসেবে অন্নদাশঙ্কর বা দিলীপকুমার কোনোদিনই ব্যাপক পাঠক-সমাজের প্রিয় লেখক ছিলেন না। বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্কর—এই চার জনই তো আমাদের জনপ্রিয় এবং

সর্বাধিক প্রচারিত আধুনিক ঔপন্যাসিক। এঁদের আগে বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার এবং প্রবোধকুমার সান্যাল ছিলেন জনপ্রিয়।

'কবি' ও 'চৈতালীঘূর্ণি'

তারাশঙ্করের সেই 'কল্লোল'-'কালিকলম' পর্বের রচনা 'চৈতালী ঘূর্ণি'র প্রথম অনুচ্ছেদটি এই :

'অনাবৃষ্টির বর্ষায় খর রৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে; সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস, হু হু করিয়া একটা দাহ বহিয়া যায়।'

অল্প কথায় গ্রীষ্মকালের এই প্রাকৃতিক প্রদাহের ভূমিকাটুকু শেষ করেই তাঁর এই উপন্যাসের কৃষকদম্পতি—গোষ্ঠ আর গোষ্ঠর স্ত্রী দামিনীকে তিনি দৃশ্যে অবতীর্ণ হতে দিয়েছিলেন। ক্লান্ত শরীরে তামাক টানতে টানতে গোষ্ঠ তার রন্ধনরতা স্ত্রী দামিনীর সঙ্গে গ্রামের দুরবস্থার কথা আলোচনা করে। গোলা-ভরা ধান, যাত্রা, মচ্ছব কতো কী ছিল সেই গ্রামে! কিন্তু সে-সবই একে-একে শেষ হয়েছে। গোষ্ঠ বলে :

'আজ মাঠ থেকে ফিরতে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গা শিউরে উঠল। সমস্ত গাঁটা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে বাতাসে তপ্ত বালি হুহু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উঠছে, সেয়াল কুকুর শকুনি চেঁচাচ্ছে; গাঁয়ের মাঝ থেকে একটা সাড়া নেই কারু, সব যেন মরে গিয়েছে; আমার বুকখানা কেমন করে উঠল বাপু।'

গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে এক মরা নদী—'নদী ঠিক নয়, একটা মরুভূমি, লম্বা একটানা একটা বালুকার প্রবাহ, জল নাই; অন্তত বৎসরের মধ্যে আটটি মাস জলধারা বয় না, বয় একটা অদৃশ্য অগ্নিলীলা, খর রৌদ্রে হু হু করে মরীচিকার ধারা।' সেই নদীর পরেই চরের ওপরে শ্মশান!

'চৈতালী ঘূর্ণি' বইখানিও 'কবি'র মতনই অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন উপন্যাস। তারাশঙ্করের আদি-পর্বের এই দু'খানি উপন্যাসে তাঁর অনুসৃত দুটি পৃথক ধারার আলাদা আলাদা দুটি উদাহরণ পাওয়া গেলেও লেখকের মূল মনোধর্মের দিক থেকে এই দুটিতে বর্ণনার একই রকম প্রগল্‌ভতা চোখে পড়ে। 'কবি'র কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে তাঁর বর্ণনার ঝোঁক সর্বত্র ঠিক 'প্রগল্‌ভতা'র

পর্যায়ে পড়েনি বটে। কারণ, 'কবি'র কাহিনী বর্ণনায় তারাশঙ্করের কথকতা কখনোই ঘটনার সম্পর্ক পরিত্যাগ ক'রে, অবিমিশ্র প্রকৃতি-বর্ণনাতে অথবা অনুরূপ অন্য কোনো রকম উচ্ছ্বাসে মগ্ন হতে পারেনি। 'কবি'র প্রথম আটটি অধ্যায় তো ঘটনা আর চরিত্রের কথাতেই ভরপুর। অষ্টম অধ্যায়ের শেষ দিকে 'ঠাকুরঝি' কবির দেওয়া উপহার কেমিকেল সোনার হারটুকু গলায় পরে বিদায় নিয়ে যাবার পরে, ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে, নিতাই কবিয়াল যেখানে কৃষ্ণচূড়া গাছটির নিচে একলা দাঁড়িয়ে থাকবার একটু সুযোগ পেয়েছে, সেই স্বাভাবিক অবকাশটুকুই তারাশঙ্কর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি-বর্ণনার কাজে লাগিয়েছিলেন। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র বর্ণনাবাহুল্যের সঙ্গে 'কবি'র বর্ণনা-রীতির পার্থক্য তাই সহজেই চোখে পড়ে। নিতাইয়ের মনের অবস্থা,—এবং বাইরে ফাল্গুনের প্রকৃতি সেখানে পরস্পরের কতো যে নিকটবর্তী, সে-কথা বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেই অংশটুকু এখানে তুলে দেওয়া গেল :

'নিতাই এখনও দাঁড়াইয়া আছে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। দ্বিপ্রহরের দিক্‌চক্রবালে ধূলার আস্তরণ [দেখা দিতে] শুরু করিয়াছে, বাতাস উতলা হইয়াছে, সেই উতলা বাতাসে সে ধূলার আস্তরণ ঝিরঝির করিয়া বহিয়া যায় যেন দূরের নদীর প্রবাহের মত। নিতাইয়ের মনও চঞ্চল। সে সেই রহস্যময় আস্তরণের মধ্যে এখনও যেন একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে। সে স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া গুন গুন করিয়া গান ভাঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে মনে একটা বিচিত্র কথার মালা গাঁথিয়া উঠিল। নিজেরই এক সময়ে মনে প্রশ্ন জাগিল—কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে? ওই মেয়েটি তাহার কে? মনই বলিল—কে আবার—'মনের মানুষ'। মনের মানুষের জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। সাধ হয় এই পথের ধারেই ঘর বাঁধিয়া বাস করে। —সেই কথাগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া সুর দিয়া গুন গুন করিতে লাগিল আপন মনেই—'ও আমার মনের মানুষ গো! তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর! পথের পরে ঝিকিমিকি তোমার নিশানা চোখে আমার ভাসে নিরন্তর।' ঘর বাঁধিয়া অহরহ দাওয়ায় বসিয়া চাহিয়া থাকিবে। ঘর হইতে ঠাকুরঝি বাহির হইলেই

তাহার মাথার ঘটি—কাঁখের ঘড়ার ঝিলিক আসিয়া চোখে লাগিবে।'

প্রকৃতি, প্রেম, আর শিল্পীর শিল্প-চিন্তা—তিনটি ব্যাপার এখানে একযোগে ব্যক্ত হয়েছে। বর্ণনা এখানে বাহুল্যে গিয়ে ঠেকেনি। 'কবি'র কথা-প্রবাহে এরকম ছবি সত্যিই বেশ সহজ, স্বাভাবিক এবং শিল্পসম্মত। পাশাপাশি দু'খানি বই তুলনা করে দেখতে গেলে মনে হয় যে, 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে যেন এই দক্ষতারই সমূহ অভাব!

নদী-প্রকৃতির দিকে বোধ হয় বাঙালী লেখক-মাত্রেরই আগ্রহ। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নদী সম্বন্ধে এই বিশেষ আগ্রহের কথাটা এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি'তেও নদীর প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গেছেন। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র প্রথম তিন পৃষ্ঠার মধ্যে প্রধানতঃ নদী আর নদীতীরবর্তী শ্মশানের বর্ণনাই সুস্পষ্ট। শ্মশানের পরেই থান তিরিশেক মাঠ। সেই মাঠ পেরিয়ে গ্রাম। গ্রামের লোকালয়ে প্রবেশ করবার আগে নদীর নির্জলা বালি এবং মাঠের ওপর শ্মশানের অগ্নিলীলার বর্ণনা তিনি একটু বিশদ ভাবেই দিয়েছেন। তারপর এসেছে মানুষের কথা। সেটা বইয়ের তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে:

'মানুষ তো নয় সব, হাড়-চামড়া ঝরঝর করে, কংকালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; বাড়িঘরের অবস্থাও তাই, দেওয়ালগুলির লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চালও তাই, খড় বিপর্যস্ত, কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবন্তের রাজ্যের টুকরাখানা বুঝি আর থাকে না।'

এই ভূমিকার পরে অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তারাশঙ্কর প্রশ্ন করেছেন: 'কে রক্ষক? এবং তার পরেই বাউল-কথক তারাশঙ্কর জবাব দিয়েছেন:

'রক্ষক ভগবান কত দূরে কে জানে!

'লোকে ভগবানকে ডাকেও।

'কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না।

'কিংবা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুর।

'তবু উচ্চকণ্ঠে প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে—

'ও তার নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে,
নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।'

—এবং এই কথকতার সূত্রেই ব্যাখ্যাতা তারাশঙ্কর অতঃপর তাঁর এই ব্যাখ্যা যোগ করেছেন:

'ওই বিশ্বাসটুকুর আশ্বাসেই উহারা বাঁচিয়া আছে, ওইটুকুই জীর্ণ স্বর্ণসূত্রের মত এই জীবনের মালাখানি আজও গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ও আশ্বাসও আজ অতি ক্ষীণ, অতি দুর্বল; তাই উহারা মুখে বলে, হরি হে যা কর। কিন্তু মনে ঠিক ওই কথাটা মানিয়া লইতে চায় না, সে কবিরাজের 'ডাক্তারখানা' পর্যন্ত ছুটায়, বটিকা পাঁচন মুখ খিঁচাইয়া গিলায়!'

'বাঁচিলে দেবতার পূজা দেয়; না বাঁচিলে বলে, পাথর, পাথর, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা।

'মোট কথা, ভগবানকে উহারা মানে কি মানে না, সেটা আজ একটা অমীমাংসিত সমস্যা।

'ডাকিতেও মন চায় না, না ডাকিলেও মন খুঁতখুঁত করে।

'উপলব্ধ সত্যে আর যুগযুগান্তরের সংস্কারে এখানে প্রবল দ্বন্দ্ব; ব্যর্থতায় বুকের ভিতর ক্ষোভ জাগিয়া উঠে—সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঝোড়ো হাওয়ার মতো।'

চরিদিকের এই 'ঝোড়ো হাওয়া'র মধ্যেই,—দামিনীর 'বিভীষিকাময়ী ভাবনা'র স্রোতে হঠাৎ বাইরে থেকে কাবলীওয়ালার ডাক এসে পৌছোয়! তারপর, ত্বরায় স্বামী-স্ত্রীর ফিশফিশ মন্ত্রণা! গোষ্ঠ ঘরের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে। দামিনী তাতে নারাজ। কিন্তু বেশি কিছু ভাববার সময় নেই! ঘরের বাইরে এসে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে দাঁড়াতে হয় দামিনীকে। ঘরের ভেতরে পাঁচ বছরের ছেলেটা জ্বরে ধুঁকতে-ধুঁকতে চেঁচায়। কাবলীওয়ালা সবই বুঝতে পারে। ব্যাপার বুঝেই সে লোকটা নির্লজ্জ পরিহাস করে, অপমান করে। তখন—

'দামিনী ভয়ে চেঁচাইয়া উঠে।

'কাবুলী হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়, আপন ভাষায় গোটা জাতটাকে গালি দেয়।

'দামিনী কাঠ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে, তবু সে চোখ আগুনের মত জ্বলে।

'কতক্ষণ পর দরজা খুলিয়া গোষ্ঠ বাহিরে উঁকি মারিয়া বলে, গিয়েছে বেটা শকুনি?'

এইভাবে নদী, মাঠ, শ্মশান বর্ণনার পরেই গোষ্ঠ-দামিনী-কাবলীওয়ালা সম্পর্কিত ঘটনাবলীর নাট্য-দৃশ্য দেখা দিয়েছে 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে। তারপর গোষ্ঠর বিরুদ্ধে দামিনীর অভিযোগ ব্যক্ত হয়েছে তীব্র তিরস্কারে। গোষ্ঠ বেরিয়ে যায়—ঘর থেকে মাঠে। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের দৃশ্য। সেই দৃশ্য দেখে ঔপন্যাসিক আবার যেন নিজের কবি-সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তারই ফলে, অজস্র ধানের শীষ দেখে গোষ্ঠ মনে মনে গানের কলি ভেঁজেছে:

ধান, ধান, ধান—ধানে রাখবে জান,
ঋণ শোধিব, খাজনা দিব
ধানে রাখবে আমার মান
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন
এই যেন খেতে পাই জন্ম জন্ম।

ফসলের ক্ষেতে অসংখ্য আখের পাতা দুলতে দেখে গোষ্ঠর মনে পড়ে যায়:

কাজুলি রে কাজুলি,
তোর পায়ে এবার আমার
বউ পরাবে মাদুলি।

এদিকে, ঘরে তখন রুগ্ন ছেলেটা ভাত খাবার বায়না ধরে কাঁদতে কাঁদতে এলিয়ে পড়েছে। স্নেহসর্বস্বা, অশিক্ষিতা দামিনী তাকে ভাত খাইয়েছে। ফলে, তার জ্বর বেড়ে গেছে। এবং 'চৈতালী ঘূর্ণি'র প্রতিনায়ক এসে দেখা দিয়েছে সেই অবস্থাতেই—

'তাই যাহাকে সে দূরে রাখিতে চায়, যাহার পরম দাস্যভাব সে ঘৃণা করে, সেই সুবল দাসের কাছে ছুটিয়া গিয়া হাতের পৈঁছা জোড়াটি খুলিয়া দিয়া কাকুতি করিয়া কহিল, আমাকে দুটি টাকা দাও, আর কবরেজকে একবার ডেকে দাও।

'তরুণ সুবল মুগ্ধদৃষ্টিতে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া আবার সলাজে মুখ নামাইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, পৈঁছে তুমি রাখ, টাকা আমি দিচ্ছি।

'বিষের ঘোরের মাঝেও যাতনার দাহে চেতনা ফিরিয়া আসে, সুবলের সহানুভূতি দামিনীর বুকে সেই দাহের কাজ করিল, দামিনী ঝাঁজাইয়া উঠিল, শুধু তোমার টাকা নোব কেন আমি?'

কথার প্রবাহে এই নাটকীয় রীতিতেই তিনি কৌতূহল-বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করেছেন। বর্ণনা, সংগীত, সংলাপ—একে একে সমস্ত উপাদানই এসে যোগ দিয়েছে। এবং তারাশঙ্করের সে পর্বের অধ্যাত্মধারণা এবং বাস্তববোধও তাতে পরিস্ফুট হতে বাধা পায়নি।

'চৈতালী ঘূর্ণি'র আসল গল্পটি কিন্তু খুবই অল্প কথায় বলে নেওয়া যায়। সেকালের একখানি প্রসিদ্ধ পত্রিকার 'সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়'-এর মধ্যে পুস্তক-পরিচায়ক নির্মলচন্দ্র দত্ত খুবই সংক্ষেপে সে-কাজ করেছিলেন। এখানে তাঁর সেই আলোচনাটুকুই তুলে দেওয়া গেলো:

'পাড়াগাঁয়ের দুঃখে কষ্টে, জমিদারের অত্যাচারে নাস্তানাবুদ হয়ে, স্ত্রীর হাত ধরে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসে গোষ্ঠ শেষে এক কারখানায় কুলির কাজ নিলে। সেখানকার নিদারুণ অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে 'বাবু'দের কথা শুনে কতকগুলি কুলির সঙ্গে সে ধর্মঘট করলে। শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে হাতুড়ির ঘায়ে গোষ্ঠ প্রাণ হারালে। 'বাবুদের' self-conscioueness জাগাবার চেষ্টা, ধর্মঘট প্রভৃতি করা আপাততঃ চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণির মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী হলেও লেখকের বিশ্বাস 'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর'।

'বইখানি দরদ দিয়ে লেখা। কুলি-বস্তির ছবি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।......[২২]

এই কাহিনীতে তারাশঙ্কর তাঁর সে-পর্বের যে জীবন-দর্শন প্রকাশ করেছিলেন, সে বিবরণ তাঁর নিজের কথা দিয়েই বলা যেতে পারে। বইয়ের

২২। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৯: পৃঃ ৭১৬ দ্রষ্টব্য।

শেষ দিকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত দরিদ্র জনসাধারণের ভাবনাটা তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন:

'প্রাণের চেয়ে মান বড়, এ দর্শনবাদ মানুষের আবিষ্কৃত, এ তাহার স্রষ্টার উপরে সৃষ্ট, মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো—দুনিয়ার সর্বধর্ম সর্বদ্রব্যের বিনিময়ে আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায়; সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে।'

—এবং 'চৈতালী ঘূর্ণি'র একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে, মরণোন্মুখ গোষ্ঠর পাশে দাঁড়িয়ে, অদূরে রেললাইনের ধারে কুলিদের ছেলেদের ধর্মঘটের খেলা খেলতে দেখে শিবকালী নিজের মনে বলে ওঠে—'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর'।

'চৈতালী ঘূর্ণি'তে তিনি যেমন রুক্ষ বালি, মাঠ আর শ্মশানের পটভূমি মেনে নিয়ে কাহিনীর স্রোত ঘনীভূত হতে দিয়েছিলেন, 'কালিন্দী'তে তেমনি কালী নদীর পটভূমি! সে-সময়ে তারাশঙ্করের এই 'কালিন্দী' সম্বন্ধে প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছিলেন:

'মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ হয়, আবার মিটিয়া যায়; পুরুষানুক্রমে দুই পরিবারের বিবাদ চলে, আবার সময় সময় উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু নির্মিত হয়। কিন্তু প্রকৃতি এ সকল মিলন-বিরোধের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না; অথবা, মানুষের এ সকল চেষ্টা যে নিরর্থক তাহাই বুঝি ফিরিয়া ফিরিয়া দেখে। জর্জ এলিয়টের The Mill on the Floss-এ নদী-প্রকৃতি অবশেষে টম ও ম্যাগি দুই ভাইবোনকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল, নিজেদের মধ্যে যত মনোমালিন্য ছিল, তাহা সব ফ্লসের জলে ধুইয়া গেল, তাহাদের চিহ্নও লোপ পাইল. ফ্লসের উপরে যে কল তাহা দেখিতে লাগিল—নির্মম সাক্ষীরূপে।'

ফ্লসের সঙ্গে কালী-নদীর এই সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেই প্রিয়রঞ্জন লিখেছিলেন:

'রায়হাটের কালিন্দী বা কালী নদীও তেমনই। তাহার মায়া-মমতা নাই,—পরিবারে পরিবারে মিলনের চেষ্টা নাই,—আছে শুধু একটু কৌতুক করিবার চেষ্টা, মানুষে মানুষে মিলনের চেষ্টাকে, উন্নতি

করিবার চেষ্টাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে ক্রুরতা আছে তাহাকে প্রকট করিবার চেষ্টা।

'মানুষের প্রকৃতিও কি ঐ তটগ্রাসিনী কালিন্দীর মতো নয়? সোমেশ্বর-শৈবলিনী-সংবাদ যেন এই উপন্যাসটির সুর বাঁধিয়া দিতেছে। তখনকার দিন হইতে মহী-অহীর সময় পর্যন্ত অদৃষ্টের ক্রুর হাস্য তো একই প্রকারের! কলিকাতার কলওয়ালা মহাজন বিমলবাবু আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার তেজ ও বর্বরতা লইয়া সগৌরবে দণ্ডায়মান। সেকালের সাঁওতাল হাঙ্গামা আর একালের যান্ত্রিক সভ্যতা—উপদ্রবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়—মাটির উপরেই সকলের কোপ, মাটি লইয়াই সকলের বিড়ম্বনা।

'সাঁওতাল মেয়েদের নাচে, ইন্দ্র রায়ের গম্ভীর ও ক্রুর প্রকৃতির রূপান্তরে, অহীন্দ্রের পূর্বপুরুষগত বৈপ্লবিক সংস্কারে, গ্রামের চাষীদের মনোভাবে তারাশঙ্করবাবুর বর্ণনাকুশলতা ফুটিয়া ইঠিয়াছে। 'ধাত্রীদেবতা'য় তিনি যেমন শিবনাথকে দাঁড় করাইয়া বর্তমান যুগের তরুণ বাঙালী মনের একটা ইতিহাস লিখিয়াছেন, মানুষের বিপ্লবী মনের পরিবর্তনের দিক দিয়া, এখানে কিছু করেন নাই, এখানে পূর্বপুরুষলব্ধ সংস্কারকেই যেন ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন,—অবশ্য সে সংস্কারও নব কলেবর ধারণ করিয়াছে; একটা প্রশ্ন জাগে, ইন্দ্র রায় অহীন্দ্রের চেষ্টাকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, সমধর্মীর মত,—সকল কালের বিপ্লবী মন কি সেই ভাবে দেখে? যাহা হইক, 'কালিন্দী'র মধ্যে অহী-মহী সব চেয়ে বড় ছবি নয়, তরুণী তপস্বিনী উমাও নয়, দুর্দান্ত বিমলবাবুও নয়,—কালী নদীই স্পষ্ট, তাহার পাশে হাসি-কান্না সবই অনিত্য।'[২৩]

'কালিন্দী' অবিশ্যি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র অনেক পরের রচনা। কিন্তু শিল্প-কৌশলের দিক থেকে তারাশঙ্করের একটি প্রিয় এবং অভ্যস্ত রীতিই এই দু'খানি বইয়ে প্রায় সমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই দু'খানি বইয়ের কথা একসঙ্গে মনে পড়ে। এবং কেবল এই দু'খানিতেই নয়। অন্যত্রও

২৩। পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৮ পৃঃ ৯৫০।

তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রথমে প্রকৃতির বিশেষ কোনো দৃশ্য দেখিয়ে দেওয়া এবং তারপর সেই পটেতেই—অথবা তারই সামনাসামনি মানব-সংসারের বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের স্রোত দেখিয়ে দেওয়াই তাঁর এ রীতির বিশেষত্ব।

রায়হাট গ্রামের প্রান্তে সেই ব্রহ্মাণী নদী—যার নামান্তর 'কালিন্দী',—সেই নদীকেই 'কালিন্দী' উপন্যাসের আদিতে দেখা গেছে, অন্তেও দেখা গেছে! 'কালিন্দী'র প্রথম ক'টি অনুচ্ছেদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এইসূত্রে তার শেষ অনুচ্ছেদটিও উদ্ধৃত হোলো :

> 'সুনীতি উদাস দৃষ্টিতে চরটার দিকে চাহিয়াছিলেন, রামেশ্বরের কথা কানে যাইতেই তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন ; সম্মুখেই রক্তিম সূর্য, উদয়শিখর হইতে অস্তাচল পর্যন্ত মেঘমুক্ত ভাবী আকাশ সর্বপাপঘ্ন দেবতার মহাদ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে। তারই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে রায়হাটে, কালিন্দীর চরে, সর্বত্র—সর্বত্র। তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।'

প্রিয়রঞ্জন খুবই সংগত ভাবে জর্জ এলিয়টের 'মিল্ অন্ দি ফ্লস'-এর সঙ্গে 'কালিন্দী'র সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। স্থান-কাল-পাত্রের প্রভেদ সত্ত্বেও তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই আঙ্গিকের প্রতিধ্বনিটুকু সম্যকভাবে উপলব্ধি করবার জন্যেই জর্জ এলিয়েটের ঐ উপন্যাসের আখ্যানসার এখানে স্মরণ করা দরকার। সে গল্পটি এই :

ফ্লস নদীর কিনারায় ডর্লকোট মিল। পাঁচ-পুরুষ ধরে টুলিভার পরিবারই সেই কারখানার মালিক। হালের মালিক যিনি, তাঁর নাম এডওয়ার্ড টুলিভার। তিনি সৎ, উদার ব্যক্তি এবং আইনের মারপ্যাচ সম্বন্ধে তিনি খুবই হুঁশিয়ার! এডওয়ার্ড টুলিভার বিয়ে করেছিলেন ডডসন পরিবারের একটি মেয়েকে। তাঁদের দুটি ছেলেমেয়ে। বড়োটি ছেলে, নাম তার টম। মেয়ের নাম ম্যাগি। ম্যাগির বয়স তখন ন' বছর। ম্যাগি বেশ বুদ্ধিমতী, কিন্তু টম্ বড়োই একগুঁয়ে ধরনের ছেলে। এড্ওয়ার্ড টুলিভার স্থির করলেন যে, টম্ লেখাপড়া শিখতে যাবে তাদের সেই গ্রাম থেকে মাইল পনেরো দূরের এক ইস্কুলে। রেভারেণ্ড ওয়াল্টার স্টেলিং সেখানকার প্রধান শিক্ষক। তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন যে, লেখাপড়াতে টমের বিশেষ আগ্রহ নেই! মাস-কয়েক পরে ম্যাগিকে সঙ্গে নিয়ে এড্ওয়ার্ড নিজে গিয়ে টমকে দেখেও

এলেন। ম্যাগির জন্যে টমের মন কেমন করতে থাকে। তবু, উপায় কি ? রেভারেণ্ড স্টেলিঙের কাছে তাঁকে থাকতেই হবে। ইতিমধ্যে ফিলিপ ওয়াকেম নামে আর একটি ছাত্র আসে স্টেলিঙের কাছে। ফিলিপের বাবার নাম জন ওয়াকেম,—তিনি একজন উকিল। এডওয়ার্ড টুলিভার তাঁকে কিছুতেই দেখতে পারতেন না।

ছেলেবেলায় এক দুর্ঘটনার ফলে ফিলিপের বেশ বড়ো গোছের একটা জখম হয়েছিল। তার সেই শারীরিক ক্রটির ফলে,—টমের মনে তার সম্বন্ধে বিরাগ আরো বেড়েই যায়। কিন্তু ফিলিপের সঙ্গে ম্যাগির ইতিমধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেছে। ম্যাগিকে যখন ইস্কুলে পাঠানো হয়, ম্যাগি তখন ফিলিপকে খুবই আদর জানিয়ে বিদায় নিয়ে যায়।

টমের বয়স যখন ষোলো বছর, এডওয়ার্ড টুলিভার তখন এক মামলায় হেরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হন।—এবং কেবল তাই নয়, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে, তিনি সেইদিনই গুরুতর জখম হন !

এর পরে ওয়াকেম হয়েছেন মিলের মালিক। টুলিভারদের বাড়িটা অবিশ্যি টুলিভারদেরই থাকে। টুলিভারকে মিলের ম্যানেজারের কাজও দেওয়া হয়। আর ইতিমধ্যে টমেরও একটা কাজ জুটে গেছে। সে তার বাবাকে ওয়াকেমের চাকরি নিতে নিষেধ করে। এডওয়ার্ড কিন্তু টাকার জন্যে নিজে চাকরিটা মেনে নিয়েও নিজের ছেলের কানে ওয়াকেমের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়ে রাখবারই পরামর্শ দেয়। ম্যাগির এসব খুবই খারাপ লাগে। তার বয়স যখন সতেরো বছর, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন ফিলিপ ওয়াকেমের সঙ্গে ম্যাগির দেখা হয়ে যায়। তারপর, আরো একবার। ফিলিপ ওয়াকেমের সঙ্গে ম্যাগির এই দেখা-সাক্ষাতের খবর পেয়ে টম নিজের বোনকে এই বলে শাসিয়ে দেয় যে, ফিলিপের সঙ্গে আর কোনোদিনও ম্যাগিকে যদি কথা বলতে দেখা যায়, তাহলে পিতা এড্ওয়ার্ড টুলিভারকে সব কথাই জানিয়ে দিতে বাধ্য হবে সে !

এদিকে নিজের মাইনের টাকা জমিয়ে, ওয়াকেমদের ঋণ পুরোপুরি শোধ করে দেবার সৌভাগ্য এলো এড্ওয়ার্ড টুলিভারের জীবনে। ঋণশোধের উৎসব উপলক্ষেই ভোজের ব্যবস্থা ছিল সেদিন। কারখানার বাইরে ওয়াকেমের সঙ্গে দেখা করলে টুলিভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই কথায়-কথায় হাতাহাতি শুরু

হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। ওয়াকেম অক্ষত রইলো বটে, কিন্তু এই উত্তেজনার ফলে এডওয়ার্ড টুলিভারের শেষ সময় ঘনিয়ে এলো!

ফ্লস নদীর তীরে সেই ডর্লকোট মিলের সঙ্গে জড়িত এই দুই পরিবারের জীবন-জলতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত কিন্তু এখানেই শেষ হতে দেননি জর্জ এলিয়ট। বাপের মৃত্যুর পরে, ম্যাগিকে তার নিজের পুরোনো ইস্কুলেই একটি চাকরি নিতে হয়। তখন তার বয়স উনিশ। দস্তুরমতো সুন্দরী হয়ে উঠেছে সে। দূর সম্পর্কের এক বোন লুসির কাছে বেড়াতে এসে সেন্ট-অগের সব চেয়ে ধনী পরিবারের ছেলে স্টিফেন গেস্ট-এর সঙ্গে ম্যাগির আলাপ হয়ে যায়। স্টিফেন ছেলেটি লুসিরই প্রণয়ার্থী। কিন্তু ম্যাগি তাকে ভালোবেসে ফেলে। একদিন ফ্লস নদীতে নৌকো ভাসিয়ে, স্রোতের টানে তারা অনেক দূরে ভেসে যায়। ম্যাগিকে বিয়ে করতে চায় স্টিফেন। কিন্তু ম্যাগি তাতে রাজী হয় না। ফিরতে হয় দুজনকেই।

ইতিমধ্যে স্টিফেনের সঙ্গে ম্যাগির পলায়নের খবর পেয়ে গেছে টম। ম্যাগিকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না টম। ম্যাগিকে বাড়ি থেকে বার করে দিতেই বা কুণ্ঠা কিসের? রাগে তার গা জলতে থাকে!

তারপর ডর্লকোট মিলের মালিকানা বদলেছে আবার। নতুন মালিকদের অধীনে অতঃপর টমই ডর্লকোটের নতুন ম্যানেজার হয়েছে। সেখানে ম্যাগির পক্ষে আর কাজ পাবার উপায় নেই। সে কোনো মতে এক আত্মীয়ার আশ্রয়ে দিন কাটাতে থাকে। দিন যায়, দিন যায়! তারপর সেবার সেপ্টেম্বর মাসটা এলো বন্যা নিয়ে। ভাইয়ের বিপদ বুঝে ম্যাগি একখানা নৌকো ভাসিয়ে ডর্লকোট মিলের দিকে এগিয়ে গেল। জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, শেষ-পর্যন্ত নৌকোতে উঠলো টম। তারপর, ভাই-বোনে বাঁচতে চেষ্টা করলো সেই একই নৌকোয়! কিন্তু ফ্লস নদীর উত্তাল ঢেউ এসে তাদের সে চেষ্টায় ছেদ টেনে দেয়। তাদের জীবনের ঝগড়া মেটাবার জন্যেই দরকার ছিল মৃত্যুর এই চরম স্তব্ধতার!

জর্জ এলিয়টের এই 'মিল অন্ দি ফ্লস্' বইখানিতে শুধু যে সেকালের ইংলণ্ডের অঞ্চল-বিশেষের আচার-ব্যবহারের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, তা নয়। মানুষে মানুষে মনোভঙ্গিতে এবং অভিজ্ঞতায় যে প্রভেদ দেখা যায়,—জীবনের বিভিন্ন দৃক্‌কোণের সমাবেশে এবং ঘাত-প্রতিঘাতের বিচিত্রতায় সুবিপুল

যে সমারোহ অনুভব করা যায়, জর্জ এলিয়ট সেই জীবন-সত্যই দেখাতে চেয়েছিলেন! সেই সঙ্গে গভীর এক বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর এই উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ক্ষেত্রটির মধ্যে! তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'র সঙ্গে সেদিক থেকেও এ-বইয়ের বেশ একটু মিল অনুভব করা যায়।

'কালিন্দী'র কথা আরো বিশদভাবে আলোচ্য। এ-আলোচনার পরের অংশে পুনর্বার সে উপন্যাসের কথা উঠবে। ইতিমধ্যে 'কবি', 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'কালিন্দী' ইত্যাদি লেখার সঙ্গে,—বিশেষতঃ রীতির দিক থেকে এবং কতকটা বিষয়বস্তুর জন্যেও—আর-একরকম তুলনার উদ্দেশ্যেই তাঁর 'আগুন' বইখানির কথা বলে নেওয়া যাক।

আগুন

গ্রন্থাকারে তারাশঙ্করের 'আগুন' প্রথম দেখা দেয় তেরশ চুয়াল্লিশ সালে। তেরশ' পঞ্চান্নর বৈশাখের মধ্যেই সে-উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। 'আগুন'-কাহিনীর কথক নরেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ঘটনা সেটি। মোট উনিশ পরিচ্ছেদে সে কাহিনী সম্পূর্ণ। নরেশের কথকতা দিয়েই কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। কাহিনী এবং কথকতার ধারা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় 'বনফুলের' কথা। তারাশঙ্করের এই লেখাটির কোনো কোনো জায়গায় বনফুলের ভঙ্গিই যেন বর্তেছে! নরেশ সুদূর অতীতের কথা ভাবছে :

'সারকুলার রোডের সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রনাথের কথাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। কত কথা মনে হইতেছে! দীর্ঘ এতদিনের জীবনেতিহাসের মধ্যে কয়টি পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ গভীর রাত্রির মধ্যগগনচারী কালপুরুষ নক্ষত্রের মত দীপ্তিতে পরিধিতে প্রদীপ্ত ও প্রধান হইয়া আছে। কালপুরুষ নক্ষত্রটির খড়্গধারী ভীমকায় আকৃতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের আকৃতির যেন একটা সাদৃশ্য আছে। এমনই দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে, একদিন পিছন ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না, যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার

এ উন্মত্ত যাত্রা, তাহাকে আজও পাইল না, তবু সে চলিয়াছে।'

এই ভাবনার স্রোতে—চন্দ্রনাথের সঙ্গেই আরো একজনের কথা মনে পড়ে। সে হীরু। চন্দ্রনাথ,—চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথবাবু,—আর এই হীরু—কোনো এক সময়ে এই তিনটি মানুষ এসে পড়েছিল একই গ্রামে। তিনজনের সেই সমাবেশের কথা উল্লেখ করে উপমা-দক্ষ তারাশঙ্কর সমুচিত এক সাদৃশ্যের ইশারা দিয়েছেন: 'আগ্নেয়গিরির গর্ভের মধ্যে কল্পনাতীত বিচিত্র সমাবেশে যত কিছু প্রলয়ঙ্কর দাহ্য বস্তু সমাবিষ্ট হয় কি করিয়া। এও হয়তো সেই বিচিত্র সমাবেশ!'

ইস্কুলে চন্দ্রনাথ, নরেশ আর হীরু ছিল সহপাঠী। হীরু ইস্কুলের সেক্রেটারির 'ভাইপো' বলেই মাষ্টারমশাইরা হীরুকে না-কি পরীক্ষায় প্রথম হতে দিয়েছিলেন,—এই বিশ্বাসের বশে চন্দ্রনাথ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে নিজে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে খবর পেয়ে বড়োই বিচলিত বোধ করে! যাঁকে সবাই মেনে চলেন, সকলে শ্রদ্ধা করেন,—সেই হেডমাষ্টারের সততা সম্বন্ধেও সে তার অশ্রদ্ধা গোপন রাখতে চায় না! এবং তার সেই দোষের জন্যেই বড়ো ভাই নিশানাথবাবু যখন তাকে তিরস্কার করেন, তখন তাঁর সে নিষেধও কানে তুলতে রাজী হয় না চন্দ্রনাথ।

দুই ভাইয়ের মধ্যে চন্দ্রনাথ যেমন একান্ত আত্মপ্রত্যয়ী, তার দাদা নিশানাথ তেমনি কঠিন,- নিজের সংকল্পে তিনিও অটুট থাকতে জানেন। ইস্কুলের এই ঘটনা থেকেই দুই ভাইয়ের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। হেডমাষ্টার ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু চন্দ্রনাথকে নিবৃত্ত করবার উপায় তাঁর আয়ত্তের বাইরে! ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুলো যখন, তখন কিন্তু ইস্কুলের মধ্যে হীরুকেই প্রথম হতে দেখা গেল। ইস্কুল থেকে হীরু বৃত্তিও পেলো! তার এই কৃতিত্ব উপলক্ষে একটা ভোজের আয়োজন হয়েছিল হীরুদের বাড়িতে। তাতে অন্যান্য সকলেই এসেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ সেখানে অনুপস্থিত। বাড়িটায় নিজের অংশ যেটুকু, সেটুকু বেচে দিয়ে গৃহত্যাগী হয়ে গেল চন্দ্রনাথ। তার দাদা-বৌদি দুজনেই সে ব্যাপারে মর্মাহত হলেন। চন্দ্রনাথ এক ধরনের মানুষ, নিশানাথ অন্য ধরনের। এই আঘাতে তাঁকে খুবই কাতর হতে দেখা গেল। কাতর হয়ে ভগবানের নাম করতে বসলেন তিনি!

'আগুন' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রায় শেষ অংশে পৌঁছোনো গেছে ইতিমধ্যে। হীরুর কাছে লেখা চন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতে অতীতের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে দেখতে উপন্যাসের কথক-চরিত্র নরেশ তখন চন্দ্রনাথের কথাই ভেবেছে:

'কল্পনা করিয়াছিলাম, কিশোর চন্দ্রনাথ কাঁধে লাঠির প্রান্তে পোঁটলা বাঁধিয়া সেই রাত্রেও জনহীন পথে একা চলিয়াছে। দুই পাশে ধীর মন্থর গতিতে প্রান্তর যেন পিছনের দিকে চলিয়াছে, মাথার উপরে গভীর নীল আকাশে ছায়াপথ, পার্শ্বে কালপুরুষ নক্ষত্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।'

এই উপন্যাসের সূচনায় যে নক্ষত্রসমাকীর্ণ আকাশের কথা বলা হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ দিকে এইভাবে সেই আকাশ, ছায়াপথ, কালপুরুষ ইত্যাদির কথাই আবার ফিরে এসেছে। অতঃপর আবার এগিয়ে চলেছে আখ্যান।

চন্দ্রনাথের গৃহত্যাগের পরে নিশানাথ গেছেন তীর্থভ্রমণে। নরেশ নিজে চলে গেছে পাটনায়—'মামার বাড়ির সুবিধায়'। হীরু ভর্তি হয়েছে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এবং—'নিশানাথবাবু গ্রামেই ধ্রুবনক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ঋষিমণ্ডলের নক্ষত্রের মত আপন দেবতার তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া গেলেন।'

'চৈতালী ঘূর্ণি'র প্রথম অনুচ্ছেদের সেই—'সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে'—উক্তিটি যেমন বিভিন্ন ঘটনার অন্তরালবর্তী এক স্থায়ী দৃশ্য-সংকেতের কাজ করেছে,—'কালিন্দী'তে যেমন কালী নদী,—'আগুন' বইখানিতে তেমনি এই রাত্রির আকাশ আর নক্ষত্রের প্রসঙ্গ! কিন্তু নিশানাথ বাবু স্থির নক্ষত্র নন! নিশানাথবাবু তীর্থভ্রমণে যাবার পরে তাঁরই স্ত্রীর এবং পুত্রকন্যার অসহায় অবস্থা দেখে নরেশের মনে জেগেছে বেদনা আর প্রতিবাদ! নরেশের সেই সময়কার আত্মকথার একটু নমুনা দেখলেই এ-মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। নরেশ বলেছে: 'সংকল্প করিলাম, নিশানাথবাবুর সহিত দেখা হইলে প্রশ্ন করিব, এই সৌরজগৎটাই কত বড় জানেন? কল্পনা করতে পারেন? কত কোটি সৌরগজৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, আর কত কোটি এখনও অনাবিষ্কৃত ধারণা করতে পারেন?'

তারপর, মাসতুতো বোন শ্যামার মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে মামার অনুরোধে নরেশকে এলাহাবাদ যেতে হয়েছে। সেখানে কেল্লার দিকে চেয়ে চেয়ে নরেশের

মনে দেখা দিয়েছে কবিতার লাইন! সেই এলাহাবাদের গঙ্গাতীরে, অনাবৃত সিক্ত বালুভূমিতেই ছোটো একটি কুঁড়ে-ঘরে নিশানাথবাবুকেও দেখা গেছে। নিশানাথ সেখানে তখন 'কল্পবাস' করছেন! সময়ের স্রোত বয়ে গেছে এইভাবে। হীরু কাশ্মীরে বেড়াতে গেছে। কাশ্মীরে হাউস-বোটে থাকতে থাকতে একটি কাশ্মীরী মেয়ের রূপে বিভোর হয়েছে সে। হীরুর সেই রূপোন্মাদনার কথাসূত্রেই চেকভের প্রসিদ্ধ 'ডার্লিং'-এর স্মৃতি জেগে উঠেছে। হীরু নরেশকে বলেছে :

'একে শুধু মোহই বল কেন? চেকভের ডার্লিং-এর মধ্যে যে বস্তুটা ছিল, সেটা কিন্তু মোহ, না প্রেম-স্নেহ-মমতা? ওই একই বস্তু বন্ধু, একই বস্তু; শুধু প্রকারান্তর। শুধু নারী নয়, নারী পুরুষ সবার মধ্যেই আছেন চেকভের ডার্লিং।'

এর বছরখানেক পরেই হীরুর বিলেত-যাত্রা। সেখান থেকে সেই কাশ্মীরী সুন্দরীর সমস্ত ছবিগুলিই ফেরত পাঠিয়েছে হীরু। অতঃপর নরেশের হাত দিয়ে তারাশঙ্কর যা লিখিয়েছেন, হঠাৎ মনে হয় সে যেন 'বনফুল'-এর লেখা! ও-রকম লেখা যেন 'বনফুল'-ই লিখে থাকেন। নরেশ লিখেছে :

'লিখিলাম—কাশ্মীর রূপসীর মৃতদেহ চিতায় পুড়িতেছে; তাহার প্রণয়ী শ্মশানে পর্যন্ত আসে নাই। আমি তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেছি। অপরূপ রূপ ছাই হইয়া আসিতেছে, আমি নির্নিমেষ নেত্রে তাহাই দেখিতেছি।'

সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থী নরেশের সেই গল্পটির খুবই প্রশংসা হয়েছে।

তারপর দেশ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে প্রবাসী নরেশের কাছে। নরেশের মায়ের কলেরা! মায়ের মৃত্যুশয্যা! মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে তারাশঙ্কর তাঁর আরো অনেক রচনায় উচ্ছ্বাস প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। 'আগুন'-এর এই অংশে তেমনি এক সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি। 'ধাত্রীদেবতা'র মা-কেও মনে পড়ে এই সূত্রে। নরেশের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও যে তাঁর আত্মকথা বলতে পেরেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। নরেশ জানিয়েছে :

'কোন সন্তানের কাছেই নিজের মা অপরের মায়ের চেয়ে খাটো হয় না—স্নেহে তো নয়ই! আলেকজান্দারের মা নগণ্যতম দীনদুঃখীর মায়ের চেয়ে অধিক স্নেহময়ী নন; একথার চেয়ে বড় সত্য কথা

আর নেই। কিন্তু তবু বলিব, গুণে—যে গুণ থাকিলে নারী উপযুক্ততম জননী হইতে পারে, সে গুণে, সে শক্তিতে মায়ের আমার তুলনা ছিল না। হয়তো একথা অপরে বলিবে মিথ্যা, অতিরঞ্জন; কিন্তু আমার কাছে এ সর্বোত্তম সত্য। পাগলের মত দেশে ছুটিয়া গেলাম।'

'ধাত্রীদেবতা'তেও এমনি এক মা, 'কালিন্দী'তেও এমনি 'মা'-বড় মা'র কথা!

নরেশের মাতৃবিয়োগের পরে হীরুর ছোটো ভাই এবং আরো অনেকে সেই একই মহামারীর প্রকোপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথ-বাবু পঞ্চতপা শুরু করেছেন—প্রতি দিন তাঁর পাঁচটি হোমের ব্যবস্থা। হীরুদের বাড়িতে সকলকে হারিয়ে হীরুর কাকা বেঁচে আছেন একা। নরেশের বাবা যে তমস্থকে টাকা ধার করেছিলেন,—নরেশ মুখুজ্যেকে ডাকিয়ে, তিনি সেই কথাই জানালেন—এবং একমাত্র পৈতৃক ভিটেটুকু ছাড়া নরেশের সব সম্পত্তিই এইভাবে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। হীরু গ্রামে ফিরছে শুনেই নরেশ গ্রাম ছেড়ে চলে গেল,—তবে যাবার আগে চন্দ্রনাথের বৌদির সঙ্গে আর একবার তাকে দেখা করতে হোলো। স্বামী নিশানাথবাবুকে বৌদি তাঁর স্নেহে মমতায় ভুলিয়ে রেখেছেন দেখে বৌদির সম্বন্ধে 'বিজয়িনী' নাম দিয়ে একটি গল্প লেখবার সংকল্প দেখা দেয় নরেশের মনে। এবং তার পরেই চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ ক'লাইনে আবার অন্ধকার আকাশ এবং নক্ষত্রের কথা ফিরে এসেছে—'আমার চিত্তাকাশের সমস্ত নক্ষত্রগুলি একে একে অস্ত গেল!'

পঞ্চম পরিচ্ছেদের শুরুতেই আবার নক্ষত্রোদয়! এখানে সে জায়গাটুকু তুলে দেখা যাক। নরেশের কথা:

'পাইয়াছি।

দীর্ঘকালের পর আমার মনোগগন-প্রান্তে আবার কালপুরুষ নক্ষত্রের উদয় দেখিতেছি। চন্দ্রনাথের দেশত্যাগের বারো বৎসর পর, আমার দেশত্যাগের নয় বৎসর পর, সহসা একদিন চন্দ্রনাথের সংবাদ পাইলাম।'

তখন নরেশ সত্যিই লেখক হয়ে উঠেছে। এবং চন্দ্রনাথের সুবিপুল পরিবর্তন দেখানো হয়েছে এই পঞ্চম পরিচ্ছেদের মধ্যেই। কানপুর থেকে হঠাৎ চন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে নরেশ কানপুরে গিয়ে পৌঁছেচে। সেখানে

চন্দ্রনাথের বাগানের ফটক খুলতেই এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নামের ফলক দেখা গেল। নরেশের বিস্ময় বাড়িয়ে দিয়ে দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন চন্দ্রনাথ এসে বলেছে: 'আমি যে শিখ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে উপাধিটাও পাল্টে দিয়েছি।' চন্দ্রনাথের স্ত্রী শিখ-রমণী মীরাও এসেছেন। কিন্তু সেই প্রীতিসম্মেলনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছেন এ-আখ্যানের বিধাতা! পাশের ঘর থেকে ছোটো একটি পোষা কুকুর খুশি হয়ে বেরিয়ে এসে চন্দ্রনাথের কোলে উঠেছে। আর তারই ফলে,—'মুহূর্তে চন্দ্রনাথ যেন পাগল হইয়া গেল, বজ্রমুষ্টিতে সে কুকুরটার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিল।' এবং—'ক্ষুদ্র নিরীহ জীবটা বার কয় পা চাটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। তাহার একটা পা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মুখটায় আঘাত লাগিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।'

'আগুন' উপন্যাসের এই দৃশ্যটি মোটেই মনোরম নয়। চন্দ্রনাথ নিজের নাম বদলে ফেলেছে, তার বিয়ে হয়েছে এক পাঞ্জাবী মহিলার সঙ্গে—সে শিখ হয়েছে,—এবং এই সব পরিবর্তন ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও তার ছেলেবেলার উগ্রতা বজায় আছে! অবিশ্যি সে-উগ্রতারও কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটেছে! নিরীহ কুকুরটাকে গুরুতর ভাবে জখম করে চন্দ্রনাথ নিজের সেই কটু স্বভাবেরই নমুনা দিয়েছে,—এবং তারাশঙ্কর তারই মধ্য দিয়ে এখানে কিঞ্চিৎ চমক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তবে, চন্দ্রনাথ নিজেই আবার কুকুরটাকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে গেছে। তারপর সেই অস্বস্তিজনক অবস্থাটা হালকা করবার জন্যেই নরেশ মীরাকে জিগেস করেছে তাদের 'খোকন'-এর কথা। সুন্দর খোকাটিকে দেখে খুশি হয়েছে নরেশ। মীরা জিগেস করেছে—'বলুন তো দোস্ত্‌, ববুয়া আমার কেমন আদমি হবে? খোকন যখন বড় হবে তখন দুনিয়া ওকে ভালবাসবে, না ভয় করবে?'

চন্দ্রনাথ যে খুবই খেয়ালী ধরনের মানুষ, সেদিন সে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবার পরে সে-কথা তার নিজের মুখ থেকেই শোনা গেছে। মীরার সেবা খুবই আন্তরিক। তবু দু'চুমুক মাত্র চা খেয়েই চন্দ্রনাথ সেটা বিশ্রী বলে ফেলে দিয়েছে। সে-অবস্থায় নরেশের মনে স্বভাবতঃই একটু সন্দেহ দেখা দেয়—'বুঝিতে পারিলাম না. কিসে সহসা চন্দ্রনাথের সমস্ত বস্তু এমন বিস্বাদ করিয়া দিল। চন্দ্রনাথ কি আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই?'

ইতিমধ্যে মালী এসেছে ফুল দিতে। তাতে, অকারণে রেগে উঠেছে চন্দ্রনাথ। কিন্তু কুকুরের নির্যাতন,—চায়ের নিন্দা,—মালীকে কটূক্তি,—চন্দ্রনাথের সেদিনকার শেষ অনুষ্ঠানটির সঙ্গে তুলনা করে দেখ্‌লে,—তার পাশে এ সবই তুচ্ছ মনে হবে। তার দাড়ির বাহুল্য সম্বন্ধে নরেশ তাকে একটু ঠাট্টা করেছিল বটে। সে-কথা শুনে চন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তেই দাড়ি কামিয়ে ফেলতে বসে যায়! এবং—'কামাইতে কামাইতে বলিল শিখধর্মের মধ্যে একটা বিক্রম আছে। বোধ হয়, সেই জন্যেই ওই ধর্ম তখন নিয়েছিলাম! নইলে বিবাহ তো অন্য যে কোন ধর্ম অনুসারে হতে পারত। দাড়িগোঁফহীন ধর্মের তো অভাব নেই।'

উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ এইখানেই শেষ হয়েছে। পরের পরিচ্ছেদে, গঙ্গাতীরে দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্যে চন্দ্রনাথকে বলতে শোনা গেছে:

'আজ জীবনের অপব্যয়ের জন্যে আমার আক্ষেপ হচ্ছে নরু। তোর খ্যাতি, তোর প্রতিষ্ঠার জন্যে আমার হিংসে হচ্ছে। সকালে বোধ হয় এই জন্যেই আমি হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। ওই নিরীহ কুকুরটার ওপর পর্যন্ত নির্মম হয়ে উঠেছিলাম!

...অথচ এটুকু খ্যাতি, এটুকু প্রতিষ্ঠা আমার গ্রহণযোগ্যই নয়। আই. সি. এস্ হবারও চান্স পেয়েছিলাম, কিন্তু নিই নি। দাসত্ব—সে যত বড়ই হোক সে দাসত্বই।'

চন্দ্রনাথ যে ইতিমধ্যে যুদ্ধেও গিয়েছিল, সে কথাও জানা যায়। যে গ্রামে তার জন্ম, কেবল সেই গ্রামটুকুকেই নিজের জন্মভূমি ভেবে নিতে সে নারাজ! পৃথিবীর বিপুলতা তার বোধের অগোচর নয়। সে জেনে এসেছে যে, সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতায় দাসত্ব, হত্যাকাণ্ড, বর্বরতা তো আছেই,—আর, 'সেল্‌ফ্ বলে কিছু নেই সেখানে—মানুষ নেই, মনুষ্যত্ব নেই, আছে শুধু শৃঙ্খলা, ডিসিপ্লিন। কিন্তু আশ্চর্য, তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব মুহুর্মুহু আকাশস্পর্শী মিনারের মত রূপ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করছে।' চন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় প্রথম যেদিন গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, হীরুর ওপর সেদিনকার হিংসা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ তার পরবর্তী জীবনের কাহিনী শোনাতে থাকে! অন্ধকার, নির্জন রাত্রে মাঠের পাথুরে মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে, নক্ষত্রের আলোতে পথ দেখে—বর্ধমান, মানভূমের মধ্য দিয়ে টাটানগরের দিকে এগিয়েছিল সে। টাটানগরে তার চাকরি শুরু হয়। কারখানার প্রকাণ্ড চুল্লীর ঢাকনা খুলে

কাজ করতে হোতো তাকে। অদৃষ্টচক্রে সেই কারখানা-জীবনের বিচিত্র ঘটনার মধ্যেই চন্দ্রনাথের সামনে অপ্রত্যাশিত এক দুর্যোগ বা সুযোগ এসে হাজির হয়! তার নিজের কথা থেকেই সে বৃত্তান্ত বিশদভাবে জানা যায়:

'একটা অ্যাক্সিডেণ্টে আমার উন্নতির পথ সেখানে খুলে গেল। রোলিং মেশিন হাউসে একটা কাজে আমি গিয়েছিলাম। রোলিং মেশিন অবিরাম ঘুরছে, তারই বেগে আগুনের মত রাঙা স্টীলের বীম এগিয়ে চলেছে, মধ্যে মধ্যে মেশিনে পিটে কেটে ইচ্ছামত আকার করে নিচ্ছে। সেইখানে মাথার ওপর ইলেক্ট্রিক ক্রেনে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল আর একটা জলন্ত লোহার বীম; হঠাৎ বীমটা ক্রেন থেকে খসে নিচে পড়ে গেল। সেখানে কাজ করছিল একটা পাঠান লেবারার, তারই ওপর পড়লো। সে একবার মাত্র চীৎকার করেছিল বাঁচা-ও। একজন ছোকরা বাঙালী ভদ্রলোক, ওভারম্যান তিনি, সুইচের চার্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাগলের মত ছুটলেন ওই লোক-টাকে বাঁচাতে। আমি কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারতাম যদি তাঁকেই ধরতাম। কিন্তু ওদিকে তখন সুইচ যদি বন্ধ না করি তবে রোলিং মেশিনে ভয়ানক ক্ষতি হয়। নিচে রোলিং মেশিনে হয়েছে কি,—একটা বীম কেমন করে বেঁকে, দুটো রোলারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি ছুটে গেলাম সুইচের কাছে। আর এ ভদ্রলোক নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাঁর, একটা লোহার পাতে জুতো পিছলে তিনি এসে পড়লেন সেই জলন্ত বীমটার ওপর। দুজনেই মারা গেল। আমি সুইচ অফ করে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। চমক ভাঙল সাহেবের পিঠ চাপড়ানিতে। বললে, আশ্চর্য নার্ভ তোমার! চান্স পেয়ে গেলাম, কিছু দিনের মধ্যেই একটা পরীক্ষা দিয়ে ওভারম্যান হলাম।'

টাটানগর কারখানায় সাধারণ একটা মানুষের চেয়ে অসাধারণ এক-একটা যন্ত্রের দাম অনেক বেশি! সেদিন গঙ্গাতীরে নরেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে চন্দ্রনাথ বলেছে—'তুই শুধু ভাবছিস, ওটা একটা যন্ত্র; কিন্তু আমার চোখে মনে হয়, ব্রহ্মলোকের একটা অংশ প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হয় সেখানে।'

সেই টাটানগর অধ্যায়ের পরে যুদ্ধে যোগ দেবার সুযোগ এসেছিল চন্দ্রনাথের জীবনে। রবীন্দ্রনাথের কয়েক লাইন কবিতার সাহায্য নিয়ে বন্ধুকে সে তার অনুভূতির কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। আর বলেছে—'সেদিন কল্পনা করেছিলাম কি জানিস, কি হবে এ কারখানায় পাঁচশ সাতশো কি হাজার টাকা মাইনের চাকরি করে? আর এ বিপুল একটা বাহিনীর শীর্ষে বসব আমি, সম্মুখে টেবিলের ওপর থাকবে ফিল্ডের ম্যাপ, আশে-পাশে সারি সারি টেলিফোন। সংবাদ আসছে, আর ছোট ছোট আলপিনের পতাকাগুলি তুলে তুলে বসাচ্ছি।'

'আগুন' উপন্যাসে—এই পৌনঃপুনিক চমক-উৎপাদনের উৎপাতের মধ্যেই—এই জায়গায় এসে হঠাৎ সংকেতভাষী তারাশঙ্করের কবিকর্মের পুনরাবির্ভাব চোখে পড়ে! কানপুরের গঙ্গায় তখন সূর্যাস্তের লাল রঙ। অহংকারী, দাম্ভিক, ঈর্ষাপ্রবণ, প্রতাপশালী চন্দ্রনাথ তার আত্মকথা শোনাতে শোনাতে,—প্রতাপ এবং প্রভুত্বের কোন্ স্বর্ণবর্ণ মদিরার কথা ভাবতে ভাবতে—একবার চুপ করেছিল। সেই অবকাশে তারাশঙ্কর এইটুকু যোগ করেছেন:

'এই সময় চন্দ্রনাথের স্মৃতির সহিত সম্বন্ধহীন একটি ঘটনা সেইদিন ঘটিয়াছিল; সেটুকুও আজ মনে পড়িতেছে। কেমন করিয়া মালার সঙ্গে যেন বাড়তি একটি ফুল গাঁথিয়া উঠিয়াছে। আকাশে সেদিন পাতলা স্তরের মেঘ ছিল। অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মি সে স্তরমেঘের উপর যেন আবীর ছড়াইয়া দিল। মধ্য আকাশ পর্যন্ত রঙিন ওপারের ক্ষেতে রক্তসন্ধ্যার আভা, গঙ্গার বুকে যেন গলিত সোনার ঢল নামিয়াছে।

চন্দ্রনাথের বাংলোর পাশেই কানপুর ওয়াটার ওয়ার্কসের পাম্পিং স্টেশন:

'ছোট একটি বাঁধানো ঘাট, ঘাটের উপরেই বাগান, রাঙা—গোলাপের সমারোহ—শুধু তাহার উপর রক্তসন্ধ্যার আভায় রাঙা রঙ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। বেশ দেখিতেছি ঘাসে বসিয়া আছেন এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক, আর তাঁহার শিশুকন্যা—বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে। সহসা মেয়েটি ছুটিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিল, এক আঁচল জল তুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে

দেখিয়া ফেলিয়া দিল। আবার এক আঁচল তুলিল, আবার ফেলিয়া দিল। আবার তুলিল।

'ভদ্রলোক মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, কি করছ তুমি? হাতের অঞ্জলির জল দেখিতে দেখিতে মেয়েটি সকরুণ স্বরে বলিল, জলের সোনা কোথায় গেল বাবা?

'জলের স্বর্ণবর্ণও ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সূর্যের একফালি মাত্র তখন আকাশে ছিল।

কানপুরের সেই গঙ্গাতীরে সেদিন আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল। চন্দ্রনাথের স্ত্রী মীরা সেদিন গাঢ় লাল রঙের শাড়ি আর ব্লাউজ পরে নরেশ আর চন্দ্রনাথের জন্যে চন্দ্রপুলি নিয়ে এসেছিলেন। মীরার সেই বেশ দেখে তাঁর স্বামীর বন্ধু তাঁর সেই শাড়ি পরবার ভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন। একদিন ফতেপুরসিক্রির মেলাতে মীরার সেই লাল শাড়ির ভঙ্গিটি চন্দ্রনাথেরও ভালো লেগেছিল। সেই স্মৃতির সঙ্গে নরেশের সেদিনকার প্রশংসার কথাগুলি চন্দ্রনাথের মনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আর-এক ঝড় তুলেছিল। তারাশঙ্করের নিজের কথাতেই এখানে সে অংশটুকু স্মরণ করা যাক্ঃ

'চন্দ্রনাথ বলিল, ও পোষাক তুমি পাল্টে এস। ও পোষাক পরে তুমি আমি ছাড়া আর কারও সামনে এসো না।

মীরা অপরাধীর মত নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথও উঠিয়া পড়িল।'

নরেশ মীরাকে চলে যেতে দেখলেন। বলিষ্ঠ পায়ের ভারি জুতোর শব্দ শুনে মুখ ফেরাতেই নরেশের চোখে পড়লো যে, চন্দ্রনাথ মীরার অনুসরণ করছে! তখন—

'শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম, মীরার উপর দুর্ব্বহার করিবে না তো? পর্দার অন্তরালে আলোকিত কক্ষমধ্যে মীরা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পর্দার বুকে তাঁহার ছায়া আমি দেখিতে পাইতেছিলাম, তিনি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পর্দা বাতাসে দুলিতেছিল, কিন্তু ছায়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির গতিহীন। চন্দ্রনাথও পর্দা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সবল ভ্রূক্ষেপহীন গতিবেগে এবার পর্দাটা একদিকে সরিয়া গিয়া জড় হইয়া গেল। আমার

চোখের সম্মুখে আলোকিত কক্ষটার একাংশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ দুর্ব্যবহার কিছু করিল না, মীরাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। মীরার মুখের উপর তাহার মুখ নামিয়া আসিতেছিল। আমি উদ্বেগ অপসরণের আনন্দে সুস্থ হইয়া গঙ্গার বক্ষস্পর্শী অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইলাম। দিগ্বলয় হইতে অন্ধকার আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।'

'কবি' উপন্যাসে কবিয়াল নিতাইচরণকে যেমন কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দেখা গেছে,—সেখানকার সুখদুঃখের নানান পরিস্থিতি আর অজস্র চরিত্র—রাজালাল বায়েন, বায়েনের বউ, বায়েনের শ্যালিকা,—'ঠাকুরঝি', মহাদেব আর মহাদেবের দোয়ার, নিতাইয়ের মামা—জেল-ফেরত গৌরচরণ, ঘনশ্যাম গোঁসাই আর তাঁর নিঃসন্তানা স্থূলকায়া গৃহিণী,—তাঁদের বাড়িতেই রাতের অন্ধকারে দেখা চারজন ধানচোর,—রেলস্টেশনের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' আর তার দোকানে 'সজীব-বিজ্ঞাপন' বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ,—দৃষ্টির আড়ালে থাকা ঠাকুরঝির স্বামী,—এদিকে ঢোল, টিনের তোরঙ্গ, কাঠের বাক্স, পোঁটলা, নানান আসবাব-সমেত বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত ঝুমুরের দল এবং সেই দলেরই ঝুমুরওয়ালী বসন, ললিতা, নির্মলা,—সেই দলের প্রৌঢ়া নেত্রী আর মোহন্ত,—গ্রামের স্টেশনের কাছেই 'ঠাকুরঝি'র নানা সুখস্মৃতি-বিজড়িত সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি—আর, বসনের মৃত্যুর পরে রাত ভোর হবার প্রহরে চোখ খুলতেই চোখের সামনে জেগে-ওঠা গঙ্গা শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা, কুকুরের পাল,—আর সে উপন্যাসের একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে (একুশ) ঝুমুরের দল দেশে ফিরে যাবার পরে নিতাইয়ের কাশী-প্রবাস,—সেখানে কোনো এক মা-ঠাকরুণের সঙ্গে কয়েকটি কথা, কয়েকটি গান,—আবার দেশে ফেরা,—রানীগঞ্জ পার হয়ে বর্ধমান,—বর্ধমান থেকে গাড়ি বদল করে বাকি ঘণ্টা-দুয়েকের পথ,—তারপরেই তার আপন গ্রাম,—সেই গ্রামে ফিরে রাজালাল বায়েনের মুখেই প্রথম ঠাকুরঝির মৃত্যু সংবাদ শোনা,—'কবি'র এইসব ঘটনা, চরিত্র, সংঘট বা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিতাইচরণকেই যেমন কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দেখা গেছে,—'আগুন' বইখানিতে তেমনি চন্দ্রনাথই প্রধান! 'কবি'র শেষ দৃশ্যে কবি যে কেবল 'ঠাকুরঝি'র ভাবনাই ভেবেছিল, তা নয়। নিতাইয়ের কবি-দৃষ্টিতে রাজালাল, বসন, কাশীর মা-ঠাকরুণ—এঁরা সকলেই

বিদ্যমান ছিলেন! জীবনের সমস্ত ভালোবাসার কথা,—সমস্ত ফুল, মাটি, নদীর স্মৃতি—সেই শেষ দিনের চূড়ান্ত গানটিতে এসে মিশেছিল—

এই খেদ আমার মনে মনে
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলালনা এ জীবনে!
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?

'আগুন'-কাহিনীতে চন্দ্রনাথই তেমনি কেন্দ্রীয় চরিত্র। 'কবি' বইখানিতে নিতাইচরণের সঙ্গে 'ঠাকুরঝি' আর 'বসন—এই দুটি নারীকে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কিন্তু 'আগুন'-কাহিনীতে চন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে উঠেছে মীরা,—হীরুকে আচ্ছন্ন করে মহিমান্বিতা হয়ে উঠেছে যাযাবরী 'চিত্রাঙ্গদা'! চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথ তো গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে শেষ পর্যন্ত শ্মশানে গিয়ে তীর্থ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ততা ঘটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, নরেশের সেই 'অন্নপূর্ণা'-বৌদি দারিদ্র্যের আঘাতে,—ক্ষতিতে,—সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন! তারাশঙ্কর তাঁর এই চন্দ্রনাথকে যেন আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি করে গড়েছেন! সে বাল্যে গৃহত্যাগী, কৈশোরে পথিক-বাউল, যৌবনে কখনো টাটানগর-কারখানার উৎসাহী কর্মী,—কখনো মেসোপো-টেমিয়ার বাঙালী পল্টন,—কখনো সে সহজেই আই-সি এস্ এর সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে,—ফতেপুর সিক্রির মেলায় গিয়ে শিখ-যুবতী মীরার রাঙা শাড়ির মোহে বিবশ হয়ে আচম্বিতে তাকে বিয়ে করে বসে,—কানপুরে বিরাট মোটর-মেরামতের কারখানা খোলে,—শিখ-ধর্মের মধ্যে একটা বিক্রম আছে মনে করে সে স্বধর্মত্যাগী দাড়িওয়ালা শিখ হয়,—আবার অচিরেই হঠাৎ এক রাত্রে দাড়ি কামিয়ে ফেলতেও তার দ্বিধা নেই! কানপুরের কারখানা বেচে দিয়ে, সে তার আকাঙ্ক্ষার ঘোড়ায় চেপে ধানবাদে এসে পৌছোয়! সেখানে 'চন্দ্রপুরা ফায়ার ব্রিক্স্ অ্যাণ্ড পটারীজ্ ওয়ার্কসে'র মালিক হয়ে উঠতেই বা বাধা কিসের? তারাশঙ্করের স্বভাব-রোম্যান্টিক মনের চড়া আবেগের উত্তাপে তৈরী তার কাঠামো! মীরাও তাই, হীরুও তাই, যাযাবরী চিত্রাঙ্গদাও তাই! সন্ন্যাসী নিশানাথও তার ব্যতিক্রম নন। ঐশ্বর্যে, উল্লাসে, দেহরাগে তিনি চমকপ্রদ নন বটে। তবু তিনিও একই বিধাতার সৃষ্টি! তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে কৃচ্ছ্রসাধনের রোম্যান্স,—হীরুর মধ্যে যেমন মদ্যপানের! কাহিনীর শেষে পৌছে অতি-ভোগে হীরুর

বন্ধ্যা হয়েছে,—তখনো সে তার প্রণয়িনী বাজিকর-কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে ত্যাগ করে নারী-সঙ্গসুখের জন্যেই য়ুরোপে চলেছে! সন্তান-সুখের চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষাতেই বহু-বেদনায় হীরুকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে চিত্রাঙ্গদা তার পুর্ব-জীবনে, পুর্ব-সমাজে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। দেনার দায়ে চন্দ্রনাথ তার নতুন কারখানা এক মাড়োয়ারীর কাছে বেচে দিয়ে কলকাতায় এসে ফাট্‌কা খেলছে,—আর, তার স্ত্রী মীরা তখন এই প্রতাপশালী, প্রভুত্বমদিরালিপ্সু বাঙালী স্বামীর খামখেয়ালীপনায় অভিভূত হয়ে বুদ্ধিভ্রংশতায় ভুগছে! এ-ছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। এ কাহিনীর কথক নরেশ নিতান্তই সমবেদনাবশে নিশানাথের কন্যা নিরুপমাকে বিয়ে করেছে! বিরাট কারখানার বিপুলতা,—শিখ-বাঙালীর এবং বাঙালী-যাদুকরীর প্রণয়,—সাপ, বিল, সরাল, ডাহুক,—শ্মশান, সন্ন্যাসী, শৃগাল, অজগর—নানান্ প্রিয় এবং চমকপ্রদ উপকরণের ঐশ্বর্য হাতে নিয়ে তারাশঙ্কর এই 'আগুন' রচনায় উদ্যত হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথের উচ্চাশার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে চন্দ্রনাথের মুখে তিনি নুট্ হাম্‌সুনের 'গ্রোথ অব্ দি সয়েল' বইখানির নাম উল্লেখ করিয়েছেন একাধিকবার। তাছাড়া এ-উপন্যাসের প্রথম দিকে হীরুর মুখে একবার 'চেকভের ডার্লিং'-এর নামও শোনা গেছে। সে-কথা আগেই বলা গেছে। এই সব মনন-উপকরণের সমবায়ে এবং তারাশঙ্করের স্বভাবধর্মের সহজ পরিচর্যায় এ-কাহিনী তাঁরই নিজস্ব নির্মিতি হয়ে উঠেছে।

তবে, বিশ্বাস্য বাস্তব উপন্যাস হিসেবে 'আগুন' সত্যিই তুচ্ছ রচনা। এবং জীবনে কোন্‌টা বিশ্বাসযোগ্য, আর কোন্‌টা যে তা নয়, সে-বিষয়ে তর্কের পথ কণ্টকাকীর্ণ! শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' কাহিনীর মোহাকর্ষণে হয়তো তাঁর মন তখন আচ্ছন্ন ছিল। হয়তো রাশি রাশি অবিশ্বাস্য ব্যাপার সত্যিই তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়েছে! হয়তো চন্দ্রনাথের স্ত্রী মীরা যে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর মতো শান্ত হতে পারেননি, এ-উপন্যাসে সেইটেই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব ব্যাপার! পনেরোর অধ্যায়ে স্বল্পঘন পলাশ, শাল, মহুয়ার বসন্তবিপিনে নরেশের সঙ্গে মীরার পাথরে পাথরে হরিণীর মত লাফ-ঝাঁপের ছবি হয়তো সত্যিই অবিশ্বাস্য নয়! মীরার মস্তিষ্কের গোলমাল তখন শুরু হয়ে গেছে। সে-অবস্থায় সবই সম্ভব, সবই ঘটতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। ১৩৩২-এ অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সবুজপত্রে' তিনি 'গল্পলেখা' নামে তাঁর একটি লেখা ছেপেছিলেন। তাতে দুই পক্ষের সংলাপের মধ্যে

দিয়ে গল্প-রচনার বিষয়গত বিশেষ আবশ্যিকতা এবং এই শিল্পে প্রেরণা-অপ্রেরণার প্রয়োজনীয়তা,—আর ইংরেজি গল্পের সঙ্গে বাঙালী জীবনের বাস্তবতা-অবাস্তবতার সম্পর্ক উল্লেখ করে কয়েকটি কথা বলা হয়েছিল। এই সূত্রে সে-সব কথা অবশ্যই মনে পড়ে! এখানে তাঁর লেখার সেই অংশটুকু তুলে দেওয়া গেল :

—'তা ঠিক, কিন্তু এই জীবন জিনিষটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্ততঃ ছোটগল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়। আর সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যা নিত্য ঘটে, এ দেশে তা নিত্য ঘটে না।'

—'এখানেই তোমার ভুল। যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না; ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে আর কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়,—যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।'

প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের এই উক্তিতে অবাক হয়ে জিগেস করেছিলেন, 'তা হলে তোমার মতে গল্প মাত্রই রূপকথা।' দ্বিতীয় পক্ষ বিনা দ্বিধায় জবাব দিয়েছিলেন, 'অবশ্য।' তখন দ্বিতীয় পক্ষই রূপকথা আর গল্পের প্রভেদটুকু ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন—'রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব বলে মানি।'

সে যাই হোক, 'আগুন' উপন্যাসের আশ্চর্য কতকগুলি ছবির সুখস্মৃতি কিছুতেই ভোলা যায় না। তা ছাড়া তারাশঙ্করের জীবন-জিজ্ঞাসার মূলগামী কয়েকটি প্রশ্নোত্তর আছে কাহিনীতে। আরো পরের পর্বে 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর মধ্যে জীবন-মৃত্যু-সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর আরো নানা রচনায় মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর যে একান্ত অভিনিবেশ দেখা গেছে, এ-কাহিনীতে সে-প্রসঙ্গও একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে। হীরু মৃত্যুবাদী! বার বার সে মৃত্যুর কথাই বলেছে। মৃত্যু-ভাবনা এ-কাহিনীর অন্তর্বর্তী একটি স্থায়ী ভাবনা। আবার, 'আরোগ্য নিকেতনে' মানুষের ভোগ-লালসার যে-ছবি দেখা গেছে, এ-কাহিনীর দশম পরিচ্ছেদে তারই পূর্বাভাষ দেখা যায় শিকার-প্রসঙ্গের মধ্যে—সেই যেখানে বিকলাঙ্গ, পেশাদার এক চোরকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আধপোড়া একটা ছাগল-ছানা

খেতে দেখা গেছে! তা'ছাড়া এ-কাহিনীর প্রকৃতি-বর্ণনার ঐশ্বর্যও ভোলবার নয়। কতো যে আশ্চর্য কবিত্ব, কতো সুন্দর সাদৃশ্য তাঁর কলমে এসে যায়! এই বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবেই বলা দরকার। আকাশের কালপুরুষের সঙ্গে চন্দ্রনাথের সাদৃশ্য,—বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর সঙ্গে মীরার,—মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে এ-উপন্যাসের বাজিকর-কন্যার—এই সব সাদৃশ্যের ধ্যান তারাশঙ্করের স্বকীয় ব্যাপার! এ-ক্ষেত্রে তিনি নিজেই যেন নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাঁর প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসগুলি এই ধরনের সাদৃশ্য-চিন্তার বহু বিচিত্র দৃষ্টান্তে সমৃদ্ধ। নানা ছড়া এবং গানের মধ্যে তো বটেই, তা'ছাড়া গদ্যবাহনে বাহিত বর্ণনাংশের মধ্যেও তাঁর কবিমনের এই স্বকীয়তার চিহ্ন ফুটেছে। তারাশঙ্করের সেই সামর্থ্যের উদাহরণ হিসেবে এখানে এই রকম কয়েকটি অংশের উল্লেখ করা গেল :

১। নিতাইয়ের সঙ্গে 'ঠাকুরঝি'র প্রণয় সন্দেহ করে 'ঠাকুরঝির' আত্মীয়-স্বজন যখন ভূত তাড়াবার নামে তার ওপর বিভিন্ন উৎপীড়ন শুরু করে, সেই সময়ে নিতাই দেশ ছেড়ে ট্রেনে উঠে দেশান্তরে চলেছে। 'কবি' উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের সূচনাতেই সেই যাত্রার বর্ণনাটুকু চোখে পড়ে। সেখানে তারাশঙ্কর লিখেছেন,—'ট্রেনখানা চলিতেছিল দক্ষিণমুখে। বাঁ পাশে পূর্বদিগন্তে চতুর্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল—আকাশে মেঘের আভাস দেখা দিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণের আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে। নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকেই চাহিয়া ছিল।'

২। বিপক্ষ দলের কবিয়াল নিজে বৃন্দেদূতী হয়ে নিতাইকে কৃষ্ণ করে খণ্ডিতা নায়িকার দূতীর ভূমিকায় গান শুরু করেছিল। তারপরেই খেউড় আরম্ভ হয়। নিতাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। মনে হয় বসন বুঝিবা এই খেউড় শুনে ধৈর্য হারাবে। কিন্তু সেদিন দলের কোনো মেয়েই মদ খায়নি। বসনের সুস্থ দৃষ্টি নিতাইয়ের খুবই ভাল লাগে। 'কবি' উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদের এই জায়গায় তারাশঙ্কর লিখেছেন,—'অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের। চোখে

মদের নেশায় আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মত রাঙা এবং ধারাল হইয়া উঠে।' পর পর দুটি উপমাই আশ্চর্য।

৩। সেই রাত্রির পরে,—সতেরোর পরিচ্ছেদে—সকালে নিতাইয়ের আর এক রকম অভিজ্ঞতা : 'সকালে নিতাই যখন উঠিল, তখন তাহার মুখের স্বাদ হইতে চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত তেতো হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্বাসের সঙ্গে একটা বীভৎস দুর্গন্ধ নাকে আসিয়া ঢুকিতেছে। সর্বাঙ্গ যেন ক্লেদাক্ত। শীতের প্রারম্ভ—তাহার উপর সকালবেলা—এই শীতের সকালেও তাহার মৃদু মৃদু ঘাম হইতেছে। মাথার মধ্যে অত্যন্ত রূঢ় একটা যন্ত্রণা—সমস্ত চেতনা যেন গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত মাঠের ধূলায় আচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর। বুকের ভিতর হইতে জিভের ডগা পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।' তাঁর এ উপমাও বিশিষ্ট, সন্দেহ নেই।

৪। কুড়ির পরিচ্ছেদে—গঙ্গাতীরে সেই রূপোপজীবিনী বসন্তের শব-দাহের পরে : 'সারারাত্রি বালুচরের ধার ঘেঁসিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল-কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু, কখনও মৃদু; আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল; গঙ্গার ওপারে শড়কটায় কত গরুর-গাড়ি গেল; গাড়ির নিচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন-চারিটার মত মনে হইল; সারারাত্রি জোনাকিগুলা জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলি বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল; গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মত। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্তের জন্য কোন কিছুর মধ্যে বসন্তের আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম হইল না। আকাশের তারাগুলা পুব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল; পুর্ব আকাশে শুকতারা উঠিল।'

প্রিয়-বিয়োগ বেদনার গভীর অন্তরালোড়নের সঙ্গে বাইরে প্রকৃতির স্তব্ধ দৃশ্যপটে শব্দহীন পরিবর্তনের রূপটি এখানে পরমাশ্চর্য হয়ে উঠেছে।

৫। 'আগুন' উপন্যাসে অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষে, মীরা-চন্দ্রনাথের শিশু-সন্তান কুমারকিশোরের অন্নপ্রাশনের সঙ্গেই মীরা-চন্দ্রনাথ কাহিনীতে বেশ কয়েক পরিচ্ছেদের জন্যে ছেদ পড়েছে। নবম পরিচ্ছেদের সূচনায় দেখা গেছে যে, চন্দ্রনাথ তার কানপুরের মোটর-কারখানা বেচে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। ইতিমধ্যে মীরার একখানি চিঠি এসেছে বটে, কিন্তু সে চিঠির পরে তারও আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় কলকাতায় নরেশ তার মেসে বসে, মনে মনে মীরা-চন্দ্রনাথের পরবর্তী কাহিনী-কল্পনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই দুটি চরিত্রের পরিবর্তে,—নরেশের দৃশ্যলোকে এবং এই উপন্যাসের আখ্যানপটে—এই ঘটনার অনতিকাল পরে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিয়েছে নরেশের বাল্যবন্ধু হীরু! নবম পরিচ্ছেদে মীরা-চন্দ্রনাথ কাহিনীর সাময়িক বিরতি একদিকে,—অন্যদিকে হীরু-কাহিনীর সূচনা। সেই সন্ধিতেই পট-পরিবর্তনের স্মরণীয় কৌশল দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। সেই অল্প কয়েকটি অনুচ্ছেদের মধ্যে তাঁর কবিমনের পরিচয়ও উদ্‌ভাসিত হয়েছে। বনফুলের সঙ্গে এই জায়গায় তাঁর রীতিগত সমধর্মিতার চিহ্ন আবার যেন অনুভব করা যায়। তিনি লিখেছেন: 'আঃ, আবার জানালাটা খুলিয়া গেল। এক ঝলক তীক্ষ্ণ-শীতের বাতাস দেহটাকে কাঁপাইয়া দিল। চিন্তাসূত্রও ছিন্ন হইয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া পথ-প্রদীপের আলো আসিয়া আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রহস্যময় ছায়াপটখানি ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। জানালাটা ছিটকিনি আঁটিয়া বন্ধ করিবার সঙ্কল্প লইয়া উঠিলাম। খোলা জানালাটা দিয়া চোখে পড়িল—শহরের ধোঁয়া ও আলোর আবরণের উপর নৈশ আকাশ অস্পষ্ট। কোটি কোটি বৎসরের তপস্যার মত কত অসংখ্য নক্ষত্র যে আলোকের বার্তা পৃথিবীর বুকে পাঠাইয়াছে। সে আলো ঐ আলোকিত ধূমচন্দ্রাতপের আড়ালে হারাইয়া গিয়াছে। শুধু পশ্চিম-গগনপ্রান্তে ঐ চন্দ্রাতপ বিদীর্ণ করিয়াও ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—ভেনাস, শুকতারা। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়, ঈষৎ নীলাভ জ্যোতি। জানালাটা বন্ধ

করিয়া দিয়া আবার আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার কক্ষ, মনের ছায়াপট যেন কায়া গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।···কাল ও সাদা রঙের পক্ষপুটে ভর করিয়া কাল উড়িয়া চলিয়াছে। দুই বৎসরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সে আমার মন-বনস্পতির শীর্ষদেশে বিশ্রাম করিল।' এও তারাশঙ্করের নিজস্ব রীতি—এও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি!

৬। 'আগুন' উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে যাযাবরী বাজিকর-কন্যার সুগঠিত দীঘল দেহের নৃত্যভঙ্গি উপভোগের পরে বৈশাখের প্রথম দিনে হীরুর সঙ্গে নরেশ শিকারে গেছে—শঙ্খপতির বিলে। বিস্তৃত বিলের চারপাশে উলুখড় আর কাশের গুল্ম, বিলের জলে পদ্মলতার কোমল কিশলয়, আকাশে নানা জাতের পাখি। সেই সরাল আর ডাহুকের দল দেখে এই দুই শিকারী প্রলুব্ধ হয়। তারপর অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ! আকাশে উড়ে-চলা সরালের ঝাঁক থেকে কয়েকটি পাখি ঝরাপাতার মতো মাটিতে পড়ে যায়! —না, মাটিতে নয় জলে। সেই অংশে :

'হীরু বলিল, কিছু না, চল। পাখিগুলো জলের ওপর পড়েছে। যাক, মা ফলেষু কদাচন—শাস্ত্র-বাক্যটা স্মরণ করতে করতে চলে যাই।

'মন কিন্তু আমারই মানিল না, জীবনে হত্যাকাণ্ডের প্রথম পুরস্কার এই শবদেহগুলি ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম, আমিই বিলের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি।

'আকাশ থেকে ফুল পাড়ল্যা গো বাবু, ফুল পড়ল জলে? হায় হায় হায়!

'পিছন ফিরিয়া দেখি, সেই বাজিকরদের মেয়েটা পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।'

৭। তারাশঙ্করের একেবারে প্রথম দিকের গল্প 'হারানো সুর'-এর মধ্যেও তাঁর এই ধরনের রূপক-উপমা-সংগীত-বিলাসী কবি-মনের অভিব্যক্তি দেখা যায়। তেরশ পঁয়ত্রিশ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'কল্লোলে' তাঁর 'হারানো সুর' গল্পটি ছাপা হয়। তাতে ননী পাল আর তার স্ত্রী গিরি—এই দুটি চরিত্রের দাম্পত্য সম্বন্ধের কথাই প্রধান। ননীর ঝোঁক ছিল বাঁশিতে, একতারায়। কিন্তু তার স্ত্রী গিরি স্বামীর এই শিল্পবিলাস সমর্থন করেনি বলেই ননী

সে-চর্চা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অনেকদিন পরে কোনো এক মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে গ্রামের বাবুদের উৎসব-মণ্ডপে যখন সংকীর্তনের আয়োজন হয়, তখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমাভিনয়ের গান শুনে গিরির সমস্ত মন বিহ্বল হয়ে ওঠে। 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'—'ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি'—এই সব গান শুনে—'গিরির অন্তরের অরূপ কামনা অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রে বাড়ি ফিরিল পুষ্পিত উদ্যানের মত মাতাল মন লইয়া।' এ-উপমাও স্মরণীয়।

উপমা প্রয়োগের এই বিশেষত্বই তারাশঙ্করের স্বভাব। তাঁর লেখাতে অতিকথন, পুনরাবৃত্তি, বাহুল্য ইত্যাদি দোষ যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর রীতিগত স্মরণীয় যেসব বিশেষত্ব ইতিহাসে জায়গা পাবে, তারই মুষ্টিমেয় উদাহরণ হিসেবে এখানে পর পর তাঁর বিভিন্ন পর্বের কয়েকটি রচনা থেকে তাঁর সাদৃশ্য-চিন্তা এবং কবি-কল্পনার কিছু নমুনা সাজিয়ে দেওয়া হোলো। তাঁর অনুরাগী পাঠকের কাছে এ-সব সত্যিই চিরস্মরণীয় সামগ্রী!

'বেঙ্গল লাইব্রেরি'র ছাপা তালিকায় তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আগুন' বইখানির স্থান অষ্টম। তার আগে যথাক্রমে তাঁর প্রথম ছাপা বই 'ত্রিপত্র' (কবিতার বই, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ : পৃঃ ৬০),—'চৈতালী ঘূর্ণি' (উপন্যাস ১৯২৮),—'পাষাণপুরী' উপন্যাস (১৪ই জুলাই, ১৯৩৩ : পৃঃ ১৩৮),—'নীলকণ্ঠ' (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ : পৃঃ ১৭০),—'প্রেম ও প্রয়োজন' (১০ই জুলাই, ১৯৩৬ : পৃঃ ২৮৪),—'ছলনাময়ী' (গল্প-সংগ্রহ ৫ই অক্টোবর, ১৯৩৬ : পৃঃ ২৬১),—এবং 'জলসাঘর' (গল্প-সংগ্রহ ৩রা অক্টোবর, ১৯৩৭ : পৃঃ ২৩৭)—এই ক'খানি বইয়ের খবর পাওয়া গেছে। তারপর 'আগুন' (৯ই অক্টোবর, ১৯৩৭ : পৃঃ ১৯৮)—এবং 'আগুন'-এর পরেই 'রসকলি' (২১এ মে, ১৯৩৮ পৃঃ ২০৭),—তারপর 'ধাত্রীদেবতা'র (৭ই অক্টোবর ১৯৩৯ : পৃঃ ৪০৩) নাম পাওয়া গেছে। 'কালিন্দী' ঠিক তারই পরের বই। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে 'কালিন্দী' উপন্যাসের তারিখ ৭ই নভেম্বর, ১৯৪০—এবং তার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪১৬। অতঃপর 'তিনশূন্য' (গল্প-গ্রন্থ ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪১ : পৃঃ ২১৩)—এবং তার পরেই চোখে পড়ে 'কালিন্দী'র নাট্যরূপ (১০ আগষ্ট, ১৯৪১ : পৃঃ ১৩৭+৩)।

তাঁর 'আগুন' উপন্যাসখানি বই হয়ে বের হবার চার বছর আগে বেরিয়েছিল 'নীলকণ্ঠ'। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে নিসর্গচিত্র পরিবেষণের,—বিশেষতঃ অরণ্য-প্রান্তরময়, আদিবাসী-অধ্যুষিত, পল্লী-প্রকৃতি বর্ণনার বিশেষত্ব —এবং তাঁর উপমা ইত্যাদি সাদৃশ্য প্রয়োগের কৌশল দেখাবার জন্যেই এতক্ষণ কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা গেছে। এইবার তাঁর উপন্যাস-ধারায় অন্যান্য কয়েকটি লক্ষণ অনুসন্ধানসূত্রে 'নীলকণ্ঠ' বইখানির কথা বলা যাক।

নীলকণ্ঠ

'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের সূচনাতেই অস্তগামী সূর্যের রশ্মিচ্ছটাপ্লাবিত এক দিনান্ত বর্ণনার প্রয়াস দেখা যায়। শুরুতেই তিনি লিখেছেন:

'বেলা যায় যায়। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিধারা আকাশের বুকে ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ গ্রহণ করিতেছে। পৃথিবীর কোল হইতে অন্ধকার যেন ক্রমশঃ মাথা তুলিয়া উপরে উঠিতেছে। পল্লীপথ ধরিয়া একদল ছেলে কলরব করিতে করিতে বাড়ি ফিরিতেছিল। সকলেই সমান ভাবে চীৎকার করিয়া ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ প্রশ্ন-বর্ষণ করিতেছিল একটি ছেলের উপর।'

একা শ্রীমন্তকে ঘিরেই সেই ছেলেদের নানান প্রশ্ন শোনা যায়। শ্রীমন্ত সেদিন বাবুদের বাগানে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। দলের প্রায় সকলেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। শ্রীমন্তও পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগান থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু নসু তখনো গাছ থেকে নামতে পারেনি বলে,—তাকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্যেই পড়ে যাবার ভান করে বিপিনকে আর্তনাদ করতে হয়। সেই শব্দ শুনে হিন্দুস্থানী চৌকিদারও ছুটে এসেছিল,—নসুও যথাসময়ে পালাতে পেরেছিল। কেবল শ্রীমন্তই ধরা পড়ে গিয়েছিল।

এ-উপন্যাসের প্রথম থেকে এই শ্রীমন্ত ছেলেটির ওপরেই তারাশঙ্করের বিশেষ মনোযোগ দেখা গেছে। শ্রীমন্তের বন্ধুরা তাকে কতো যে বিদ্রূপে বিপর্যস্ত করতে চায়। প্রহারেও তার নাকি গায়ে আঘাত লাগে না। সে বলে—'বাবা— গুরুমশায়ের কঞ্চি, বাবার পাঁচন, মায়ের হাতা, আর ওস্তাদের লাঠি পড়ে পড়ে পিঠ হয়েছে পাথর।' তার বন্ধু রামকেষ্ট বলে, 'মার খেয়ে

তোমার না লাগুক, তোমাকে কিন্তু এই ধরা পড়ার জন্তে জরিমানা দিতে হবে'। বিচারকদের মতে শ্রীমন্তের জরিমানা স্থির হয় চোদ্দ আনা। কিন্তু দীন-দরিদ্র শ্রীমন্তের পক্ষে জরিমানার সেটুকু পয়সাও জোগাড় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তার চেয়ে বরং হাঁস চুরি করা সহজ কাজ। সেই চুরি-করা হাঁস মেরে হাঁসের মাংস খাবে তারা। এই জল্পনা চলতে-চলতে নিজেদের পল্লীতে এসে পড়ে ছেলেরা। হালদারদের মজলিস বসেছে গাঁয়ে ঢোকবার সেই পথের সামনেই। সেখানে তিনটি বৃদ্ধের অভ্যস্ত দাবা খেলার আয়োজন। ছেলেরা তাই দেখে একে-একে সরে পড়ে। শ্রীমন্ত নিজেই জরিমানার পয়সার বদলে হাঁস জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেই দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে, কয়েকটি আগাছার ডাল ভেঙে—নিজের পিঠের আঘাতে সেই ওষুধ বুলিয়ে নিতে হয় তাকে! সে যখন নিজেদের বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছোয়, তার ভাগ্‌নী গৌরী তখন সন্ধ্যার আকাশে তারা গুনছে—'এক তারা নাড়াখাড়া, দু তারা কাপাসের খাড়া।'

এইখানেই 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ক'টি অনুচ্ছেদে লেখক নিজে শ্রীমন্তের শ্রীহীন চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন, আর তার দারিদ্র্যের কথা বলেছেন। দারিদ্র্যের চাপে পড়ে তার বাপের মন নিত্যই বিষিয়ে থাকে। তবুও শ্রীমন্তের দৌরাত্ম্য কমে না। প্রতিশ্রুত ভোজের জন্তে হাঁস চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। তারপর পাঠশালায় পণ্ডিতমশায়ের কাছে বন্দী অবস্থায় তাকে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন বলপ্রয়োগ করে আত্মরক্ষা করতে সে বাধ্য হয়। পাঠশালা থেকে—সেই ঘটনাতেই তার নির্বাসন ঘটে যায়। সংসারে মা-মরা একমাত্র ছোট ভাগ্‌নীটিকেই শ্রীমন্ত ভালবাসে। ঐ একটি প্রাণী ছাড়া এ সংসারে তার সত্যিই আর কোনো আশ্রয় নেই। সে যাই হোক, পাঠশালা পরিত্যাগের ঘটনাতেই উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ত নিজের কুলকর্ম অর্থাৎ চাষ-আবাদের কাজ শুরু করবে বলে স্থির হয়। সেদিন সে যখন নিজেদের বাড়ির গরুর সেবা করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে তার ভগ্নীপতি হরিলাল এসে উপস্থিত হয়। এই হরিলালই গৌরীর বাপ। 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের এই দুর্বৃত্ত চরিত্রটিতে তারাশঙ্করের প্রথম পর্বের চমক-প্রয়াসের উল্লেখযোগ্য নমুনা আছে। সে গেরুয়া কাপড় পরে, তেল মাখে না, দাড়ি কামায় না, বাঁ হাতে একটি লোহার তাগা পরে থাকে, গাঁজা খায় এবং তানপুরা নিয়ে গলা সাধে! শ্রীমন্তের মা যে এই জামাইটিকে সুনজরে দেখতে পারে না, সেটা মোটেই

অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। শ্রীমন্তের বোনের—অর্থাৎ গৌরীর মায়ের হঠাৎ যে বাক্‌রোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল,—সে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন, নেশাখোর হরিলালেরই অত্যাচারে! পরে, হরিলালের সঙ্গে মিশে শ্রীমন্তও গাঁজা খাওয়া শুরু করে, বেহারী ওস্তাদের আখড়ায় লাঠি খেলাতেও মন দেয়, এবং সংগীতশাস্ত্রেও তার নিজের কিছু বোধ জন্মেছে বলে ভাবতে থাকে! এইসব দেখে তার মা স্বামীর কাছে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন। মায়ের সেই প্রস্তাব শুনে শ্রীমন্ত মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে। —এবং সেইখানেই তৃতীয় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি। চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্তের বিবাহ-অনুষ্ঠান। নববধূর নাম গিরি। 'গিরি' নামটি তাঁর প্রথম ছাপা-গল্প 'হারানো সুর'-এতেই প্রথম পাওয়া গেছে। আগেই সে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নববধূ গিরির প্রভাবে শ্রীমন্ত হরিলালের কুসঙ্গ ছাড়ে বটে, কিন্তু সে গাঁজা ছাড়তে পারে না। তা হলেও গাঁজার মাত্রা কমে যায়। কিন্তু হরিলাল শ্রীমন্তকে ছাড়তে চায় না। সেদিন সে মাঠ থেকে ফেরবার পথে হরিলাল তাকে ধরে ফেলে। শ্রীমন্ত অবিশ্যি সহজেই তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তবুও হরিলাল শান্ত হতে নারাজ! চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ ঘটনা এই বিবাদ। এর পর শ্রীমন্তের এই আত্মরক্ষার চেষ্টা,—গিরি আর গৌরীর প্রতি তার আন্তরিক মমতা—এবং এই তিন জনের সম্বন্ধে শ্রীমন্তের বন্ধু বিপিন আর হরিলালের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ঘটনাস্রোত এগিয়ে গেছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথম তিন ছত্রের মধ্যেই শ্রীমন্তের পিতা-মাতার মৃত্যু ঘটে গেছে। গিরি নিজে সন্তানের জননী হয়নি বলে তার শাশুড়ীরও পরিতাপ ছিল,—তারও আছে বটে,—তবু গৌরীকে নিয়ে শ্রীমন্ত আর গিরি দুজনে বেশ সুখেই দিন কাটাতে থাকে। প্রধানতঃ সেই কারণেই হরিলাল নিজের মেয়ের ওপর অধিকার ছাড়তে চায় না। গৌরীকে কৌশলে এক ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত করতেও তার কুণ্ঠা নেই! আর শ্রীমন্তই সেই অসহায় গৌরীকে রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়। এই সূত্রে একটি অন্ধকার রাত্রির ভয়াবহ প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। এখানকার এই নিসর্গ বর্ণনার মধ্যে আবার তাঁর নিজস্ব প্রবণতারই ছায়া পড়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে শ্রীমন্ত অত্যাচারী হরিলালকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। হরিলাল পুলিশের সাহায্যে মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে বলে শাসিয়ে গিয়েছিল। সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ত আর গিরির দাম্পত্য আলাপের মধ্যে গৌরীর বিয়ের

কথা উঠেছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে পাত্রও স্থির হয়েছে,—এবং পণের দুশ' টাকাও জোগাড় হয়েছে। গৌরীর সম্বন্ধে এই অপত্য স্নেহের তাগিদেই শ্রীমন্ত তার একমাত্র সম্বল ছিল যে জমিটুকু, সেটুকুও বেচে দিয়েছে। টাকা নিয়ে, বর্ষণসিক্ত এক অন্ধকার রাত্রে বাড়ি ফিরে, নিজের স্ত্রীর কাছে শ্রীমন্ত শুনতে পায় যে, তিন ক্রোশ দূরের গ্রাম মহাদেবপুরে গৌরীকে সেই রাত্রেই অন্য কোন্ পাত্রের হাতে সমর্পণ করবার জন্যে তার বাবা এসে জোর করে তাকে কেড়ে নিয়ে গেছে। সেই কথা শুনে একগাছা লাঠি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে উত্তেজিত শ্রীমন্ত! উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তারপর হরিলালকে জখম করবার অপরাধে শ্রীমন্তের হাতে দড়ি পড়েছে,—তার বিরুদ্ধে হত্যা, রাহাজানি, চুরি ইত্যাদি অনেকগুলি ফৌজদারী ধারা শুরু হয়েছে। ইহজীবনের সুখ-শান্তির সঙ্গে—গিরি আর শ্রীমন্তের বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে সেই ঘটনা থেকেই! মনে মনে স্বামী-স্ত্রীর মমতায় কোনো রকম শৈথিল্য ঘটেনি বটে, কিন্তু তাদের সংসারে অর্থাভাব ক্রমেই কঠোর হতে থাকে। শ্রীমন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচে। আর গিরি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানালোকের তাগাদা আর কটু কথা শুনতে বাধ্য হয়। একাদশ পরিচ্ছেদে সেই দৈন্যের মধ্যেই শ্রীমন্তের মুখে স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি কটু মন্তব্য শোনা যায়—'যেমন কপাল আমার, বিয়ে করলাম তা বাঁজা।' ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সেই অপুত্রক, দুঃখী শ্রীমন্তের পাঁচবছর জেল হয়ে গেছে। সেই খবর শুনে গিরি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। এদিকে গিরির সম্বন্ধে—বিপিনের মনে লালসা বাড়তেই থাকে। অসহায় অবস্থায় গিরি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, এই ছিল বিপিনের বিশ্বাস। গ্রামের মোড়ল সে, জমিদারের সেরেস্তায় তার টাকার অঙ্কটা বেশ স্থূল,—তাই তার নাম 'বিপিন মোড়ল'। তবু চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে—গিরি সেই বিপিন মোড়লকে খুবই তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। সেই অবস্থায়:

'বিপিন হতভম্ব হইয়া গেল, তাহার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল।
তাহার মনের আগুনের আঁচ এ মেয়েটি পাইল কি করিয়া:
'মানুষ বোঝে না—তাহার যে মন, সে মন সৃষ্টি করিয়াছে সর্বান্তর্যামী যে সেই। আর সৃষ্টি করিয়াছে সে আপন সর্বান্তর্যামী মনেরই খানিকটা লইয়া, তাহার সেই সকল-জানা শক্তিই মানুষের মনের অনুমান-শক্তি, তাহাকেই মানুষ বলে দূরদৃষ্টি, তাই হেলায়

মানুষ যাহা অনুমান করে—তাহা ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু অন্তর সমর্পণ করিয়া যে অনুমান, সে হয় সত্য, প্রত্যক্ষ।'

সর্বান্তর্যামী মনের রহস্য সম্বন্ধে চোদ্দর পরিচ্ছেদের শেষ দিকের এই মন্তব্যের পরে পনেরোর শুরুতেই বাস্তব জীবনে সু-অভিজ্ঞ তারাশঙ্কর লিখেছেন,—'ভাবপ্রবণতার দিক দিয়া যতই শোভনীয় হোক, দেখিতে শুনিতে যতই সুন্দর হোক না কেন, বাস্তবতার এই কঠোর তুনিয়ায় এই বেণের কারবারে,—যেখানে ডান হাতটা তুমি না দিলে অপরের বাম হাতের সাহায্য পাইবে না, সেখানে বিপিনকে এই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া গিরির সঙ্গত বা বিবেচনাসম্মত হয় নাই—এ বলিতেই হইবে।'

বিপিন যে-লোভে শ্রীমন্তের মামলার সময় তাকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিল, তার সেই লোভে নিরাশ হওয়াতেই সে মনে মনে গিরিকে জব্দ করবার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় পোষণ করতে থাকে। এদিকে, প্রতিবেশিনী পাঁচুর-মার কাছে নিজের জীবিকা নির্বাহের সমস্যা সমাধানের উপায় কী হবে, গিরি সে-কথা জিগেস করে। পাঁচুর-মা তাকে বিপিনের কাছে ধান ভানবার পরামর্শ দেয়! তাই শুনে মন তার অন্ধকার হয়ে যায়। অপরিসীম নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে গিরি! তারাশঙ্করের নিজের কথায়—'যে রুদ্ধ কান্না তাহার বুকের মাঝে কয়দিন হইতে স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে, সব যেন আজ নিঃশেষে বাহির হইয়া আসিতে চায়। কান্না আজ তাহার হতভাগ্য স্বামীর তরে, কান্না আজ তাহার নিজের তরে, জীবনের তরে। হায়, বাঁচিবার আর ত তাহার কোন উপায়ই নাই।' এইখানেই পনেরোর পরিচ্ছেদের সমাপ্তি। এগারোর পরিচ্ছেদে—নিঃসম্বল শ্রীমন্তকে তার ঋণ শোধের তাগাদা দিতে গিয়ে, নিরুপায়ের উপায় নির্দেশ-প্রসঙ্গে বিপিন যেদিন খুবই রাগের সঙ্গে তাকে বলেছিল—'ঘটি বাটি বেচ্, না থাকে পরিবার বাঁধা দে,'—সেদিন ইজ্জতে ঘা খেয়ে শ্রীমন্তের অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটেছিল অকস্মাৎ! তারই প্রতিবাদে মাথা খাড়া হয়ে উঠেছিল শ্রীমন্তের! তার হুঙ্কার শুনে ভয়ে বিপিনকে সেদিন ছুটে পালাতে হয়েছিল। অথচ দারিদ্র্যের লজ্জায় শ্রীমন্ত সেদিন ছিল সমাজ-বিচ্যুতের মতন! তারপর সময়ের স্রোত বয়ে গেছে

আরো অনেক দূর। সেই শ্রীমন্ত এখন জেলখানায়! বিপিনের লালসার সামনে অসহায় গিরি এখন বড়োই একা, বড়োই নিঃসঙ্গ!

শুভবুদ্ধির সজ্ঞানকৃত সমস্ত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের দুরদৃষ্ট তবু বারবার তীব্র আঘাত হানতে থাকে! ষোলোর পরিচ্ছেদে,—গিরি যখন পাঁচদিন অনাহারের ফলে অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখছে, সেই সময়ে তার মনে হয়েছে যে, একটা কঙ্কালের হাত তার চোখের সামনে থেকে সমস্ত ছবি যেন মুছে দিয়ে যাচ্ছে!—'সমস্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া গিরি প্রাণপণে জাগিয়া উঠিতে চাহিল। আবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সেই অনুভূতি—তাহাকে এই ধরণীর বুক হইতে সেই হাতখানা সবল আকর্ষণে যেন ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। পিছনে তাহার অবহেলার ঘরদ্বার—নির্মম সংসার মমতাময়ী হইয়া তাহারই জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে।'

এ-উপন্যাসের প্রায় চার-পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে এই অবস্থার বর্ণনা চলেছে। গিরির শারীরিক যন্ত্রণার,—তার নানা স্মৃতি-রোমন্থনের এবং অশেষ আত্মগ্লানির বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। এই যন্ত্রণার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে গিরি তার শেষ সম্বল কয়েকটি আতপচালের কণামাত্র মুখে দিয়ে যখন স্নান করে উঠে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়ে আবার বিপিন এসে উপস্থিত হয়। তখন—'ভোগের পুষ্টিতে সর্ব অঙ্গে মেদবহুল কদর্য স্থূলতা, মুখের রেখায় রেখায় কাপুরুষতার ছাপ, ছোট ছোট দুটি চোখে শঙ্কিত কিন্তু লালসাভরা নির্নিমেষ দৃষ্টি'। তার সেই চেহারা দেখে আন্তরিক ঘৃণায় গিরি তাকে তিরস্কার করে। বিপিন প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে বলে, 'বৌ আমি তোমায় ভালবাসি।' সে-কথা শুনে রাগে, উত্তেজনায় গিরি সংজ্ঞা হারায়। মাটিতে পড়ে যায় সে,—পড়ে গিয়ে তার কপাল রক্তাক্ত হয়ে যায়। তার এই 'ছিন্নমস্তা' মূর্তি দেখে আবার পালিয়ে যায় বিপিন!

অসীম দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও সতী নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার এই আত্মবিলোপী সাধনাই 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের নামটি সার্থক করে তুলেছে। বিরুদ্ধ পরিবেশের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একলা চলার দুর্বার শপথ রূপায়িত হয়েছে গিরির চরিত্রে। সে সন্তানহীনা। গৌরীকে নিয়ে অপত্যস্নেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করেছিল সে,—কিন্তু ভাগ্য তাতেও বাধা

দিয়েছে। অদৃষ্টচক্রে তার স্বামী শ্রীমন্তও তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। ধনী বিপিনের স্থূল প্রবৃত্তির কবল থেকে গিরির আত্মরক্ষার প্রয়াস,—তার দারিদ্র্যের চরম দুর্দশা,—মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও প্রাণের প্রতি মানুষের সহজ এবং দুর্মর আকর্ষণ,—সেই অবস্থায় পাঁচুর-মা'র সস্নেহ সেবা,—দুর্যোগের গভীর মেঘাস্তরণের ফাঁক দিয়ে কঠোর মর্ত্য-সংসারে নেমে-আসা সামান্য একটু আলোর রেখা,—যাকে বলা যায়—বিধাতার স্বহস্তে লেখা আশার ইশারা,—পাঁচুর মা'র চেষ্টায় ভিন্‌গাঁয়ের ভবি মোড়লের ধান দিতে সম্মতি—এবং সেই সম্মতিটুকু পেয়েই গিরির চোখে কৃতজ্ঞতার ধারা-বর্ষণ,—এইসব সুযোগ-দুর্যোগের মধ্য দিয়েই কাহিনী এগিয়ে গেছে। নিরক্ষরা পাঁচুর-মার মুখ দিয়েই জীবনাদর্শের সমালোচনা উচ্চারিত হয়েছে! গিরিকে সে বলে, 'তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে মা'! এবং সেই মন্তব্যের পরেই দেখা যায়—শীতের আকাশ প্রগাঢ় নীল! চলমান বিন্দুর মত আকাশে নিরন্তর উড়ে-চলা কয়েকটি চিল। দাওয়ার কোলে করবী-গাছটিতে রাঙা ফুলের গুচ্ছ। মনে পড়ে গৌরীর কথা। দিন যায়। রাত্রি হয়। বাগ্‌দী-পাড়ায় সন্তানহারা জননীর বিলাপ শোনা যায়। গিরির মনে হয়, তবু যা-হোক্ তার ভাগ্য ভাল,—মাতৃত্বে বঞ্চনার বেদনার চেয়ে ঐ বিয়োগের দুঃখ অনেক বড়! রাত গভীর হয়। ঘরের দাওয়ার ওপর তেরছা চাঁদের আলো এসে পড়ে। সে-আলো হঠাৎ যেন অন্ধকার করে দিয়ে আবার দেখা দেয় লুব্ধ বিপিন। ঠিক সময়েই পাঁচুর মা আর পাঁচুও এসে দাঁড়ায়। আবার পালিয়ে বাঁচতে হয় বিপিনকে। ক্ষোভে, অপমানে গিরি আবার কেঁদে ফেলে। প্রতিবেশী রামকেষ্ট সে-দৃশ্যের সাক্ষী থেকে যায়। আঠারোর পরিচ্ছেদে সেই দৃশ্যেরই পরিণতি দেখানো হয়েছে। রামকেষ্ট—হরিলাল—বিপিন, এদেরই উৎসাহে গ্রামের সর্বত্র গিরির সম্বন্ধে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চায়েৎ বসে। গিরিকে দোষী সাব্যস্ত করে পঞ্চায়েৎ গিরির কাছে হরেকৃষ্ণকে আর রতনকে প্রতিনিধি পাঠায়। খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে গিরি তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে।

অরপর, উনিশের পরিচ্ছেদে গিরির প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে শ্রীমন্তের কারাবাসের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ-ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ আকস্মিক এবং অসংগত। শ্রীমন্তকে আরো কিছুদিন কারাবাসে কাটাতে হবে—এই খবরটুকুই এ-পরিচ্ছেদের মোট কথা। আঠারোর পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে রতন আর হরেকৃষ্ণকে গিরি সেদিন তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পক্ষে

অগ্নিপরীক্ষা সম্বন্ধে গিরির আত্মচিন্তা দেখা গিয়েছিল। তারাশঙ্করের নিজের কথায়—'গিরি বারান্দায় দাঁড়াইয়া চতুর্দিকের উপর একটা অর্থহীন দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। তারপর অকস্মাৎ সে কহিল—শেষ অগ্নিপরীক্ষাই দিয়ে যাব পঞ্চায়েৎকে। সে আগুনে দেখব গ্রাম পোড়ে কি না!' কুড়ির পরিচ্ছেদে সেই অগ্নিকাণ্ড দেখা দিয়েছে। গিরি তখন সন্তানসম্ভবা। শ্রীমন্তের সন্তান! কিন্তু সেই সন্তানের সম্বন্ধে সন্দেহ-তাড়িত. অন্যায় ইশারা করে রতন জিগেস করেছিল, 'এ তুই সামলাবি কি করে বৌ?' তার উত্তরে গিরি বলেছে, 'আমার ছেলে আমি বুকে করে সামলাব।' তারপর পাঁচুর-মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে, নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে—পথে বেরিয়ে পড়েছে সে। কুড়ির পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক অনুচ্ছেদে সেই অগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা হয়েছে। মনে পড়ে, 'পাষাণপুরী'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে কালীকর্মকার আর বাসিনীর কথা-প্রসঙ্গে এমনি এক অগ্নিকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে। হয়তো এইরকম কোনো এক অগ্নিকাণ্ড তাঁর স্মৃতিতে সে সময়ে সত্যিই বিদ্যমান ছিল! 'নীলকণ্ঠ' কাহিনীতেও সেই অগ্নিশিখার মধ্য দিয়েই দেখা দিয়েছে আর এক জগৎ। গিরি সেই নতুন জগতে গিয়ে পৌঁছেচে—

> 'কিছুক্ষণ পর গ্রামের দিকে পিছন ফিরিয়া শুভ্র রাস্তাটির চিহ্ন-পথে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিল। পথের দূরত্বের হিসাব ছিল না। হিসাব রাখিবার প্রয়োজনও নাই। ঘরের বন্ধন, সমাজের নাগপাশ নিজের হাতে আগুন ধরাইয়া স্বনিঃশেষে ভস্ম করিয়া পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে মুক্ত অনুভব করিল।
>
> 'রাত্রির অন্ধকার পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। আকাশ ক্রমশঃ রক্তরাঙা হইয়া উঠিল। তারপর সেই রাঙা দিগ্বলয় ভেদ করিয়া উদিত হইল অতি সুকোমল, রক্তবর্ণ প্রভাত-সূর্য। সে অরুণোদয়কে গিরি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।'

এই প্রণতির পরে শেষ দুটি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতেই সুদীর্ঘ চার বছরের ব্যবধান চোখে পড়ে। 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের নামকরণের বিশেষ একটি যুক্তিও এই একুশের পরিচ্ছেদেই চোখে পড়ে। ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিরি পথে পথে ঘুরেছে। ঘুরতে-ঘুরতে কোন্ এক হাসপাতালে নাকি গিরির সন্তানের জন্ম হয়েছিল। সে তার ছেলের নাম রেখেছে 'নীলকণ্ঠ'। মনে পড়ে নীলকণ্ঠ-কে বুকে নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা,—সেই তার

নানা পীড়নের স্মৃতি! মানুষ হিংস্র, লোভী, স্বার্থপর, বর্বর! নদীর ঘাটে বসে সেদিন তার নিজের জীবনের সেই শোচনীয় ইতিহাসের কথা ভাবছিল সে:

‘গিরি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল। কোথাও কিছু দেখা যায় না। এ বিপুল অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আজ মিথ্যা হইয়া গেছে। শুধু পদতলে দুকূলস্ফীতা আবর্তময়ী নদী অন্ধকারের মধ্যে চক্‌চক্ করিতেছিল। ওই নদীর মধ্য হইতে ডাক উঠিতেছিল। গিরি এক দৃষ্টে নদীর বুকের দিকে চাহিয়া রহিল। মন্থর পদে জলের দিকে সে অগ্রসর হইয়া চলিল।’

এই অন্ধকার নদীপ্রবাহে নেমেই গিরির কাহিনী শেষ হয়েছে। একুশের পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন—‘গিরি পদস্খলিতা হইয়া নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।’

শেষ পরিচ্ছেদে ঘটনাস্রোত আবার ফিরে এসেছে শ্রীমন্তের গ্রামে। তখন—‘বিপিন নাই, পাঁচুর মাও মরিয়াছে। আরও কত লোক গিয়াছে। কত নতুন মানুষের মেলা। শ্রীমন্তের ঘরখানা একটা মাটির স্তূপে পরিণত হইয়াছে। চিহ্নের মধ্যে বাঁচিয়া আছে একটা করবীর ঝাড়, আর তাহারই সমরেখায় ওদিকে সেই লেবু গাছটা।’ তারপর—‘গ্রামের লোকে বলে এই গাছ দুইটার তলে নিশীথ রাত্রে কাহাকে নাকি দেখা যায়। শীর্ণা এক নারী অতি দুঃখে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া গেছে। কোলে তাহার অর্ধ-দগ্ধ একটি শিশু।’ এবং—‘শুধু একটা ছেলে মাঝে মাঝে ওখানে যায় আসে। পাকা লেবু সংগ্রহ করিয়া সে এখানে ওখানে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।’ তার নাম নীলকণ্ঠ। সে—‘বসুমতীর সন্তান, জীব, মানুষ!’ এই কথার পরেই তারাশঙ্কর,—তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের সেই সুদূর আদিপর্বে—তাঁরই উত্তরকালের সুপরিচিত ভঙ্গিতে লিখেছিলেন:

‘সংসারে এইটাই বোধ হয়,—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য সব চেয়ে বড় পরিচয়। আদিম মানব এই পরিচয় লইয়াই সংসারে আসিয়াছিল। কিন্তু মানুষ সংসারে যেদিন মালিক হইয়া উঠিল, সেই দিন সে নিজেকে করিল প্রধান।’

মানুষের এই বিকৃতির বিরুদ্ধে নীলকণ্ঠ তার শিশু-মন বিদ্রোহ নিয়ে এসেছে! তারাশঙ্কর প্রশ্নও করেছেন, জবাবও দিয়েছেন—‘ধনীর প্রতি ঘৃণা,

—ধনের উপর লোভ এই শিশুর বুকে কে দিল ? সর্পের মুখে বিষ যে দেয়, সেই কি ?'

জেল থেকে বেরিয়ে শ্রীমন্ত নিজের ভিটেতে ফিরে আসে। জেলে থাকতেই গিরির মৃত্যুসংবাদ পৌঁছেছিল তার কাছে। সুতরাং সে দিক থেকে নতুন কোনো শোকের হেতু ছিল না। নিজের ভিটেতে ফিরে সেই নীলকণ্ঠ-ছেলেটির সঙ্গে তার আলাপ হোলো। তারা পরস্পরের প্রকৃত সম্পর্ক—না' জানতে পারলেও—পিতা-পুত্র একই সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লো।

তারাশঙ্কর তাঁর এই 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসে,—তার আগে 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে এবং 'কবি'তেও—আন্তরিক আবেগের সঙ্গে দুর্গত মানুষের কথা বলতে চেয়ে-ছিলেন। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় সাধারণ মানুষের দুরবস্থা দেখা দেয় কী ভাবে,—শহরে সাধারণ শ্রমিকের বস্তি-জীবনের চেহারাটা কী রকম,—সংসারের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখের আস্বাদনেও কতো-যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা,—জীবনের এইসব বাস্তব ছবিই তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির সাধারণ-অসাধারণ বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনাতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য আগ্রহ ছিল। আবার কথায়-কথায় ছড়া, গান, পদ্য ইত্যাদি প্রয়োগের ঝোঁকও তাঁর সেই আদি-পর্ব থেকেই দেখা গেছে। উপন্যাসে যেমন, গল্পেও তেমনি—সাধারণ সংসারের পরিচিত দৃশ্য বেছে নিয়েই তিনি তাতে রঙ ফলাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'জলসাঘর'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এইবার তাঁর 'রসকলি' থেকে এবং তারই কাছাকাছি অন্যান্য বই থেকে আরো কয়েকটি গল্পের কথা বলা যেতে পারে।

রসকলি, পাষাণপুরী, ছলনাময়ী ইত্যাদি

'রসকলির' প্রথম গল্প 'কালাপাহাড়'-এর মোট কথা সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারে : রংলাল তার ছেলে যশোদানন্দনের হাতি কেনবার আব্দার শুনে বেশ একটু রাগ করেই তাতে সম্মতি দেয়। রংলাল নিজে সম্পন্ন চাষী। সে এবার একটি গরু কিনবে বলে সংকল্প করেছে। স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি ক'রে পাঁচুন্দির হাটে গিয়ে সেই টাকাতেই রংলাল অতিকায় দুটি মহিষ কিনে ফেলে—একটির নাম দেয় 'কালাপাহাড়', অন্যটির 'কুম্ভকর্ণ'। তার অতি সাধের এই মহিষ দুটিকে নিয়ে একদিন নদীর ধারে সে তাদের চরতে ছেড়ে দেয়। তারপর রংলাল ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময়ে সেখানে এক চিতাবাঘ এসে পড়ে।

তখন, ঘুম থেকে জেগে উঠে, মহিষের ডাকের অনুকরণে আঁা আঁা শব্দ করতে থাকে রংলাল। সেই শব্দ শুনে কুম্ভকর্ণ আর কালাপাহাড় দুটিতেই ছুটে এসে সেই চিতাবাঘটাকে মেরে ফেলে। কুম্ভকর্ণও মারা যায়। সেই শোকে কালাপাহাড় খুবই ঝিমিয়ে পড়ে। রংলাল আর একটি মহিষ কিনে এনে কালাপাহাড়ের সংগীর অভাব দূর করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালাপাহাড়ের তাতে মন ওঠে না। রংলাল ছাড়া আর কাউকেই সে মানতে চায় না। ক্রমশঃ কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীরা সকলেই অস্থির হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে রংলাল তার সাধের কালাপাহাড়কে দূরের হাটে একশ পাঁচ টাকায় বিক্রি করে আসে। হাটে গিয়ে কালাপাহাড়কে হস্তান্তরিত করে একটু নিশ্চিন্ত হবার জন্যেই হাঁটা পথে না ফিরে ট্রেনে উঠেছিল রঙ্গলাল। তবুও কালাপাহাড় তাকে ভোলেনি। নতুন মনিবকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, নানা উৎপাত করতে করতে রংলালের খোঁজেই সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু শান্তিভঙ্গের অপরাধে—পুলিশের গুলিতে জখম হয়ে টলতে টলতে তাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হয়!

এর আগে যাঁরা এই ধরনের জন্তু-জানোয়ারের গল্প লিখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের নাম স্বতঃই মনে আসে। মানুষের সঙ্গে অবোলা, গৃহপালিত দুটি জন্তুর অকৃত্রিম প্রীতির ছবি এখানে খুবই উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। এ-সংসারে জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের এই প্রীতির সম্পর্ক সত্যিকার অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেই বা বুঝবেন! সত্যিই এসব কথা সকলের বোঝবার নয়। তাই কালাপাহাড়কে রিভলবারের গুলিতে বিদ্ধ করে—গল্পের শেষে, সাহেব শুধু একটি মৃতপশুর শব অপসারণের সামাজিক দায়িত্বটুকুই ভাবতে পেরেছেন,—তার বেশি কিছু নয়! 'সাহেব রিভলবারটা খাপে ভরিয়া সঙ্গের কন্স্টেবল্‌কে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোম লোককো বোলাও'!

রসকলির দ্বিতীয় গল্প 'তাসের ঘর'। শখ করে চায়ের বাসনের একটি সেট কিনেছিল অমর,—ছ'টি পিরিচ, পেয়ালা ইত্যাদি। তারই মধ্যে একটি পেয়ালা ভেঙ্গে যাওয়ায় অমরের মাকে বড়ই উত্তেজিত হতে দেখা যায়। অমরের বৌ শৈল সুন্দর, স্নিগ্ধ মেয়েটি,—বাপের বাড়ির মহিমা প্রচারে তার খুবই উৎসাহ। সেই শৈল এসে দোষ স্বীকার করে; পেয়ালাটা সে-ই ভেঙ্গে ফেলেছে। এইটুকুই এ-গল্পের ভূমিকা। এদিকে কলকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্র-

বাবুরা দেশে এসেছেন। সে বাড়ির মেয়েরা এ বাড়িতে বেড়াতে আসছেন। সেই কারণেই অমরের মা-বৌয়ের এই বিশেষ প্রস্তুতি। তাঁরা যখন এলেন, তখন বাপের বাড়ির যশের কথা বলতে গিয়ে এলাহাবাদে শৈলর পিত্রালয়ের অবস্থা যে খুবই ভালো এবং দরকার মতন তাঁদের জামাই অমরকে তাঁরা পঞ্চাশ-একশ' টাকা যে নিতান্তই অবলীলাক্রাম দিয়ে থাকেন,—শৈল সেই কথাই বলে ফেলে! কথা শুনে তার শাশুড়ী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। অমর বাড়ি এলে সে-কথার সত্যাসত্য যাচাই করা হয়। সব শুনে, অমর রাগ করে বৌকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেয়। অমরের ভাই দাদার কথা-মতন বৌদিকে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, সে বাড়িতে জলস্পর্শ না ক'রে সকলের অলক্ষিতে সেখান থেকে ফিরে আসে। শৈলর মা যখন শৈলকে তার কথা জিগেস করেন, তখন শৈল আবার একটি মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়। সে বলে যে, তার দেওর জরুরি কাজে সিম্‌লে গেছে, সেখান থেকে ফিরে সে চলে যাবে তার নতুন চাকরিতে! এই ভাবে তাসের ঘর গড়তে থাকে, ভাঙতে থাকে!

রসকলির তৃতীয় গল্প 'মুসাফিরখানা'। আরেকটি গল্পের নাম 'শ্মশান-বৈরাগ্য'। 'মুসাফিরখানা'তে মা-পিসীমার তীর্থ-ভ্রমণ, গ্রামে মহামারী—এবং সেই অবস্থাতেই গল্পের কথককে গ্রাম ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় যেতে দেখা গেছে। তারাশঙ্করের নিজের কথায়—তারপর 'কুঞ্জভঙ্গে'র পালা'! চিঠি আসে, গ্রাম সুস্থ হয়েছে, মা-পিসীমা ফিরেছেন। সেই চিঠির পরে দম্পতির প্রত্যাবর্তন। ফেরার পথে গাড়ি-বদলের জন্যে বর্ধমানে কিছুক্ষণের বিরতি,—এবং সেই সুযোগে চমকপ্রদ এক দৃষ্টান্তর দেখা দিয়েছে। 'শ্মশান-বৈরাগ্যে'র গল্পবস্তু আর এক রকম। মহলার নামকরা মহাজন মহিম বাঁড়ুজ্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে শত্রুরা ইনকামট্যাক্স-অফিসে খবর দেওয়ার ফলে মহিমকে সরকারী তহবিলে অনেক টাকা জমা দিতে হয়। তখন ব্যবসার উন্নতির জন্যে,—মহিম রাগ করে হরিহরপুরে তার এক দিদির বাড়িতে গিয়ে ওঠে। দিদি তখন মৃত্যু-শয্যায়। হরিহরপুরে মহিমের সঙ্গী হয়ে যোগ দিয়েছে যোগী চাকর। দিদির মেয়ে বিভা মামার অভ্যর্থন'র জন্যে দরজা খুলে দেয়। কিন্তু মহিমের আচরণ নম্রতার ধার দিয়েও যায় না। ক্রমশঃ রোগে ভুগে তার সেই দিদির মৃত্যু হয়। এবং সেই অবস্থাতেই মহিমের মনে দেখা দেয় শ্মশান-বৈরাগ্য। দিদির বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে হঠাৎ বেশ কিছু টাকা খরচ করে ফেলে বটে,—কিন্তু পরে তারই আবার মনে হয় যে, বিভা নিজের

গয়না দিয়েও তো সে টাকাটা শোধ করতে পারে! সেদিন রাত্রে মহিম যখন খেতে বসেছে, বিভা তখন সত্যিই তার গয়নার পুঁটলীটা এগিয়ে দেয়, আর মহিম বেশ খুশি হয়েই সেটা তুলে নেয়! কেবল মহিমের সঙ্গী সেই যোগী চাকর বলে, 'শোক চিরদিন থাকে না, দিদিমনি'!

এই বইয়ের আরেকটি গল্পের নাম 'প্রতিমা'। চাটুজ্যে-বাড়ির বউ-ঝি-গিন্নি সকলেই বাড়ির পুজোর প্রতিমা-প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। সময়টা ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি। কুমারীশ এসেছে মূর্তি গড়তে। এই বাড়ির ছোট বৌ যমুনাও এসেছে সেই আনন্দে যোগ দিতে,—কিন্তু অন্য সবাই তাকে বলে যে, মাটি গোলার কাজে সে বরং না থাকলেই ভালো,—অমূল্য যদি আবার কিছু বলে। অমূল্য এই চাটুজ্যে-বাড়ির ছোট ছেলে। সে মদ্যপ এবং ষণ্ডামার্ক। বিয়ের পরেই বৌকে প্রহার দিয়ে সে তাকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, এদিকে নিজে এক নীচ অপরাধে জেল ঘুরে এসেছে। সেই অমূল্য জেল থেকে ফিরেছে বটে, কিন্তু তার স্বভাব বদলায়নি। অমূল্য ফেরবার পরে যমুনাকেও বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অমূল্য প্রতি রাত্রে মদ খেয়ে ফেরে,—আর, ফিরে আসবার পথে কল্পিত অন্যায়-কারীদের বিরুদ্ধে সে খুবই গালিগালাজ করে। যমুনা ভয়ে ভয়ে প্রতীক্ষা করে। মৃৎশিল্পী কুমারীশ এই দুরবস্থার কথা একেবারে কিছুই যে না জানে, তা নয়। নানান খেলনা গড়ে যমুনাকে সে উপহার দেয়, আর বলে,—'এ যেন দুগ্‌গা প্রতিমার মত বৌ।' এই অবস্থাতেই চাটুজ্যে-বাড়ির প্রতিমার মুখে যমুনার মুখের আদল দেখা দিল। এই নিয়ে সকলেই বেশ কানাকানি করতে থাকে। অমূল্য ক'দিন বাড়ি ফেরেনি। সবাই এই ভেবে সন্ত্রস্ত বোধ করে যে, অমূল্য এসে কীই-না-কী বলবে। যমুনা ভয়েই শিউরে ওঠে। তার পর বিজয়ার দিন মাতলামি করতে করতে অমূল্যকে বাড়ির দিকে আসতে দেখে আসন্ন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সকলেই উদ্বিগ্ন বোধ করে। যমুনা তো পালিয়েই যায়! এই দৃশ্যের পরেই চকিতে পট বদলেছে। পরদিন সকালে কুমারীশ এসেছে বিদায় নিতে। আর, ঠিক সেই সময়ে পুকুরে যমুনার লাশ ভেসে উঠতে দেখা গেছে! অমূল্য তাই দেখে কেঁদে আছড়ে পড়ে।

এই সব গল্পের প্রসঙ্গ ধরেই এখানে তাঁর আরো কয়েকটি গল্পের কথা উল্লেখ করা দরকার। রচনাকালের ক্রম অনুসারে তাঁর বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে

প্রবাহিত তাঁরই শিল্পগত বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে সে-দিক থেকে আলোচনার কথা নয়,—'কবি', 'আগুন', 'চৈতালী-ঘূর্ণি' ইত্যাদি প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া গেল,—তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়েও তেমনি তাঁর স্বভাবের আরো কিছু কিছু লক্ষণ চোখে পড়ে। তাঁর জীবনের কয়েকটি দিকের,—এবং উল্লেখযোগ্য কোনো কোনো ঘটনার কথাও এই সব গল্পের সূত্র ধরেই তিনি নিজেও বলেছেন। এইসূত্রে সে-কথাও বিবেচ্য।

'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়গল্প' নামে তাঁর একখানি গল্প-সঙ্কলন প্রথম ছাপা হয় ১৩৬০ সালের আশ্বিন মাসে। এই সংগ্রহে সর্বসমেত এগারটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'রায়বাড়ি', 'পিতাপুত্র', 'ফল্গু', 'মুটু মোক্তারের সওয়াল', 'সন্ধ্যামণি', 'সনাতন', 'রসকলি', 'দেবতার ব্যাধি', 'বোবা কান্না' এবং 'শেষ কথা'—এই এগারটি গল্পের কথা তিনি তাঁর এই বইখানির 'ভূমিকা'তে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠগল্প' এর আগেই ছাপা হয়ে গেছে। সে সংগ্রহের প্রথম গল্প 'জলসাঘর'-এর কথা আগে বলা হয়েছে। তাতে মোট ষোলটি গল্প জায়গা পেয়েছিল—'জলসাঘর', তারিণী মাঝি', খাজাঞ্চিবাবু', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'নারী ও নাগিনী', 'কালাপাহাড়', 'তাসের ঘর', 'অগ্রদানী', 'বেদেনী', 'না', 'পৌষলক্ষ্মী', 'দেবতার ব্যাধি', 'তমসা', 'ইমারত এবং 'কামবেনু'। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতামত বর্তমান আলোচনার সূচনাতেই (১০-১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করা গেছে। তারাশঙ্কর তাঁর প্রিয় গল্প-সংগ্রহের ভূমিকায় সে-বইখানির কথা নিজেই উল্লেখ করেছেন—এবং তারপর তাঁর এই প্রিয়-গল্পের সংগ্রহ সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, তাঁর 'জলসাঘর'-এর প্রথম গল্প 'রায়বাড়ি'-র সঙ্গে তাঁরই ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়িত আছে। 'আমার সাহিত্য জীবন' বইখানিতে তিনি সেই ঘটনার কথা লিখেছেন। 'জলসাঘর' ছাপা হবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কোলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁকে এই বইখানি দিয়ে আসেন। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরার পথে সে-বার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চেতনা ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাকি 'জলসাঘর' বইখানির খোঁজ করেছিলেন। শ্রীযুক্তা রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে 'জলসাঘরের' গল্পগুলি

যে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল, তার উল্লেখ আছে। তারাশঙ্করের নিজের কথায়—'রায়বাড়ি গল্পের মধ্যে মহাকবি নাকি তাঁর ওই চেতনাহীনতার আবছায়ায় মৃত্যুস্রোতে ভাসানো নৌকায় চড়তে গিয়ে সচেতনতায় ফিরে আসার সঙ্গে রাবণেশ্বর রায়ের নিরুদ্দেশ যাত্রার সংকল্প নিয়ে ভরাগঙ্গায় ভাসানো ঘাটে বাঁধা নৌকায় চড়তে গিয়ে ফিরে আসার একটি মিল দেখতে পেয়েছিলেন।' এ-বইয়ের দ্বিতীয় গল্প 'পিতাপুত্র' তিনি যখন প্রথম লেখেন, তখন তাঁদের অঞ্চলের কোনো এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের জীবনের একটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনেই তা লেখা হয়। সেই আদিপর্বে এই গল্পে 'প্রতিষ্ঠাবান পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্বের কথাই ছিল উপজীব্য।' তিনি বলেছেন—'শিবশেখরেশ্বরকে আঁকতে গিয়ে আপনার অজ্ঞাতসারেই আমি যেন স্বর্ণখনি আবিষ্কার করলাম। তার থেকেও বেশি। শিবশেখরেশ্বরের মধ্যে আবিষ্কার করলাম এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে।' এই সূত্রেই তিনি তাঁর 'পঞ্চগ্রাম' প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য খবর জানিয়েছেন। এখানে সে-কথাও তুলে দেওয়া দরকার। কারণ, 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ইত্যাদি লেখাতে আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ-নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, সেও তাঁর মনের মূল সংস্কারগুলির মধ্যেই গণ্য। তিনি লিখেছেন—'এদেশের সমাজ ব্রাহ্মণেই গঠন করেছে—সমাজকে, সংস্কৃতিকে বহু বিপ্লব, বহু দুর্যোগ ও বহু বিবর্তন, বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে; বিংশ শতাব্দীর ভাববিপ্লবেও এদেশের নেতৃত্ব করেছে ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে গ্রাম্য সমাজে এখনও এই ব্রাহ্মণ বর্তমান রয়েছেন। ......জন্মগত জাতিপ্রধান বর্ণাশ্রম ধর্ম উঠে গেলেও কর্মগত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য থাকবেই। এই ন্যায়রত্নচরিত্র এই কারণেই পরবর্তীকালে আমার বহু বৃহৎ রচনার কেন্দ্রে প্রায় প্রাণশক্তির মত আবির্ভূত হয়েছে। গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে নাটকও রচনা করেছি। বৃহতের বীজ হিসাবে এই গল্পটি আমার প্রিয় গল্প।' প্রিয়গল্পের তৃতীয় গল্প 'কল্প' তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসের বীজ। চতুর্থ গল্প 'যাদুকরী'-কে তিনি তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র ভূমিকা বলেছেন। তবে, এটিকে যে 'বীজ' বলা চলে না, বরং 'ক্ষেত্র' বলাই সঙ্গত, তিনি

সে-কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ আরো বলেছেন—'যাদুকরী যাদের নিয়ে লেখা—তারা আমাদের ও-অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়। বিচিত্র সম্প্রদায়। ওদের নিয়ে গল্পটি লেখার পর—এই ধরনের সম্প্রদায় নিয়ে বড়ো রচনার ইচ্ছা এবং সাহস পেয়েছি।' পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, রাঢ় অঞ্চলের এই যাদুকর-যাদুকরীর দল রাঢ়ের সিদ্ধল নগরীর রাজা ভবদেব ভট্টের গুপ্তচর হিসেবে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত বলেই হরেকৃষ্ণের ধারণা; গুপ্তচর বৃত্তির সুবিধার জন্যেই পুরুষেরা শিখতো যাদুবিদ্যা, মেয়েরা হোতো নৃত্যগীতপটীয়সী। নানা সাময়িক ঘটনা নিয়ে গান-রচনা যে এদের শিল্প-সংস্কারের একটা বড়ো অঙ্গ ছিল, তাঁর এই ভূমিকাতে তিনি সে-কথাও স্মরণ করেছেন। পঞ্চম গল্প 'মুটু মোক্তারের সওয়াল'-কে তিনি তাঁর 'দুই পুরুষ' নাটকের বীজ বলে উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ গল্প 'সন্ধ্যামণির' সঙ্গে তাঁর মেয়ে বুলুর মৃত্যুর স্মৃতি জড়িত। শুধু তাই নয়, এই সূত্রে তাঁর সে-পর্বের ব্যক্তিগত আরো কয়েকটি তথ্যের যোগ আছে। তাই সে-প্রসঙ্গও কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে এখানে তুলে দেখা দরকার। তিনি লিখেছেন—'আমার মেয়ে তখন বেঁচে, সেই সময় হেঁটে গেলাম উদ্ধারণপুর, আমাদের গ্রাম থেকে ২৩।২৪ মাইল পথ। উদ্ধারণপুরের ঘাটের উপর ছোটো বাজারের একখানি ছিটে বেড়ার ঘরে বাসা নিয়ে দিন-তিনেক ছিলাম। বাসার পাশেই পালকর্তা অর্থাৎ কুম্ভকার মশায়ের দোকান। রাস্তার ওপারে মাদুর বোনে একটি পরম শ্রীমতী মেয়ে। তার পাশে দ্বিজপদর মুদির দোকান—এবং দ্বিজপদ শ্মশানঘাটের ইজারাদার। খানিকটা দূরে শ্মশান-ঘাট। পানের দোকানে দুটি আধুনিক ছোকরা যাত্রার দলের নাটক পড়ে। কেনারাম আসে। আধ-পাগল মানুষ। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। শ্মশানঘাটে চণ্ডাল পৈরুর সঙ্গেও আলাপ করলাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত টিনের চালায় কাটিয়ে এলাম। ইচ্ছে হোলো বাজারটির ছবি তুলে রাখি। একদিন সন্ধ্যায় বসে গোড়ার ছবিটি তুলে রাখলাম। তারপর গ্রামে ফিরলাম। লেখাটা পড়ে রইলো ছোটো সুটকেসটার মধ্যে। দিন পনেরো-কুড়ি পরে—মারা গেল আমার মেয়েটি। মেয়ের মৃত্যুর ঠিক দ্বিতীয় দিন সকালে সাবিত্রীপ্রসন্নের পত্র পেলাম—'উপাসনা' উঠে যাচ্ছে, সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে যাচ্ছেন, ইত্যাদি। ...'উপাসনা' উঠে গেল। 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশের

উদ্‌যোগ আয়োজন হতে লাগল। আমি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় এলাম—কিছুদিনের জন্যে…কলকাতায় এসে এই গল্পটি লিখতে বসে আমার কন্যাশোকার্ত অন্তরের বেদনা ফুটে উঠলো লেখাটির মধ্যে। …নূতন কাগজ 'বঙ্গশ্রী'র আসরে—উপস্থিত সাহিত্যিকদের সকলের নিমন্ত্রণ হোলো, আমার হোলো না। বেশ একটু আহত হলাম …আত্মসম্বরণ করে গল্পটি লিখতেই মন দিলাম। গল্পটি শেষ হোলো। আমার সেদিনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু 'বঙ্গশ্রী'র সহকারী সম্পাদক কিরণ রায় এসে গল্পটি শুনেই গল্পটি জোর করে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। এবং সেই দিন দুপুর বেলা—সম্পাদক সজনীকান্ত টেলিফোন করে বললেন—গল্পটি শুনে তাঁর এতো ভালো লেগেছে যে, তিনি 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম সংখ্যাতেই গল্পটি ছাপতে চান। এবং তাই ছাপা হোলো। আরো হোলো—'বঙ্গশ্রী' প্রকাশের পর থেকে আমার রচনা এবং সাহিত্য জীবনের নূতন যাত্রা—তার সূচনা হোলো গল্পটি থেকে। আমার প্রিয়-গল্পের গল্পগুলির মধ্যে স্মৃতি ও ইতিহাসের দিক থেকে সেই কারণে 'সন্ধ্যামণি' আমার সবচেয়ে প্রিয় গল্প।'

এই সূত্রে আর একটি কথাও মনে পড়ে। তাঁর এই গল্প-সংকলনের সপ্তম গল্প 'সনাতন' এর মধ্যে তাঁর একান্ত প্রিয়জন সনাতনের কথা বলা হয়েছে। সনাতনের মনিববংশের তরুণ মনিব তিনি নিজেই। এই সনাতন গল্পে তিনি যে মৃত্যু-ভাবনার ছবি এঁকেছেন, সেই ভাবনাই তাঁর 'আগুন', 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি নানা রচনার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বল্‌লে ভুল হবে না। 'পাষাণ-পুরী'তেও এই মৃত্যু-ভাবনার ইশারা আছে। সনাতন-প্রসঙ্গে তাঁর এই প্রিয়-গল্পের ভূমিকাতে তিনি নিজে বলেছেন—'মৃত্যুকে ভয় সকলেই করে। এক শ্রেণীর মানুষ নচিকেতার মতো তাকে জানতে চেষ্টা করে। …বাকী মানুষের সকলেই তার ভয়ে কতক নানাভাবে তাকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন, ভুলে থাকেন। …মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত হয়ে সে (সনাতন) ছুটে বেড়াচ্ছে। তাকে 'মর' বললে সে প্রিয়তমাকেও ত্যাগ করে। কথাটার আতঙ্কেই অস্থির। …পরিণতকালে সে যখন মৃত্যুর সন্মুখীন হোলো, সে তখন নিঃশঙ্ক সহজভাবেই তার সন্মুখীন হোলো। এইটিই জীব বা জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি।'

এর আগেই এ-বইয়ের অষ্টম গল্প 'রসকলি'র কথা বলা হয়েছে। এটি তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম গল্প। তারাশঙ্কর নিজে বলেছেন—'আমার প্রথম গল্প আমার প্রথম সন্তানের মতই প্রিয়।' সে যাই হোক, এ বইয়ের নবম গল্প 'দেবতার ব্যাধি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র যিনি, গল্পের সেই নায়কের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত-জীবনে তাঁর নিজের অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করেছেন তারাশঙ্কর। তাঁরই পরিচয়-সূত্রে তিনি লিখেছেন,—আসল মানুষটি ছিলেন বিপত্নীক। কতো রাত্রে দেখেছি স্ত্রীর ছবি ফুলের মালায় সাজিয়ে ধ্যান করছেন। ধূপধুনো জ্বেলেছেন। কি কঠিন তপস্যাই না করেছেন এই ব্যাধি বা শাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কিন্তু কিছুতেই পান নি। জীবজীবনের অন্তঃস্থলবাসিনী কুটিলক্ষুধারূপিণী তামসী নিষ্কৃতি দেয় নি। ডাক্তার বলতেন—'তারাশঙ্করবাবু, এই তামসীকে আমি মহাশক্তি বলে গণ্য করি নি—চিনতে পারি নি, তাই তাকে পূজায় প্রসন্ন করি নি। তাকে Sublimate না করে eliminate করতে চেয়েছিলাম। তাঁর দুঃখে আমি কেঁদেছি। ডাক্তারটি একদিন এসে আবার একদিন চলে গেল। একেবারে নিরুদ্দেশ।'

মোট এগারোটির মধ্যে এই ন'টি গল্পই তারাশঙ্করের সাহিত্যিক-জীবনের বিশেষ বিশেষ রুচি বা প্রবণতার সঙ্গে এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ সুখদুঃখের স্মৃতিসূত্রে জড়িত। প্রিয়-গল্পের দশম গল্প 'বোবাকান্না' এবং শেষ গল্প 'শেষকথা' তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে জায়গা না পাওয়ায় তিনি যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, এই ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে সেই স্বীকৃতিও ছাপা হয়েছে। তিনি বল্লেছেন,—'নিঃসংশয়ে ও দুটি আমার প্রিয় গল্প'।

'যাদুকরী'তে তিনি যে আবহের,—অর্থাৎ যে জীবন-পরিবেশের ছবি এঁকেছেন, তাঁর দু'খানি প্রসিদ্ধ উপন্যাসে সেই একই আবহ-প্রকৃতির ছায়া দেখা যায়। 'যাদুকরী' গল্পের সেই আবহই যেন উপন্যাসের বৃহৎ বিস্তারের সুযোগ পেয়ে আরো ঘনীভূত হয়েছে। এখানে তাঁর সেই বিশেষ আবহ-প্রীতির কথাটাও স্মরণীয়। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র আখ্যানবস্তুর ইশারা আছে বইখানির নামের মধ্যেই। শুরুতেই ভাগীরথির তীরবর্তী এক ঝাউবন আর ঘাসবনে ঘেরা চরের কথা বলা হয়েছে। সেই চরের উলুঘাস কাশশর আর সিদ্ধি গাছের মধ্য দিয়ে গঙ্গার স্রোত এগিয়েছে এঁকেবেঁকে। ক্রোশের পর ক্রোশ লম্বা হিজল বিল। এই হিজল বিল

থেকেই নালার শতনরী গিয়ে মিশেছে নদীর স্রোতের সঙ্গে। শরৎকালে সেই চরে থরে থরে কাশফুল ফোটে, বর্ষায় হিজল-বিলের জলের রং বদলে যায়, কখনো বা হিজল-বিলের বাতাস ভরে ওঠে অপূর্ব সুগন্ধে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র প্রথম কয়েক লাইনের মধ্যেই। প্রকৃতির এই শান্ত, সুদূরবর্তী সৌন্দর্যের পটে মানব-সংসারের ক্ষীণ একটি রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেছে। গঙ্গার বুকে নৌকো ভেসে যায়। নৌকো থেকে যাত্রীরা মাঝিকে প্রশ্ন করে। মাঝি জবাব দেয়। সেই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই বিল-অঞ্চলের পাখি-পাখালির খবর পাওয়া যায়। শিকারীরা প্রলুব্ধ হয়। প্রকৃতির শান্ত শোভাতেই যারা খুশি,—অথবা পুষ্পবিলাসী যারা,—তারাও ব্যাকুল হয়। কিন্তু মাঝিরা শিউরে ওঠে। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে তারা বলে, 'এমন কথাটি মুখে আনবেন না হুজুর। যমরাজার দখিন-দুয়ার হিজলেরই বিল।'

তারাশঙ্করের বইয়ের সংখ্যা সত্যিই বড়ো বেশি। ছোটো গল্প, বড় গল্প, উপন্যাস—তিনি অনেক লিখেছেন। তাঁর রচনা-প্রকৃতির বিশ্লেষণে, রচনা-কাল অথবা প্রকাশ-কাল ধরে এগিয়ে যেতেও অনেক বেশি সময় লেগে যায়। নিজের পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি নানা ভাবে, নানান্ রচনায়। নিন্দা বা প্রশংসার লক্ষ্য মনে রেখেই যে এ-কথা বলতে হচ্ছে, তা' নয়। এই তাঁর স্বভাব! তাঁর প্রথম দিকের অন্যান্য উপন্যাস বা গল্পের কথা উল্লেখ করবার আগে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সূচনার সঙ্গে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র এই ভূমিকাটুকুর সুস্পষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করা দরকার। তাঁর এমন কতকগুলি প্রিয় অনুভূতি আছে, যা তাঁর বিচিত্র লেখাতে ফিরে ফিরে আসে। এখানকার এ-অংশও সেই রকম। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র তৃতীয় সংস্করণ থেকে প্রথম কয়েক লাইন এখানে তুলে দেওয়া গেল :

> 'হাঁসুলী বাঁকের ঘন-জঙ্গলের মধ্যে কে শিস্ দিচ্ছে রাত্রে। দেবতা কি যক্ষ, কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহারেরা।
>
> কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী

গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে—তখন হয় রুপোর হাঁসুলী। এইজন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে, ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা 'বাঁশবাঁদি', লাট জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙলগ্রাম।'

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র এই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পর থেকেই হাঁসুলীর সঙ্গে নাগিনীর আবহাওয়ার প্রভেদ চোখে পড়ে। ক্রমেই পার্থক্যের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঁশবাঁদি গ্রামের বাবুমশায়েরা আর, ঐ গ্রামেরই চাষী-সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, নাপিত, কলু, তন্তুবায় প্রভৃতি অন্যান্যেরা,—এই দুই নিয়ে একটি 'সভ্য' সম্প্রদায়, এবং এখানকার কাহারদল—এই নানান্ শ্রেণীর মানুষের প্রতিদিনের হাসি-কান্নার সংসারই লেখকের মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। তবুও সে দেশ প্রকৃতিরই আপন হাতে গড়া! নদী-জঙ্গলের দেশ বাঁশবাঁদি। তার উত্তরেই ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙলগ্রাম। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র এই বাঁশবাদি আর জাঙলগ্রাম,—এবং 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র হিজল বিল,—রহস্য-রোমাঞ্চ-বিস্ময়ের আবহাওয়ায় এই দুটি অঞ্চলকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বললে অন্যায় হয় না। তবে নাগিনী-কন্যাতে নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যে লেখকের আন্তরিক উপভোগের লক্ষণ চোখে পড়বার মতন। হিজল বিলের জল আর চরের কাশবন,—সেখানকার আকাশের গগনভেরী পাখির বিপুল ডানার হুই হুই শব্দ ইত্যাদি তো আছেই, তাছাড়া চিতাবাঘ বা বুনো শুয়োরের কথাও তুচ্ছ নয়; আর আছে হিজল-বিলের ভয়াবহ সাপ। এই সাপ আর জঙ্গলের কথায় তারাশঙ্করের আগ্রহ সত্যিই সহজাত। এখানকার স্থান-বর্ণনার মধ্যে তাঁর আপন মনের বিস্ময়-বোধ সহজেই ব্যক্ত হবার সুযোগ পায়। এসব জায়গায় তাঁর কলম যেন খুবই দ্রুত চলতে চায়,—নাগিনীতেও তাই, হাঁসুলীতেও তাই। বর্তমান-কালের প্রশ্ন-কণ্টকিত জীবন-রঙ্গভূমিতে মেয়েলি ব্রতকথার সুর আর কবি-মনের অকৃত্রিম খুশির ডাক

যেন হঠাৎ মিশে যায়! তাঁর এইসব লেখা পড়বার সময়ে মনে মনে অনুভব করা যায় যে, আমাদের অভ্যস্ত এবং সংকুচিত জীবন-পরিবেশ থেকে আমরা যেন উৎক্ষিপ্ত হচ্ছি অন্য এক জগতে,—অন্য এক পরিমণ্ডলে! 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে কী এক আবেশে মগ্ন হয়ে তিনি লেখেন :

'হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালোঠাকুরের দণ্ড মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে। কালীনাগ বলেছিল—তুমি তো আমাকে দণ্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে; কিন্তু আমি যাব কোথায় বল; ঠাকুর বলেছিলেন —ভাগীরথির তীরে হিজল বিল, সেখানে মানুষের বাস নাই, সেখানে যাও। বিশ্বাস না হয়, বর্ষার সময় গঙ্গার বন্যায় যখন হিজল বিল আর গঙ্গা এক হয়ে যায় তখন গঙ্গার বুকের উপর নৌকা চড়ে হিজলের চারিপাশে একবার ঘুরে এসো। দেখবে, জল—জল আর জল : উত্তর-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে জল ছাড়া মাটি দেখা যায় না, জলের উপর জেগে থাকে ঝাউ আর দেবদারুর মাথাগুলি। দেখো, আকাশে পাখি গাছের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরে হতাশকণ্ঠে যেন মরণ-কান্না কেঁদে আবার উড়ে যেতে চেষ্টা করে। কেন জান? গাছের মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে। শরীর তোমার শিউরে উঠবে। হয়তো ভয়ে ঢলে পড়ে যাবে। মা-মনসার ব্রতকথায় মর্ত্যের মেয়ে বেনে-বেটী মায়ের দক্ষিণমুখী যে মূর্তি দেখেছিল—সেই মূর্তি মনে পড়ে যাবে। মা বলেছিলেন বেনের মেয়েকে—'সব দিক পানে তাকিয়ো, শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না।' বেনের মেয়ে নাগলোক থেকে মর্ত্যধামে আসবার আগে দক্ষিণ দিকের দিকে না তাকিয়ে দেখে থাকতে পারে নি। তাকিয়ে দেখেই সে ঢলে পড়ে গিয়েছিল। মা-মনসা বিষহরির ভয়ঙ্করী মূর্তিতে দক্ষিণ দিকে মৃত্যুপুরীর অন্ধকার তোরণের সামনে অজগরের কুণ্ডলীর পদ্মাসনে বসেছেন—পরনে তাঁর রক্তাম্বর,

মাথায় পিঙ্গল জটাজুট, পিঙ্গল নাগেরা মাথায় জটা হয়ে দুলচে, সর্বাঙ্গে সাপের অলঙ্কার, মাথায় গোখুরা ধরেছে ফণার ছাতা, মণিবন্ধে চিত্রিতা অর্থাৎ চিতি-সাপের বলয়, শঙ্খিনী-সাপের শঙ্খ, বাহুতে মণিনাগের বাজুবন্ধ, গলায় সবুজ পান্নার কণ্ঠির মত হরিদ্রক অর্থাৎ লাউডগা সাপের বেষ্টনী, বুকে দুলছে কালনাগিনীর নীল অপরাজিতার মালা, কানে দুলছে তক্ষকের কর্ণভূষা, কোমরে জড়িয়ে আছে চন্দ্রচিত্র অর্থাৎ চন্দ্রবোড়ার চন্দ্রহার, পায়ে জড়িয়ে আছে সোনালী রঙের লম্বা সরু কাঁড় সাপ পাকে পাকে বাঁকের মত; সাপেরা হয়েছে চামর, সেই চামরে বাতাস দিচ্ছে নাগকন্যারা—বিষের বাতাস। সে বাতাসে মায়ের চোখ করচে ঢুলুঢুলু। মায়ের কাঁধে রয়েছে বিষকুম্ভ, সেই কুম্ভ থেকে শঙ্খের পানপাত্রে বিষ ঢেলে পান করছেন, আবার সেই বিষ গলগল করে উগরে ফেলে বিষকুম্ভকে পরিপূর্ণ করছেন। মায়ের পিঠের কাছে মৃত্যুপুরীর তোরণে অন্ধকার করছে থমথম।'

তারাশঙ্করের কবি-স্বভাবের কথা অনেক বার বলা হয়েছে। বেদে, সাঁওতাল, যাদুকরী সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা তিনি নিজেই বলেছেন। জীবনের এ-অঞ্চলের রূপ-গুণের তিনি যে কী অকৃত্রিম গুণগ্রাহী, তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' থেকে এই বর্ণনা তুলে দেওয়া গেল। বইয়ের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় উদ্ধৃতিতে এইখানেই ছেদ টানতে হোলো। তা না-হলে এখানে আরো কয়েক ছত্র তুলে দেওয়া যেতো!

সব ঔপন্যাসিককেই উপন্যাসের আখ্যান-পরিবেশের বিশেষ প্রয়োজনের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু সে তো কেবল পটভূমি নয়,—বাইরের পরিবেশ মাত্র নয়। পরিবেশ আঁকবার সংকল্পর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আন্তরিক বিস্ময়বোধের যথার্থ সমন্বয় না ঘটলে এরকম পরমাশ্চর্য সাবলীলতা কখনই সম্ভব হয় না। তারাশঙ্করের অজস্র লেখার মধ্যে এই ধরনের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলেই তাঁর হৃদয়ানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মধ্যেও এই আবেগসমৃদ্ধ মসৃণতার চিহ্ন আছে। জাঙলগ্রামের ভদ্রলোকবাবুরা রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে রহস্যময় শিস উঠতে দেখে ভয় পেয়েছেন। তাঁরা অনেক তদন্ত

করেছেন, লাঠিসোঁটা, টর্চ বন্দুক নিয়ে রহস্য সমাধানের অনেক চেষ্টাই হয়েছে। ক্রোশ-খানেক দূরে থানা। সেখান থেকে দারোগাবাবু এসেছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক। তিনি বলে গিয়েছেন নদীর ভিতর কোনো একটা কিছু হচ্ছে। 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারোমাস।' কিন্তু পূর্ববাংলার নদী এক ধরনের,—হাঁসুলীর রীতি অন্য ধরনের। তারাশঙ্করের নিজের কথায়—'কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে।' এ উপমা আশ্চর্য!

জাঙলগ্রামের ঘোষবাড়ির এক ছেলে কলকাতায় কয়লা আর পাটের ব্যবসা করে। পূর্ববাংলার কথা-প্রসঙ্গে তার মুখ থেকে শোনা যায়:

> 'সে দেশই হোলো নদীর দেশ। জলে আর মাটিতে মাখামাখি। বারোটি মাস ভরানদী বইছে; জোয়ার আসছে, জল উছলে উঠে নদীর কিনারা ছাপিয়ে সবুজ মাঠের মধ্যে ছলছলিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; জোয়ারের পর আসছে ভাঁটার পালা, তখন মাঠের জল আবার গিয়ে নামছে নদীতে; নদীর ভরা কিনারা খালি হয়ে কূল জাগছে। কিন্তু তাও কিনারা থেকে বড়জোর দু' আড়াই হাত; তার বেশি নামে না। সে নদীও কি এমন-তেমন, আর একটি দুটি? সে যেন গঙ্গা-যমুনার ধারা, থৈ-থৈ করছে, থমথম করছে; এপার থেকে ওপার পারাপার করতে এ দেশের মানুষের বুক কেঁপে ওঠে। আর সে ধারা কি একটি। কোথা দিয়ে কোন্ ধারা এসে মিশল, কোন্ ধারা কোথায় পৃথক হয়ে বেরিয়ে গেল—তার হিসাব নাই। সে যেন জলের ধারার সাতনরী হার,—হাঁসুলী নয়। নদীর বাঁকেরই কি সেখানে অন্ত আছে? 'আঠারো বাঁকি', 'তিরিশ বাঁকির' বাঁকে বাঁকে নদীর বিচিত্র চেহারা সেখানে। দু' ধারে সুপারি আর নারিকেল গাছ;—সারি নয়—বাগিচা নয়—সে যেন অরণ্য। সঙ্গে আরও যে কত গাছ, কত লতা, কত ফুল,—তা যে দেখে নাই, সে কল্পনা করতে পারবে না। সে দেখে আশ মেটে না। ওই সব নারিকেল-সুপারির ঘন বনের মধ্য দিয়ে বড় নদী থেকে চলে গিয়েছে সরু সরু খাল, খালের পর খাল। সেই খালে চলেছে ছোট ছোট নৌকা। নারিকেল-সুপারির ছায়ার তলায় টিন আর বাঁশের ছেঁচা বেড়া দিয়ে তৈরী ঘর, ছোট ছোট গ্রাম লুকিয়ে আছে। সব খালগুলি কোন গাঁয়ের পাশ দিয়ে, কোন গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে—গ্রাম

থেকে গ্রামান্তরে। ও-দেশের ছোট নৌকাগুলি এ দেশের গরুর গাড়ির মত, নৌকাতেই ফসল উঠছে ক্ষেত থেকে খামারে, খামার থেকে চলেছে হাটে-বাজারে, গঞ্জে-বন্দরে ; ওই নৌকাতেই চলেছে— এ গাঁয়ের মানুষ ও-গাঁয়ের কুটুমবাড়ি, বহুড়ী যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, মেয়ে আসছে বাপের বাড়ি ; মেলা-খেলায় চলেছে ইয়ারবন্ধুর দল। চাষী চলেছে মাঠে—তাও চলেছে নৌকাতেই, কাস্তে নিয়ে লাঙল নিয়ে একাই চলে নৌকা বেয়ে। শরতের আকাশের ছায়াপথের মত আদি-অন্তহীন নদী,—সেই নদীতে কলার-মোচার মত ছোট্ট নৌকার মাথায় বসে—বাঁ হাতে ও বাঁ বগলে হাল ধরে, ডান হাতে আর ডান পায়ে বৈঠা চালিয়ে চলেছে।'

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তে এইখানে নদী আর অরণ্য,—মাঠ আর আকাশ,—তুফানে ধুয়ে-মুছে যাবার ভয়ে নিত্যই থরথর গোলা-গঞ্জ-বন্দরময় পূর্ববঙ্গের দিকে গভীর বেদনার কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস শোনা গেছে। পূর্ববঙ্গের দারোগাবাবু পূর্ববঙ্গের নদী-প্রকৃতির কথা ভেবেছেন। ঘোষেদের যে ছেলেটি কলকাতায় ব্যবসা করে, আর, বাংলার পূর্বাঞ্চলও যে ঘুরে এসেছে, সেই ছেলেটির মনের ভাবনা অনুসরণ করেই পূর্ববঙ্গের লোক-জীবনের এবং সেখানকার নিসর্গ-পরিবেশের বর্ণনা পাওয়া গেল! কিন্তু কোপাইয়ের বাঁকে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম। সেখানে নদীর জন্যে মানুষের দুর্ভাবনা মাত্র চারমাসের—আষাঢ় থেকে আশ্বিন। তারাশঙ্করের নিজের কথায়—

'আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভরে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ী মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত করে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট-পাটকেল-পাথর, দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনই ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী।'

কোপাইয়ের এই রূপ-বর্ণনা তাঁর অন্যান্য অনেক রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়! মানুষের মধ্যে,—প্রকৃতির মধ্যে—যেখানেই এই রকম দুর্বার রূপ

তিনি অনুভব করেছেন, সেখানেই দেখা দিয়েছে তাঁর গভীর উচ্ছ্বাস! 'জলসাঘর'-এর কথা মনে পড়ে। 'জলসাঘর' বইখানির মোট এগারোটি গল্পে—'রায়বাড়ি', 'জলসাঘর', 'পদ্মবউ', 'ডাক-হরকরা', 'প্রতীক্ষা', 'মধুমাষ্টার', 'তারিণী মাঝি', 'টহলদার', 'ট্যারা', 'রাখাল বাঁড়ুজ্যে' এবং 'নারী ও নাগিনী'র মধ্যেও জীবন সম্বন্ধে তারাশঙ্করের নিজস্ব আস্বাদনের পরিচয় আছে। সেই সঙ্গে তাঁরই নিজস্ব শিল্প-কৌশল বলতে যা বোঝায়, সে-সবেরও অনিবার্য প্রকাশ ঘটেছে। 'জলসাঘর' গল্পটির কথা আগেই বলা হয়েছে (পৃঃ ৩৫-৩৭)। কোথাও মানব-মন,—কোথাও বা প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য অবলম্বন করে যে সমারোহ বর্ণনার ঝোঁক তাঁর নানান লেখার মধ্যে দেখা গেছে, এই সব লেখাতেও সে-লক্ষণ সুস্পষ্ট। এখানে সে-বইয়ের অন্যান্য কয়েকটি রচনার কথাও বলা যেতে পারে।

'রায়বাড়ি'র সূচনাতেই লেখক জানিয়ে দিয়েছেন—'১২৭০ সাল—ইংরেজি ১৮৬৩ সালের ঘটনা। অগ্নি নিভিয়াছে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণ বিকিরিত হয় নাই। দেশের লোকের অসি গিয়াছে কিন্তু বাঁশের লাঠি তখনও বাঁশিতে পরিণত হয় নাই।'—এই পরিবেশের মধ্যেই রাজারামপুরের রায়বাড়িতে তখন অসীম প্রতাপে রায়বংশের চতুর্থ পুরুষ—রাবণেশ্বর রায় বিদ্যমান! এক হাজার বিরানব্বুই নম্বর লাট হুদ্দা-শ্যামপুরের মাতব্বর প্রজারা তাঁরই সদরে এসে কেঁদে পড়লো—'হুজুর রক্ষা করুন'। এই শ্যামপুরের সম্ভ্রান্ত প্রজারা ষড়যন্ত্রে দক্ষ। আর আছে দুর্দান্ত মুসলমান, বাগ্দি আর হাড়ি লাঠিয়াল। চার-পাঁচঘর জমিদারের হাত-ফের হয়ে হুদ্দা শ্যামপুর এসেছে রাবণেশ্বরের হাতে। সেখানকার ছত্রিশখানি গ্রামের চল্লিশজন প্রজা এসেছে রাবণেশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে। গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী তাদের পরিচর্যা করলেন। কালীভক্ত রাবণেশ্বর প্রজাদের কথা শুনে মিটমাট করে নিতে রাজী হলেন। তবে, জমিদারের মর্যাদাবোধ অটুট রইলো। প্রজারা বললে, 'রাজায়-প্রজায় সম্বন্ধ হোলো বাপ আর বেটা'।—রাবণেশ্বর বললেন, 'কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে? পছন্দ হয় না?' পরদিন সকালে সত্যিই তবু, মিটমাট হয়ে গেল। প্রজারা ফিরে গেল স্বস্থানে। রাবণেশ্বর তাঁর নতুন জলসাঘরের নক্সা দেখে দিতে গেলেন।

এই ঘটনার মাসখানেক পরে, একদিন দুপুরে, আহারান্তে রাবণেশ্বর যখন

বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময়ে শ্যামপুরের সেই গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী এলেন কাঁদতে কাঁদতে। রাবণেশ্বর শুনলেন সব কথা। শ্যামপুরের প্রজারা ঠাকুরদাসকে পুড়িয়ে মেরেছে। প্রভুর আদেশে খানসামা যুগল গিয়ে শ্যামপুরের নগদীকে ডেকে নিয়ে এলো। রাবণেশ্বর সেই নগদীর মুখ থেকে শ্যামপুরের প্রজাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনলেন। অতঃপর লাঠিয়াল কালী বাগ্দিকে ডেকে পাঠানো হোলো। রাবণেশ্বর তাকে হুকুম দিলেন—'ছত্রিশ মৌজা কালো করে দিয়ে আসতে হবে।' সেই সময়ে রাবণেশ্বরের স্ত্রী—স্বয়ং রায়গিন্নি ঘরে এলেন। তিনি বললেন, 'না না—তা হবে না, গ্রাম পোড়াতে আমি দেব না।' কিন্তু সে কথায় কান দিলেন না রাবণেশ্বর। রায়গিন্নিকে বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে বলে ঠাট্টা করলেন তিনি। শ্যামপুর গ্রাম ছাই হয়ে গেল!

তারপর একদিন রায়কর্তার শ্যালক বীজনগরের জমিদার হরিনারায়ণ সরকার এলেন। হরিনারায়ণের ছোটো বোন রাধারাণীর বিবাহ উপলক্ষে এই আমন্ত্রণ পেয়ে রাবণেশ্বর সেই উৎসবে যোগ দিলেন—সেখান থেকে ফিরেও এলেন। গৃহিণী ব্রজরাণী এবং তাঁদের ছেলেটি সেখানেই রইলেন,—কথা হোলো, তাঁরা পরে ফিরবেন।

মাস-দেড়েক পরে,—আষাঢ়ের রথযাত্রার আগের দিন,—রথযাত্রা উপলক্ষে রায়বাড়িতে নাচ-গান-জলসা বসেছে। ব্রজরাণী আর তাঁর ছেলে বিশ্বেশ্বরের সেইদিন ফেরবার কথা। সন্ধ্যার সময়ে নায়েব এসে বললেন,—'কই গিন্নিমায়ের বজরা তো এখনো এসে পৌঁছুলো না?' তখন জলসাঘরে মজলিশ কিন্তু জমে উঠেছে। আতরে গোলাপ-জলে—বেলোয়ারী ঝাড়ের আলোতে,—সেতারী-তবলচীর উৎসাহে সারা ঘরে যখন খুশির ঢেউ উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে কালী বাগ্দী এসে আছড়ে পড়লো—বীজনগর থেকে ফেরবার পথে—'আকস্মিক এক ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সংগমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজরা-ডুবি হইয়াছে।'

রাবণেশ্বর রায় 'তারা' 'তারা' বলে উঠলেন। নাটমন্দিরে পায়চারি করতে করতে অন্ধকার প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হোলো যে, তাঁর সেই জলসাঘরে সত্যিই আর কোনদিন উৎসবের আলো জ্বলবে না! তারপর পুণ্যাহ গেল, শ্রাদ্ধের আয়োজন হোলো। হুন্দা-শ্যামপুরের প্রজাদের ডেকে রাবণেশ্বর বললেন, 'তোমরা দুঃখ পেয়েছ, তোমাদের সে দুঃখে

তিনি কাতর হয়েছিলেন। তোমাদের যার যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা তোমরা গ্রহণ কর।' প্রজারা সে-কথা শুনে সত্যিই অভিভূত হোলো। এদিকে হরিনারায়ণ এসে তাঁর ছোটা বোন নন্দরাণীর সঙ্গে রাবণেশ্বরের দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব জানালেন। তাতে রাবণেশ্বর সর্বত্যাগী হবার উদ্যোগ করলেন। ঠিক সেই সময়ে আবার গঙ্গার ভয়াবহ মূর্তি দেখা গেল। দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে প্রজারা বড়োই বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাবণেশ্বর তখন গ্রামের সমস্ত ভদ্রপরিবারকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলির মেয়ের বিয়ের আয়োজন হয় রায়বাড়িতেই সেই জলসাঘরে। এবং জলসাঘরে আবার বাসরের আলো জ্বলতে দেখে রাবণেশ্বর ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসে কালী বাগ্‌দি।

আবহ-বর্ণনার এই রকম ঝোঁক তাঁর গল্পে, উপন্যাসে বারবার দেখা দিয়ে থাকে। 'জলসাঘর' গল্পে আসর ভেঙে যাবার অনেকক্ষণ পরে,—গভীর রাত্রে বিশ্বম্ভর পুনরায় যখন জলসাঘরে প্রবেশ করেছেন,—বসন্তের সেই চন্দ্রালোক-পরিপ্লাবিত রাত্রি,—চারদিকের বাতাসে সেই মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ,—গাছে গাছে পাপিয়ার ডাক,—আর, সেই গভীর নৈশ পরিবেশে বৃদ্ধ বিশ্বম্ভরের হাতে এস্রাজ,—সামনে সুরা,—কণ্ঠে সংগীত—এবং সে-রাত্রে সেই বৃদ্ধের কণ্ঠে অপ্রত্যাশিত গান শুনে জেগে-ওঠা সুন্দরী কৃষ্ণা বাঈ,—এই সব নিয়ে,—সব কিছুর সমাবেশে গভীর এক আবহেরই বিশিষ্টতা অনুভব করা গেছে। তাঁর 'কবি'তে,—'আগুন-'এ,—'কালিন্দী'তে,—'রাইকমলে',—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়,—'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে তাঁর এই আবহ-মনস্কতাই বারবার ব্যক্ত হয়েছে। কালিন্দী ময়ুরাক্ষী প্রভৃতি নদীর বর্ণনাতে তিনি তাঁর এই প্রবণতাই উচ্চারিত হতে দিয়ে ছিলেন। তাঁর 'তারিণী মাঝি' গল্পের কথা এর আগেই বলা হয়েছে (পৃঃ ১৫)। এই 'জলসাঘর' গল্প-সংগ্রহের মধ্যে তাঁর সে গল্পটিও জায়গা পেয়েছিল। মানুষের স্থূল আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির কথা তাতে একটু চড়া গলায় বলা হয়েছে বটে,—তবু পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সমারোহ বর্ণনায় অনুমাত্র কার্পণ্য ঘটে নি। এবং এই পারিপার্শ্বিকতা কেবল নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের মনের রাজ্যেও আবহাওয়ার তীব্র তাপ-চাপের দিকটাতেই তারাশঙ্করের বিশেষ আগ্রহ। 'জলসাঘর'-এর অনেক পরে 'আরোগ্য-নিকেতন' বই খানিতেও

তিনি মশায়-পরিবারের কথা বলেছিলেন। 'জলসাঘর'-এর 'পদ্মবউ' গল্পেতেও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক 'চন্দ্র'মশায়ের রেখাচিত্র ফুটেছে। সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আবহের তীব্রতা দেখা গেছে। আগা-গোড়া পুরো গল্পটির মধ্যে গভীর সংহতি বোধ করা যায়,—সেই সঙ্গে তীব্র ভাব-সংঘাত। 'প্রতীক্ষা' গল্পেও কতকটা একই রকম তীব্রতা আছে। তা'ছাড়া, সে গল্পের বাউড়ীদের মেয়ে পরীর সঙ্গে 'ইমারত' বইখানির 'ইমারত' গল্পের মিল আছে কিছু পরিমাণে। সেই সঙ্গে পরীর মনের প্রকৃতি দেখাতে গিয়ে তারাশঙ্কর ভাদ্র মাসের 'ভাঁজো পরব' উপলক্ষে পরীর নাচ-গানের যে ছবি এঁকেছেন, সেও উল্লেখযোগ্য। পরী আলো নয়, আলেয়া! সে নিজেও সমাজচ্যুতা, আর তার গানের সঙ্গী 'আখনা' ওরফে 'রাখনা' ওরফে 'রাখহরি'ও দীন দরিদ্র। তাদের গলায় তিনি যে গান দিয়েছিলেন, সেই গানটির কথার সমাবেশে দেখা যায় আবার এক নদীর নাম!

ও কালো কালিন্দী কূলে কালো কানাই বাজায় বাঁশি
আমি কুলে কালি দিব, কালো রূপই ভালোবাসি।

লেখক বলেছেন,—'মনসিজের পুষ্পশরে পরী জর্জর হইয়া উঠিল। বিলাসিনী আখনাকেই বিবাহ করিয়া বসিল। ...আখনাও কৃতার্থ হইয়া গেল, সে জাতি মানিল না, স্বজন ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরীকে লইয়া ঘর বাঁধিল।' পরী তখন নীড়ের মায়ায় রেজা-খাটা (এইখানে 'ইমারত' গল্পের কথা আবার মনে পড়ে) ছেড়ে দেয়,—আখনাও চাকরি শুরু করে। তারপর আবার দেখা দেয় লেখকের মন্তব্য—'সত্য কথা, প্রেমও মোহ—দুইটা বস্তু আসল ও গিল্টি সোনার মত, কালের আগুনে না পোড়াইলে স্বরূপ বোঝা যায় না।' তারপর কয়েক মাস পরে, ভালো শাড়ির অভাবে কতো যে কষ্ট হয়, পরী সে দুঃখ অনুভব করলো; আখনা চুরি করে চুড়ি নিয়ে এলো পরীর জন্যে। পরীর শখ মেটাবার জন্যেই এক রাত্রে ধান চুরি করে এনে আখনা দেখলো ঘর শূন্য, পরী নেই। জেল হোলো আখনার। দু'বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে, আরো অনেক দিন পরে আখনা শুনতে পেলো যে পরী কাটোয়াতে ভিক্ষে করে দিন কাটাচ্ছে। কাটোয়ায় গিয়ে সে দেখলো পরীর রূপ-যৌবন শেষ হয়ে গেছে। ক্ষণিকের জন্যে—ভিক্ষুণীকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার ইচ্ছে হয়েছিল আখনার মনে। কিন্তু সাহায্য করা হোলো না তবু।

তিনি যে তীব্র আবেগের পক্ষপাতী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু সেই আবেগেও 'তর-তম' ভেদ আছে, সন্দেহ নেই। 'পদ্মবউ', 'ডাক-হরকরা' এবং 'তারিণী মাঝি'র তীব্রতার তুলনায় তাঁর এই 'প্রতীক্ষা' গল্পের পত্নী চরিত্রের তীব্রতা সত্যিই অনেক কম। 'পদ্মবউ' কুষ্ঠরোগগ্রস্ত চন্দ্রমশায়ের স্ত্রী। চন্দ্রমশায়ের পাঠশালা আছে। তাঁর স্ত্রীকে ছাত্রেরা 'মশায়-গিন্নি' বলে ডাকে। দশ বছর আগে চন্দ্রমশায় প্রথম যখন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন, তখন পদ্মবউ ভয়ে শিউরে উঠেছিল,—চার ক্রোশ দূরে সে তার বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের মহীয়সী রমণীদের পুণ্যকীর্তি স্মরণ করে, পরদিন সকালেই বাপের সঙ্গে ফিরতে হয়েছিল তাকে। সেই থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর সেবা করে এসেছে সে। তারপর নতুন পাশ করা এক ডাক্তার এসে চন্দ্রমশায়ের পাঠশালা তুলে দেওয়ার ফলে সেখানে ছেলেদের পড়তে আসা বন্ধ হোলো। তাই সেই মশায়গিন্নির ওপর ডাক্তারের খুবই রাগ হয়েছিল। একদিন ঢেঁকিশাল থেকে বেরিয়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে ঘরের দাওয়াতেই শুয়ে পড়তে হোলো তাকে। বিকেলের দিকে জ্বর হোলো তার। বাড়িতে চাল ছিল না। তাই প্রতিবেশী মুখুজ্যেদের বাড়ি থেকে চাল আনতে যেতে হয় পদ্মবউকে। মুখুজ্যেগিন্নি চালও দিলেন, আদর-যত্নও করলেন—এবং পদ্মবউর হাতের আঙুল ফুলেছে দেখে তার কুষ্ঠ হয়েছে বলে তিনি সন্দেহও করলেন। পদ্ম ভয় পেলো,—গভীর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লো সে,—সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বেলে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগলো। তারপর—'নিশীথ রাত্রে ঝন্‌ঝন্ শব্দে চন্দ্রমশায়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ...পদ্ম নির্মম আক্রোশে দেওয়ালের দেব-দেবীর ছবিগুলি চুরমার করিয়া দিতেছে।' পদ্মর মুখ তখন রক্তাক্ত। চন্দ্রমশায় তার নাম ধরে ডাকলেন, কিন্তু তাতে সে দৃক্‌পাতও করলো না। চন্দ্রমশায় তার হাত ধরে ডাকলেন। তখন—'একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাটির উপর ভারকেন্দ্রচ্যুত মাটির প্রতিমার মতই সশব্দে পড়িয়া গেল। সে মূর্চ্ছা পদ্মর আর ভাঙিল না। ডাক্তার খানিকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বলিল, নিউট্রিশনের অভাবে এঁর বেরিবেরি হয়েছিল।'

আবার, 'ডাক-হরকরা' গল্পের ডাক-হরকরা দীনু ডোম তার নিজের ছেলের ডাক-লুটের চেষ্টার জন্যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। সেই ছেলে ফেরার হয়ে

আফ্রিকায় জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়েছে। অনেকদিন পরে এই নিরুদ্দেশ ছেলের মৃত্যু-সংবাদ এবং তারই জীবন-বীমার সাড়ে পাঁচশ' টাকা দীনু তার ডাকের থলিতে নিজেই বয়ে নিয়ে এসেছে। সেই দিন—'চোখের জল মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আর কাজ করব না বাবু, কাজে জবাব দিলাম।'

তারিণী মাঝি ময়ূরাক্ষীর খরস্রোতে খেয়া পারাপার করে। সে আর তার বউ সুখী—এই দুটি মানুষের জীবন-কথার মধ্যে সেই একই ধরনের তীব্রতা সঞ্চারিত হয়েছিল সে যুগে। 'জলসাঘর' বইখানির 'টহলদার', 'রাখাল বাঁড়ুজ্যে', 'ট্যারা' প্রভৃতি স্মরণীয় আরো কয়েকটি লেখার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে কথা থেকে এখন। এইবার তাঁর 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের কথায় এগিয়ে যাওয়া যাক।

তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী' উপন্যাস হিসেবে উচ্চ মূল্যের অধিকারী নয়, কিন্তু তাঁর অন্যান্য রচনাপ্রসঙ্গে তাঁর যে মনোধর্মের উল্লেখ করা গেছে, 'পাষাণপুরীতে' তার কিছু কিছু নিদর্শন আছে। এই বইখানি সর্বসমেত আট পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ; কাহিনীর সূচনাতেই এই বইয়ের নামের ব্যাখ্যা চোখে পড়ে। 'এ এক পাষাণ-পুরী'—অর্থাৎ জেলখানার বর্ণনা। এই কারাগারের ভেতরে কড়া শাসনের কাঠিন্য,—বাইরে শান্ত্রীদের অতি-নিয়মিত বিচরণ,—দিনে প্রকৃতির আলো, রাত্রে প্রকৃতির অন্ধকার। বন্দীরা প্রতিদিন প্রত্যুষে জেগে উঠে রাতের সুখস্বপ্নের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই সব বন্দীদের মধ্যেই একজনের নাম সাঈদ আলি। সাধারণ কয়েদীরা এক রকম, রাজবন্দীর দল অন্য রকম। এই রাজবন্দীরা 'পাষাণপুরীকে' বলে 'মুক্তি-মন্দির'! অন্য কয়েদীরা তাদের সম্বন্ধে বলে—আরে ওরা সব গান্ধীজীর চেলা। প্রতিদিন সকালে এই দলের উপাসনার ব্যবস্থা। নরু নামে একটি ছোট ছেলে এই উপাসনায় যোগ দেবে কি দেবে না, তাই নিয়ে সঞ্জীব নামে আর এক জনের সঙ্গে তার কিছু আলোচনা ঘটতে দেখা যায় বইয়ের প্রথম সাত-আট পৃষ্ঠার মধ্যেই। তাছাড়া সেই বন্দীশালার বিচিত্র দৃশ্য! জেলের কারখানায় ঘানি ঘোরে, চাকী ঘোরে, ঢেঁকি চলে, ছাপাখানায় কাগজের পর কাগজে কালির হরফ ওঠে, শতরঞ্চিতে ফুলের পর ফুল ফোটে—এবং এইভাবেই আরো নানারকম কাজ চলতে থাকে। এই

আয়োজনের মধ্যে প্রখর সূর্যকিরণে এক বুড়ো কয়েদী তার নির্দিষ্ট কাজ করে যায়,—এবং কাজ থেকে অন্যায়ভাবে সরতে গেলেই তাকে সিপাহীর হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। এই লাঞ্ছনার পরে সেই বুড়ো তার নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবে, তার মনে মনে পাপ-পুণ্যের চিন্তা দেখা দেয়। নরু আর সঞ্জীবের মধ্যে সেই পাপ-পুণ্যের কথা থেকেই আরো কথা ওঠে। হঠাৎ হরেন এসে পড়ে এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে। আবার কে একজন গেয়ে ওঠে— শিকলদেবীর এই যে পূজা-দেবী, চিরকাল কি রইবে খাড়া।' এইখানেই 'পাষাণপুরীর' প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি।

একদিকে এই রাজবন্দীর দল, অন্যদিকে সাধারণ অপরাধীর সাধারণ অপরাধ-প্রবণতা। একদিকে শক্তি-সামর্থ্য, আদর্শানুরাগ,—অন্যদিকে লোভ, হিংসা, সংকীর্ণতা! 'পাষাণপুরী'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাইদ আলি, কালা-পাগড়ী প্রভৃতি কয়েদীদের মধ্য দিয়ে এই সংকীর্ণতার দিকটাই বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের সূচনাতেই তারাশঙ্কর তাঁর অভ্যাস-মতন সাপ, বেদে, বিষ, অমৃত ইত্যাদি শব্দোল্লেখের সাহায্যে তাঁর চির-অনুশীলিত সমারোহময় একটি ভূমিকা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই রীতি-গত বৈশিষ্ট্যকে তাঁর মুদ্রাদোষেরই নামান্তর বলা চলে—যেমন, তিনি লিখেছেন:

> 'বেদে সাপকে ঝাঁপির ভিতর পুরিয়া রাখে, তার বিষদাঁত ভাঙে, বিষের থলি গালিয়া ফেলে; —কিন্তু বিষের উৎস তাহার নিঃশেষ হয় না। দিন দিন আবার সে বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চয় করে।
>
> 'দুনিয়ার প্রচলিত বিধানে পাষাণের অবরোধে পাপীকে আবদ্ধ করিয়া শিকলের পেষণে শাসক তাহার পাপকে বিনাশ করিতে চায়। কিন্তু তা হয় না। পাপীর পাপ শাসনে পেষণে নিঃশেষ হয় না, ভয়ে সাপের মত মনের কন্দরে গিয়া লুকায়। শুধু লুকায়ও না, কন্দরের মাঝে আহত সাপের মতই আক্রোশে গর্জায়। বিষকে অমৃতে পরিণত করিবার উপায় মানুষের বুঝি আজও জানা নাই। যদি-বা জানা থাকে, তবে শক্তির মত্ততায় শাসন প্রয়োগের প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে না। তাই দাগী চোর জেল খাটিয়া দাগী হইয়া ফিরে।'

সেই বর্ণনার মধ্যেই সাইদ আলির আচরণের বেশ একটু নমুনা পাওয়া যায়:

'পশ্চিমদিকের প্রাচীরের গায়ে নেবু-বাগান। নেবু-গাছের নিবিড়তার মধ্যখানে বেশ একটু গোপন স্থান। সেখানটিতে প্রাচীরের গায়ে সাইদ আলি উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া গলায় আঙুল দিয়া বমি করিতেছিল, আর এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। গলায় আঙুল দিতেছিল কিন্তু এমন ভাবে যেন শব্দ না হয়। মুখ হইতে বাহির হইল সিকি, দু আনি, হাফ-গিনি কয়টা। গলায় ওর থলি আছে।

'পাপের বোঝা গলায় বাঁধিয়া মানুষ মরণের বুকে ডুবিবে, তবু ত্যাগ করিতে পারিবে না।

'একটা সিকি রাখিয়া বাকিগুলা সব আবার সে মুখে পুরিয়া বিচিত্র কৌশলে গলায় থলির মধ্যে রাখিয়া দিল।

'হাসপাতালের ফটকে একটা কালা-পাগড়ী পাহারা দিতেছিল, তাহার কাছে আসিয়া সাইদ আলি কহিল,—মাল নিকালো—

'কালা-পাগড়ী দশ বিশ বছরের আসামী। এখন সে সিপাহী হইয়াছে। মাসে চার আনা তলপ। কালা-পাগড়ী পকেট চাপড়াইয়া হাত পাতিল।

'সাইদ হাসিয়া সিকিটা দেখাইল, দিল না। কহিল—একবার একটা সিকি মেরে দিয়েছে একজন। থো কড়ি খা পিঠে, বাবা, এক হাতে দাও—এক্ হাতে নাও।

'দাঁত মেলিয়া কালা-পাগড়ী কহিল,—বহুত হুঁসিয়ার হো তু সাইদ আলি।

'সাইদ আলি কহিল—এবারকার রুগী ফেরবারকার ওঝা। দাদা, বের কর এক বাণ্ডিল বিড়ি, শিবের জটা চার পয়সা, একটা দেশলাই।

'কালা-পাগড়ী হিসাব করে—তিন পয়সা বিড়ি, চার গো জটা, হুয়া সাত, আউর মাচিস এক পয়সা, আঠ, আঠ দোনা ষোল পয়সা—চার আনা। ঠিক ঠিকসে নিকালকে লে আয়া। নিকাল না আওর একগো চৌ-নি সাইদ আলী।'

এই সাইদ আলি আর কালা-পাগড়ীর পাশাপাশি আরো কয়েকজনকে দেখা যায়—পনের বছর বয়সের এক চোয়াড়ে শহুরে ছেলে,—পকেট কেটে চার মাস মেয়াদ হয়েছে তার,—তাছাড়া রায়াশালের মোট লম্বা মেয়াদের আসামী গৌরদাস,—বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, চুরির আসামী কেষ্টদাস। এ ছাড়া সভ্য 'বাবু'-চোরও আছে। জেলের মধ্যে কবিগানও ঘটে থাকে। বলা বাহুল্য, এও একরকম পুনরাবৃত্তি, এও তারাশঙ্করের প্রিয় উপকরণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষদিকে কেষ্ট, গৌর, গণশা—সাইদ, তহিদ, জোবেদ ইত্যাদি নানাজনের সমাবেশে এই কবিগান জমে উঠেছে। কেষ্ট গান ধরেছে: 'আজকে আমি রাবণ রাজা চৈতন্য আজ মন্দোদরী।' সমুচিত রসিকতার সঙ্গে চৈতন্য তারই জবাব দেয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শুরুতে 'বাবু'-চোরের চরিত্র বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্কর। সে মোটা টাকা ভেঙে জেলে এসেছে। তার ব্যবস্থা সাধারণ কয়েদীর মত নয়, সে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী। সে জানে সংসারে টাকাই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। এই সব বিচিত্র মানুষের মধ্যেই কখনো বা কোনো 'ভায়লেণ্ট' কয়েদী এসে উপস্থিত হয়। দারোগার সঙ্গে জেলারের বিশ্রম্ভালাপ শোনা যায়। এই সব কথা লক্ষ্য করতে করতে মনে হয় যে, 'পাষাণপুরী' জেলখানার কাহিনী বটে,—কিন্তু তারাশঙ্করের চিরাভ্যস্ত সাপ-বিষ-খুন-জখমের বিবরণের বহির্ভূত সত্যিকার অন্য কোনো জগৎ এখানে চোখে পড়ে না। আবার কখনো এসবের তুলনায় আরো কিঞ্চিৎ বীভৎস বর্ণনা,—যেমন—

'দারোগা জেলারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিল,—সাবধান, লোকটা কিন্তু বড় ভায়লেণ্ট।

'জেলার জিজ্ঞাসা করিল,—কেসটা কি?

—খুন।

—ডাকাতি করতে গিয়ে খুন না-কি?

—না। লোকটা ছিল একঘরে। গ্রামের কারুকে মানত না, তাই গাঁয়ের লোকে ওকে একঘরে করে। বেটা করলে কি রাত্তিরে লাগাতে লাগল আগুন। নালিশ হোলো, ওয়ারেণ্ট বেরুল। ও হোলো ফেরার। ফেরার মানে নিরুদ্দেশ নয়—আজ এ গ্রাম, কাল ও গ্রাম, এমনি আর কি। মোট কথা ধরতে পারা যায় না। শেষ যেদিন, মানে দিন-পাঁচেক আগে, আবার ও গ্রামে

দিলে বেড়া আগুন। সমস্ত গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। সেদিন গ্রামের সকল লোক ওর পেছনে করলে তাড়া; তিন দিন পেছনে লেগে লেগে কজনে ওকে এক জায়গায় ধরে ফেলে, কিন্তু তাদের মেরে ও আবার পালাল। ওই দেখছেন চিম্‌ড়ে চেহারা কিন্তু দেহে সাংঘাতিক ক্ষমতা মশাই। তার ওপর জাত কামার, লোহা-পেটা হাত। বাগিয়ে ধরতে পারলে পিষে মেরে দেবে। হ্যাঁ—সেখান থেকে পালিয়ে ও পাশের গ্রামের একখানা পোড়োবাড়িতে গিয়ে ঢুকে পড়ে। বাড়িখানা কোঠাবাড়ি। সেই কোঠার ওপরে গিয়ে লুকোয়। গ্রামের লোক ধরতে গেল; ওর হাতে ছিল একখানা শাবল, সেই শাবলের ঘায়ে সামনের লোকটার মাথা একেবারে চুর করে দেয়। অথচ সে লোকটাও ছিল এরই বন্ধু, বদমাইসিতে দোসর—

জেলার শিহরিয়া কহিল—

দারোগা বলিয়া চলিল,—বীভৎস দৃশ্য সে মশাই। লোকটার মুখ চোখ ঘিলু রক্ত—উঃ, শরীর শিউরে উঠছে। লোকটাকে আর চেনবার উপায় নেই। আর সে লোকটা কী জোয়ানই ছিল। খুন হতেই গ্রামের সব লোক দে ছুট। তারপর আবার তাড়া করে, তিন ক্রোশ দূরে আর একটা গ্রামে, মেরে ঘায়েল করে তবে ওকে ধরি। দেখুন না, কপালের ক্ষতটা আর-পিঠে মারের দাগ। তা-ও ভাগ্যিস তখন ওর হাতে কিছু ছিল না।'

'পাষাণপুরী'র এই বীভৎসতার সঙ্গে এ-লেখার অনেক পরের রচনা 'তামস-তপস্যা'র [প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৫৫] পানুদাসের মিল অনুভব করা যায়। হয়তো প্রথম জীবনের জেলখানার অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর পরিণত জীবনের লেখাতে এই পানুদাসের আবির্ভাব ঘটেছে। 'পাষাণপুরী'র আরো অনেক চরিত্রের কথা বলা যেতে পারে। যেমন, গোঁসাইজী। গোঁসাইজীর ধরনটা সাধু-সন্ন্যাসীর মতন—এক খুনের মামলায় পড়ে তাঁকে সাত বছর জেল খাটতে হয়। কিন্তু তিনি হাত দেখতে পারেন, স্বদেশীবাবুরা তাঁর নাম দিয়েছেন 'রাসপুটিন'। আবার জেলের মেথর উমেশ ময়রাও আছে। অশ্লীল গানের বই পড়তে তার আর ভালো লাগে না,—জীবনে পাপের পথ থেকে সে অন্য পথে সরে

আসতে চায়। এদিকে সেই জেলখানাতে বসেই অন্য ধরণের মানুষ—কিশোর নক্স ছাদ থেকে খসে পড়া পলেস্তারার টুকরো দিয়ে মেঝের ওপর লিখে রাখে—

'মানুষের ভয়,—
সে-ত কভু মরণকে নয়।
দুর্ভেদ্য তমসা-মাখা আবরণ তার
ভয় সেই; ভয় শুধু তারে অজানার।'

কালী কর্মকারও আছে। তারই মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রসঙ্গে 'বাবু'-চোর সুরেশ বলে,—'হয়তো বা মৃত্যুর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনাকে, মানে Self-কে চিনতে পারে,—জীবনের চেয়েও বড় কেউ তার ভেতরে জেগে ওঠে। মানবের জাগরণ, এই হয়তো মানবের জাগরণ,—যা ওই ছেলেটি জন্ম থেকে নিয়ে এসেছে; —না ওর সঙ্গে কিছুর তুলনা করা ঠিক নয় ও আমাদের কল্পনার বাইরের বস্তু।'

'পাষাণপুরী'র এই মৃত্যু-ভাবনাও তারাশঙ্করের অভ্যস্ত প্রধান ভাবনাগুলিরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর 'আগুন' উপন্যাসের হীরুর কথা মনে পড়ে, —মনে পড়ে 'আরোগ্য-নিকেতন' আর 'যোগভ্রষ্টে'র কথা। খুন-জখমের বীভৎসতা সম্বন্ধে 'পাষাণপুরী'র কালী কর্মকারের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'তামস-তপস্যা'র পানুদাসের কথাও সেই সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পানুর বাপ শ্যামাদাসের বাড়ির পাশেই ছিল মাধব ময়রার বাড়ি। তারই অদূরে পুলিশের থানা। নাকু দত্ত ছিল সংসারে একা মানুষ। একরাত্রে থানার কাছেই তার বাসস্থানে সে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়েছিল। পরদিন সকালে দেখা যায়—'নাকু দত্ত দোকানের বারান্দা হইতে গড়াইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া আছে, আতঙ্কবিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টি, তাহার গলার নলীটা কে বা কাহারা দুই ভাগে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। বিছানাটা রক্তাক্ত, ফোয়ারার মত রক্তের ফিনকিতে দেওয়ালটাও রক্তাক্ত। নাকুর দেহের পাশে রাস্তার খানিকটা অংশের ধূলা কাদার মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। নাকুর দরজা ভাঙা, ঘরের জিনিসপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, বন্ধকী সোনা-রূপার অলঙ্কারের নাকি একটুকরাও নাই।'

'পাষাণপুরী' আর 'চৈতালীঘূর্ণী'—এই দু'খানি বই যে একই সঙ্গে লেখা শুরু হয়,—সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই দু'খানি বইয়ের একটিতেও যথার্থ নতুন কোনো রকম সামর্থ্যের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি নেই।

তবু, তাঁর সাহিত্যিক মনের গঠন,—উপন্যাস-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণার সূত্রপাত,—তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা,—রাজনৈতিক চিন্তা,—এবং সে চিন্তা বা অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে রূপ দেবার জন্যে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ—এই সব দিক থেকে তাঁর এই দুখানি বইয়ের পরিমণ্ডল ও রচনাকাল সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

এ তো স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় যে, সে সময়ে সাহিত্য-সাধনার পথে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে বটে,—কিন্তু কী যে তাঁর বক্তব্য, সেটা সুস্পষ্টভাবে আকার পায় নি! তখন শরৎচন্দ্রের অনুকরণ চলছে,—'কল্লোল', 'কালিকলম' ইত্যাদি পত্রিকার নতুন লেখক-গোষ্ঠির প্রভাবও এসে পৌঁছেচে,—মনের গভীরে নিজের স্বতন্ত্র পথ রচনার আগ্রহও দেখা দিয়েছে। এই নানা ইচ্ছা, বিচিত্র উদ্যম, বিভিন্ন সান্নিধ্য এবং মিশ্র আবহের মধ্য দিয়েই তখন তাঁর মন এগিয়ে চলেছে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রীতি এবং পরিচয়ের সূচনা হয় তারই কাছাকাছি সময়ে। জেলখানায় বাস করেই তাঁর মোহ কেটে গিয়েছিল—এ কথা তিনি বার বার বলেছেন। এই 'পাষাণপুরী'র বিভিন্ন অপরাধী চরিত্রের পাশাপাশি তিনি যে রাজনৈতিক বন্দীদের ছবি এঁকেছেন, সে-সব ছবি এই কারণেই স্মরণীয়। এবং 'পাষাণপুরীর' অনেক পরের বই 'যোগভ্রষ্টের' কথা এখানে বার বার মনে পড়া স্বাভাবিক। রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি যে সংকীর্ণতা লক্ষ্য করেছেন, এইসব ক্ষেত্রে তাঁর সেই অভিজ্ঞতারই ছায়া পড়েছে। 'যোগভ্রষ্টের' (প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৭) ধীরেন বাবুর কথা স্মরণীয়!

'কল্লোল' পত্রিকায় 'রসকলি' এবং 'হারানো সুর' প্রকাশিত হবার পরে—সেই ১৩৩৫ সাল থেকেই 'কালিকলম', 'উপাসনা', 'ধূপছায়া ইত্যাদি পত্রিকায় লেখবার জন্যে আমন্ত্রিত হন তিনি। 'রসকলি' এবং 'হারানো সুর'—দুটিই প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর তিরিশ সালের আন্দোলন। সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েই তিনি জেলে গিয়েছিলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১—অর্থাৎ জেলে যাবার আগে থেকে শুরু করে, জেল থেকে বেরিয়ে আসবার মধ্যবর্তী এই দু'বছরের কথা-প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর নিজে বলেছেন:

'এই কিছু কম দুটো বছর আমার মনের অবস্থা দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধার মধ্যে রাজনৈতিক জীবনাবেগটাই ছিল প্রবল। এক সময়

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে জাগিয়ে দিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শাসন-মুক্ত করবার সংকল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মত লেলিহান। সে বহ্নি ছিল পরম পবিত্র। কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর ১৫।১৬ সালে তিনি যখন অন্ধ নিয়তিকে বন্য ঘোড়ার মত বেঁধে তার পিঠে সওয়ার হয়ে নিরুদ্দেশ—তখন হঠাৎ আমার বোনের বিবাহ-উপলক্ষ্য করে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ওদিকে বাংলার বিপ্লবের ক্ষেত্রে নিদারুণ দুর্যোগ নেমে এল। দিকে দিকে ব্যর্থ হয়ে গেল বিপ্লবের উদ্যম। আমাকে কিছুদিন ধরেই পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে কাটাতে হোলো। তারপর এলো উনিশ শো একুশ। একটা যুগান্তর ঘটল ভারতের রাজনৈতিক জীবন-ক্ষেত্রে। আমার জীবন-ক্ষেত্রেও এলো। আমি দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ পাই নি। কাজেই আমার জীবনে দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশা বড় ছিল না। দেশপ্রেমের আবেগটাই বড় ছিল।'

তিনি আরো বলেছেন :

'১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শ-গত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবল ভাবে।...'

অতঃপর 'কালিকলম' পত্রিকায় তাঁর 'শ্মশানের পথ' গল্পটি ছাপা হয়। সেই গল্পটিই পরে 'চৈতালীঘূর্ণী' উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়। 'চৈতালী-ঘূর্ণীর' আগেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিসেবে তাঁর কবিতার বই 'ত্রিপত্র' বেরিয়ে গেছে। সেই সময়ের আরো দু'একটি কথা এখানেই স্মরণীয়। 'ত্রিপত্র' বইখানির কথা-সূত্রেই তাঁকে লিখতে দেখা গেছে :

'আমার এক শ্যালক—তিনি স্বর্গত, মহা উৎসাহী যুবক, ঝড়ের মত প্রকৃতি,—গানে, বাজনায় অভিনয়ে, উল্লাসে, হুল্লোড়ে, সামীপ্যিতে সে একেবারে অদ্বিতীয়। ব্যবসা করতে নেমেই প্রচণ্ড ব্যবসা এবং প্রকাণ্ড লোকসান করে বসলেন।...এই ছেলেটি আমার থেকে বয়সে বছর-কয়েকের ছোট ছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর হিসেবে এবং স্বকীয় স্বাভাবিক গুণে আমার পেট্রন হয়ে

উঠলেন। এবং জোর করে আমার কবিতার খাতা নিয়ে—কবিতার বই ছেপে বসলেন। লাল কালিতে ছাপা কবিতার বই। ছাপা হোলো কোন প্রেসে মনে নেই, তবে কয়লার ব্যবসায়ী মহলের লেটার-হেড ছাপা হোতো সেখানে। এবং বইগুলি এসে উঠল শ্যালকের আপিসে। কোণে বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে রইল। অতঃপর শ্যালক কলকাতার ব্যবসায়ের পাট উঠিয়ে গেল রানীগঞ্জ অঞ্চলে; বইগুলি এবার স্থানান্তরিত হোলো সালিখার এক লোহার কারখানায়। এদিকে শ্যালকটি একদিন মোটর সাইকেলে চড়ে রানীগঞ্জ অঞ্চলের পাথুরে ডাঙার উপর পাথরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে বুকে আঘাত পেলেন, তা থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল নিউমোনিয়া এবং তাতেই তাঁর ঝঞ্ঝার মত জীবনের অবসান হোলো। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 'ত্রিপত্রে'র সর্ব সন্ধান বিলুপ্ত হোলো।'

'আমার সাহিত্য জীবন'-এর এই অংশেই (পৃঃ ৩৫) তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসের কথা বলেছেন:

> 'রাজনৈতিক জীবনের ভাঁটার সময় একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলাম—'মারাঠাতর্পণের' সঙ্গেই। বা কিছু আগেই। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল শিশির বসু সম্পাদিত 'এক পয়সার শিশিরে'। তখন 'সচিত্র শিশির' এবং 'এক পয়সার শিশির' বলে দুখানি কাগজ চলতো। বইখানির নামও মনে নেই; তার কোন চিহ্নও নেই। শিশির বসুর কাছেও নেই। কারণ, তখনও নূতন যুগের রচনা পড়ে পথ পাই নি, শরৎচন্দ্রকে অক্ষমভাবে অনুকরণ করেছিলাম।'

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাম করে 'পূর্ণিমা' পত্রিকার জন্যে লেখা সংগ্রহের কাজে নেমে শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর তখন আলাপ হয়েছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সঙ্গে তখন তিনি পরিচিত হয়েছেন। জগদীশ গুপ্তকেও দেখেছেন,—তবে 'গুপ্ত কোনো কারণে 'পূর্ণিমা'র উপর বিরূপ ছিলেন; তাঁর সঙ্গে আদৌ জমে নি।'

তাঁর যে বংশে জন্ম, একদিকে সেই ছোট জমিদার বংশের আর্থিক দায়-দুর্গতির কথা—অন্যদিকে, সেকালের বিশেষ ভূস্বামী-শ্রেণীর আচার-আচরণ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বোধ—প্রজার কাছে খাজনা আদায় করা,—সুদ

নেওয়া,—এমন কি ভাই মারা গেলে তারাই বিধবার হিতৈষী সেজে তাকে বঞ্চিত করবার কৌশল,—সেই সঙ্গে আবার কংগ্রেসকর্মী হিসেবে তাঁদের বিশেষ পরিচয়,—অন্যদিকে তারাশঙ্করের শ্বশুরকুলের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইশারা,—কলিয়ারির মালিক তাঁরা,—তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিন্ন এক জগৎ—'চৈতালী-ঘূর্ণীতে' তিনি এই দুই জগৎকে এক পাত্রে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। 'আমার সাহিত্য-জীবন' বইখানির মধ্যেই তিনি (পৃঃ ৪৯) বলেছেন :

'শ্বশুর-কুল আমার কলিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদার-ঘরের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার আপিসে, কখনও কয়লা-কুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস-ছয়েকের বেশি লেগে থাকতে পারি নি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হই নি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।

'দুই অভিজ্ঞতাকে জুড়ে 'চৈতালীঘূর্ণি'র সৃষ্টি।

'জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। 'উপাসনা'র সম্পাদক কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিল, এবার তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন। তাঁর 'উপাসনা'তেই 'চৈতালীঘূর্ণী' বের হল। 'কল্লোল', 'কালিকলম' তখন নাই।

'...বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাঙালার যৌবনশক্তির তিনি প্রতীক। নব যুগের অগ্রদূত। শুধু তাই নয়, আগেই বলেছি এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের আবেগের সমধর্মিতা ছিল। সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। এখন তাঁর 'পাষাণপুরী'র কথাতেই আর একবার ফিরে যাওয়া যাক। 'পাষাণপুরী'র অপরাধী চরিত্রগুলির মধ্যে কালী কর্মকার, সাইদ, সুরেশবাবু, গিরিশ চাটুজ্যে ইত্যাদি অনেকেরই এমন কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, যে-জন্যে সুদীর্ঘকাল পাঠকের স্মৃতিতে তারা থেকেই যায়। কালী কর্মকার খুন করে এসে খুনের অভিজ্ঞতা কিছুতেই ভুলতে পারে না,—শেষে পাগল হয়ে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়—তখন তার 'স্থান হইল সিগ্রীগেশন সেলে'। গণশা হাতুড়ি পিটতে পিটতে বলে—'জানিস

মাইরি, আমাকে যদি দুনিয়ার রাজা করে দেয় ত আমি দুনিয়াটাকেই একটা জেলখানা করে দিই। সব বাবা খাটো আর খাও, খাও আর খাটো, পয়সা কেউ পাবে না।' নতুন আর একজন কয়েদী বলে—'ডাকাতি কল্লাম চের এই পঞ্চাশ বছরে, পঁচিশ বছরে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত গোটা ষাট-সত্তর তো হবে। দেখলাম একটা একবার আরম্ভ কল্লে হয়, তারপর আর বাঁধ মানে না। তবে আমার ডাকাতি হিংসেয়, লোভে, অভাবে,—এ আমি ঠিক বলতে পারি। কতবার চেষ্টা করেছি ভাল হয়ে থাকতে, তা শালারা থাকতে দিলে না।' জেলার এবং ডেপুটি জেলার দু'জনেই কয়েদী-গোঁসাইজীকে খুব খাতির করেন। গোঁসাইজী হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। এদিকে রাজনৈতিক বন্দী নরু তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। আবার ভূতপূর্ব পুলিশের সাব-ইন্‌স্পেক্টর গিরিশ চাটুজ্যে তার নিজের ধর্মনিষ্ঠা এবং ভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে বলে—'জান, পুলিশের সাব্-ইন্‌স্পেক্‌টারি করেও কখনও ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খাই নি,—মহামায়াকে প্রণাম না করে কোনো কাজ করিনি? মায়ের পুষ্প পকেটে নিয়ে যেখানে গিয়েছি, সেইখানেই সাক্‌সেস্! সুরেশ বিশ্বাসকে নিজের জীবনের কথা বলতে-বলতে অমর রায় নিজের গায়ের জামাটা তুলে অগ্নিদাহের ক্ষত-চিহ্নটা দেখিয়ে দেয়। সে তার প্রথম জীবনে মনুষ্যত্বের বিরাট এক আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। জমিদারের কবল থেকে সে না-কি একটি মেয়েকে রক্ষা করবার জন্যে আন্তরিক চেষ্টাও করেছে। কিন্তু সেই অত্যাচারী জমিদারের চক্রান্তে আদালতে সেই মেয়েটিই নাকি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। তারই ফলে তার বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ হয়ে গেছে—পাঁচ বছর জেল আর বিশ ঘা বেত! শেষ কালে জেলে এসে সেই আদর্শবাদী অমর রায়ই গাঁজা খেতে শুরু করেছে। তবু এখনো কোনো কোনো দিন তার হঠাৎ মনে পড়ে যে, এক সময়ে সে কবিতা লিখতে পারতো! কয়েদী-জীবনের এই সব ঘটনার মধ্যেই সাইদের নামে একদিন এক চিঠি আসে। তার সাত-আট বছরের ছেলেটার মৃত্যু হয়েছে সর্পাঘাতে।

'পাষাণপুরী'তে গল্পের ধারা মোটেই সুবিন্যস্ত বা সুগঠিত নয়। নানা অপরাধীর নানা ছবি সাজিয়ে এখানে বিষয়ের ঐক্য বজায় রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু একে কোনোমতেই আখ্যানের পরিণতির অথবা চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তির উদাহরণ বলা চলেনা। তবে এখানেও তারাশঙ্করের চিন্তাপ্রবণ

স্বভাবের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাঁর মৃত্যু-সম্পর্কিত ধারণার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া আরো মতামত আছে। ন্যায় বিচারের আদর্শ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা হয়েছে। তাই তাঁর 'বিচারক'-এর কথা মনে পড়ে। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ সম্বন্ধেও সুরেশ আর অমরের দু'একটি মন্তব্য আছে। জেলখানার গল্প হিসেবে, আরো সাম্প্রতিক কালে জরাসন্ধের 'লৌহ কপাট'-এর প্রসিদ্ধি হয়েছে। তারাশঙ্করের এই 'পাষাণপুরী' জরাসন্ধের সে-লেখার বহু পূর্ববর্তী রচনা—এবং 'পাষাণপুরী'ও কতকটা সেই একই জাতের রচনা।

'পাষাণপুরী' প্রকাশের প্রায় তিন বছর পরে 'ছলনাময়ী' গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এই বইখানি তাঁর শৈশবে লোকান্তরিতা কন্যা বুলুরাণীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। 'সন্ধ্যামণি', 'মেলা', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'খড়্গ' 'ডাইনীর বাঁশি', 'ঘাসের-ফুল', 'ব্যাধি', 'রঙীন চশমা', 'মুখুজ্জে মশায়' এবং 'ছলনাময়ী'—এই দশটি গল্পে ছলনাময়ী বইখানি সম্পূর্ণ। বইয়ের নাম-গল্পটিতে এক কয়লা-খাদ অঞ্চলের পটভূমিতে তন্ত্রসাধনালব্ধ অলৌকিক শক্তির কথা বলা হয়েছে। শ্বশুরের কলিয়ারিতে ঠিকাদারি কাজ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন জামাতা অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন স্টোরবাবু, সার্ভেয়ার চক্রবর্তী—কলিয়ারির পরিভাষা অনুসারে যিনি 'কম্পাসবাবু' নামে পরিচিত,—আর এসেছেন মুন্সী দু'জন, আর খাদবাবু। তখন সন্ধ্যা। পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হয়েছে। কম্পাসবাবু নিজে ম্যানেজারের তন্ত্র-সাধনার কথা বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সামনের মাঠে উজ্জ্বল একটি আলো এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারবাবু এসে পৌঁছোলেন! তিনি শীর্ণ এবং খর্বাকৃতি,—কাঁচা পাকা দীর্ঘ রুক্ষ চুলে তাঁর মুখ যেন ঢাকা পড়েছে—ঘন ভুরুর নিচে তাঁর অদ্ভুত দুটি চোখ—'কোটরগত অতি ক্ষুদ্র চোখের প্রদীপ্ত তারা দুইটি অচঞ্চল, স্থির,—দৃষ্টি নিমেষহীন, কঠিন। প্রান্তরের বুকের অদূরবর্তী ঘনান্ধকার পটভূমির সম্মুখে সে মূর্তি যেন এক অদ্ভুত-শোভন রহস্য।' কথায় কথায় তিনি বললেন—'তান্ত্রিকসাধনায় মানুষ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করতে পারে, অমিয়বাবু। অদ্ভুত সে শক্তি। আধুনিক যুগের বিশ্বাস সে শক্তি অন্ধ। কিন্তু তা নয়। সে সজ্ঞান, চঞ্চলা, ছলনাময়ী। ছলনায় সে মানুষকে প্রতারণা করে।' সেই তন্ত্রসাধনার বলেই তিনি শক্তি-

পেয়েছেন বটে, কিন্তু সেও সামান্য শক্তি! ইচ্ছে করলেই নিজের হাত থেকে তিনি নানা সুগন্ধের ঝলক সৃষ্টি করতে পারেন। কম্পাসবাবুর অনুরোধে অমিয়কুমারকেও তিনি তাঁর সে-শক্তি দেখিয়ে দিলেন। ঈষৎ হেসে তিনি নিজেই বললেন—'সামান্য শক্তি। মধ্য-জীবনে সন্ন্যাস নিয়ে তন্ত্রসাধনায় একটু পেয়েছি। রাক্ষসী ছলনাময়ী সামান্য দিয়ে আমায় প্রতারণা করলে। ...অসীম, অসীম শক্তি লাভ করা যায়—যা রাজার নেই, সম্রাটের নেই, জ্ঞানীর নেই, কারও নেই।'

পরদিন সকালে সেই কম্পাসবাবুর মুখেই ম্যানেজারের বিষয়ে আরো দু' একটি কথা শোনা গেল। ভদ্রলোক নিজের আঠারো বছর বয়সের মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করেন না,—নিজের স্ত্রীকে প্রহার করে থাকেন। আপিসে এসে অমিয়কে ডেকে নিয়ে পাঁচ নম্বর ইনক্লাইন দেখাতে চললেন তিনি। যেতে-যেতে,—দিনের আলোতে, অমিয়র চোখে পড়লো তাঁর আসল রূপ—'রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ-ললাট ত্রিবলীরেখার মতন কুঞ্চন রেখায় রেখাঙ্কিত। নাসিকার প্রান্তের বামপার্শ্ব ঈষৎ স্ফীত, তাহার কোলে কোলে গণ্ডদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি কুঞ্চন-রেখা ঈষৎ নিম্নে শ্মশ্রুগুম্ফের মধ্যে আবৃত হইয়া গেছে। অসন্তোষে—ক্রোধে—ঘৃণায় মানুষটি যেন অতিমাত্রায় জর্জর, তাহারই অভিব্যক্তি পূর্ণপ্রকটিত।'

তারাশঙ্করের ভূরিপরিমিত রচনার মধ্যে তাঁর এই 'ছলনাময়ী' গল্পটি অতি সামান্য এক অংশ বটে,—এবং সেই কারণেই এখানে এইসব গল্পের বিস্তৃত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর রচনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর লেখক-সত্তার প্রধান যে সব বিশেষত্ব চোখে পড়ে, সেই বিশেষত্বের ভাবনা-সূত্রেই 'ছলনাময়ীর' এই পর্যবেক্ষণ-শক্তির কথা উল্লেখ করা গেল। মানুষের মুখে অসন্তোষ, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদির রেখা-সমাবেশ এখানে যেন প্রত্যক্ষ ভাবে ধরা পড়ে,—সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা বলে বোধ হয়।

সে যাই হোক, পাঁচ নম্বর ইনক্লাইনের দিকে যেতে যেতে ম্যানেজার বলেন যে, ঠিকাদারের কাছ থেকে তাঁর কিছু টাকা পাওয়া দরকার। টাকা তাঁকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শব-সাধন সার্থক করে তুলতে সাহায্য করবে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি এমন এক বিষয় উত্থাপন করেন, যা—তাঁরই স্রষ্টা তারাশঙ্করের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ,—তাঁর সেই পরিচিত জীবন-মৃত্যু কথা! তাঁর সে উত্তেজনার উপমা দিতে গিয়ে বলা' হয়েছে,—'উত্তেজনার আবেগে

কণ্ঠস্বর অদূরের বয়লার-গর্ভের রুদ্ধ বাষ্পশক্তির মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।' ম্যানেজার বলছিলেন তান্ত্রিক-সাধনা-লব্ধ শক্তির কথা:

'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপ, দুর্লভ বিলাস, শ্রেষ্ঠ আহার ইচ্ছামাত্রে ক্রীতদাসীর মত সে জোগাবে। আর প্রভুত্ব? কি প্রভুত্ব আছে সম্রাটের? মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করতে পারে সে? মৃত্যু যখন আসে তখন সে সাধারণ মানুষের মত ভগবান ভগবান বলে নির্মম প্রকৃতির পায়ে মাথা কোটে। অন্ধ মানুষ জানে না—নির্মম নিষ্ঠুরা প্রকৃতি ক্রন্দনে টলে না, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। তাকে আয়ত্ত করতে হয়, জোর করে স্ববশে আনতে হয়, —নারীর মত—পৃথিবীর মত। তখনই সে হয় দাসী, মানুষের মনোরঞ্জনে বেশ্যার চেয়েও সে তখন মিষ্টমুখী।'

কিন্তু সাধনার জন্যে টাকার কী দরকার? —অমিয়র সে-প্রশ্নের জবাবে ম্যানেজার বলেছেন—'একান্তই শুনতে চান যখন শুনুন, শব চাই। উপযুক্ত শবসংগ্রহের জন্যে চাই অর্থ। অমিয়বাবু, আমার প্রয়োজনমত উপযুক্ত শব শ্মশানে আসবে না। তাকে নিয়ে আসতে হবে। জীবন্ত মানুষকে শব প্রস্তুত করে নিতে হবে।' তাঁর এই কথা শুনে অমিয়বাবু তাঁকে নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই কম্পাসবাবুর মুখ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, খাদের কর্মীরা কাজে যোগ দিতে নারাজ—কম্পাস বলেছে, সে-সবই নাকি ম্যানেজারের 'অন্তর টিপুনির ফল'! ম্যানেজার সত্যিই কুলিদের কাজে যেতে নিষেধ করেছেন বলে জানা গেল। অমিয় নিজেই ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়ে তাঁর অবস্থাটা ভালো করে দেখে এলেন। অমিয়র প্রশ্নের উত্তরে ম্যানেজার নিজেই বললেন যে, স্ত্রীকে এবং কন্যাকে তিনি সত্যিই প্রহার করে থাকেন,—তাতে কারও কিছু বলবার নেই,—কারণ—'আমি একজনের স্বামী, একজনের পিতা অর্থাৎ প্রভু। বুঝলেন?' ম্যানেজারের ঘরের বর্ণনাও সত্যিই চমৎকার—'একদিকে একখানা মাদুরের উপর কতকগুলো মুড়ি ছড়ানো, কোণে একটা শূন্য বোতল...মদের বলিয়াই মনে হয়... গড়াগড়ি যাইতেছে, পাশেই গাঁজার কলিকারও সন্ধান মিলিল। দরজা-বিহীন একটা দেওয়াল-আলমারির উপর একটা নরকপালের পাত্র, একটা পেরেকে ঝুলান একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। সারা ঘরের মধ্যে

বসিবার কোন আসন নাই।' ম্যানেজার বললেন যে, চাকরি তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন—তিনি 'ডাক' পেয়ে গেছেন—অতএব 'আজ থেকেই আরম্ভ করব আমি। এক্ষুনি বেরুব নদীর ধারে—কৃষ্ণসর্প চাই আমার।' অমিয়বাবু তাঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় তাঁরই মুখ থেকে শোনা গেল—'বুঝবেন না, আপনি সে বুঝবেন না অমিয়বাবু। আনন্দ-অমৃত ওইখানে আছে। ঐ শক্তি তার উৎস। এর স্বাদ আপনি পান নি, আপনি এর আকর্ষণ জানবেন না। অভিসারের আকর্ষণের মত্ততা অভিসারিকা ভিন্ন অপরে অনুভব করতে পারে না, অমিয়বাবু।' হয়তো, এই অভিসারের আকর্ষণ বশেই সংসারে একান্ত প্রিয়জনের প্রতিও তান্ত্রিক কোনো আকর্ষণ বোধ করেননি। ম্যানেজার সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন। কম্পাসের সঙ্গেই তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এবং সেই রাত্রেই কম্পাসের ঘরে বৃহৎ এক বিষধর সাপ দেখা দিয়েছিল। কম্পাস বাসরে ছিল বলেই বেঁচে গেছে, ঘরে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতো না সে। কয়েক দিন পরেই কিন্তু অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল। শোনা গেল, খাদের নিচে কম্পাস নাকি ধ্বস চাপা পড়ে মারা গেছে! তবে,—পরেও কানাই কম্পাসের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তাই শ্মশানে তার কুশপুত্তলী দাহনের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু—

'অকস্মাৎ নৈশ-প্রকৃতির মর্মচ্ছেদ করিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা! শব্দলক্ষ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকলে দেখিল ঈষদ্দূরে সেই জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে সদ্যবিধবার মূর্তি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

'ছুটিয়া সকলে অগ্রসর হইয়া গেল।

'জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখের শবারোহী, খর্বাকৃতি তান্ত্রিক লাফ দিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—দূর দূর, দূর হ!

'মেয়েটি আর্তনাদ করিয়া উঠিল—কি করেছ বাবা গো—ও যে আমার ..!

'অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দেখা গেল, কম্পাসের নিথর বিবর্ণ শবদেহ পড়িয়া আছে আর তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তান্ত্রিক।

'অমিয় চীৎকার করিয়া উঠিল—পাষণ্ড!

'কোথায় কে? দূরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া শব্দ আসিল—আঃ—ছি, ছি, ছি! আঃ—আঃ।

'মানুষ কয়টি নির্বাক নিস্পন্দ। সদ্যবিধবার আর্তধ্বনিও মূক হইয়া গেছে। আবার নৈশ-অন্ধকারের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া রব উঠিল—এবার আরও দূরে—আঃ—আঃ।

'কে যেন কাহাকে নির্মম কশাঘাতে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে।'

একালের বাংলা কথা-সাহিত্যে এ-রকম দৃশ্যে তারাশঙ্করই প্রথম পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সেই প্রবণতা ধরেই পরে দেখা দিয়েছেন অল্প কালের জনপ্রিয় 'অবধূত'!

তন্ত্রশক্তির প্রতি উন্মাদ অনুরাগের ছবি ফুটিয়ে,—অসাধারণ পরিবেশের চমক দেখিয়ে,—অলৌকিকের মিশ্রণ ঘটিয়ে, তারাশঙ্কর এ-গল্পে তাঁর অভ্যস্ত স্বভাবেরই আনুগত্য করেছেন। গল্পের শিল্পাদর্শের দিক থেকে তাঁর এই 'ছলনাময়ী' লেখাটিতে এইখানেই সমাপ্তির ছেদ পড়লে ভালো হোতো। শ্মশানের নৈশ স্তব্ধতা, চিতার অগ্নিকুণ্ড, সদ্যবিধবার আর্তনাদ, শব এবং শব-সাধক—এই সব অসাধারণ উপকরণের সমবায়ে এ-গল্পের এই যোগ্য আবহটিই নিঃসন্দেহে এক স্থায়ী ব্যঞ্জনাপ্রকাশের সহায়তা করতো। কিন্তু আরো পরবর্তী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়ে, দীর্ঘ দশ বছর পরের এক দৃশ্য দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। তখন অমিয়কুমার বেশ ধনী ব্যবসায়ী, বালিগঞ্জ অঞ্চলে বাড়ি গাড়ি সবই হয়েছে তাঁর! সেই অবস্থায় এক রাত্রে এক উন্মাদ ভিক্ষুকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, সেই ভিক্ষুকই গল্পের ভূতপূর্ব ম্যানেজার। বিলাসপুরিয়া এক কুলির সাহায্যে কানাই কম্পাসকে তিনি যে হত্যা করেছিলেন, সে কথা কবুল করে তান্ত্রিক বললেন—'কম্পাসের দেহ অতি লক্ষণযুক্ত ছিল।—তার ঘরে সাপও আমি দিয়েছিলাম।' তিনি আরো বললেন, 'রাক্ষসী ভীষণ প্রতিশোধ নিয়েছে মনে করেছে। কিন্তু না, আবার আমি দেখব।' তখন—

'অমিয় শিহরিয়া পা বাড়াইল। তিনি কহিলেন—কিছু পয়সা দেবেন? কদিন খাইনি কিছু।

'অমিয় পকেটে হাত দিয়া কিছু অর্থ বাহির করিতেছিল। অকস্মাৎ অতি চঞ্চলভাবে খর্বাকৃতি মানুষটি বলিয়া উঠিল—আঃ, ছি, ছি, ছি!

> 'দুই হাত দিয়া সম্মুখের শূন্য পটভূমি হইতে কি যেন সে মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে আপনার হাতখানা সজোরে ক্ষিপ্ত পশুর মত সে কামড়াইয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে দাঁতের পাশ দিয়া বীভৎসভাবে রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িল।
>
> 'সভয়ে অমিয় ডাকিল—ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু। ক্ষত-বিক্ষত হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া রক্তাক্ত-মুখে একান্ত শান্ত ক্লান্ত ভাবে তিনি বলিলেন—অতি যন্ত্রণায় সম্বিত ফিরে আসে—তাই। মানুষ ত অমিয়বাবু ··।'

প্রধানতঃ সাপ, বেদে, তান্ত্রিক, শ্মশান, শিকার প্রভৃতি উপকরণের দিকেই তারাশঙ্করের নজর থাকে। গল্প-উপন্যাসের শিল্পরূপের দিকে তাঁর সত্যিই খেয়াল কম। 'ছলনাময়ী'র গল্পগুলিতেও তাঁর এই সাধারণ স্বভাবেরই লক্ষণ দেখা যায়। 'সন্ধ্যামণি'তেও শ্মশানের ছবি,—'মেলা' গল্পে মেলার ছবি,—'খড়গ' লেখাটিতে রায়বংশের কীর্তিকলাপ আর জীব-হত্যার ভাবনা—এই সবই তারাশঙ্করের নিজস্ব উপকরণ। তবে শিল্পের ভাবনা তিনি একেবারেই যে না ভেবেছেন, তা নয়। সেই সূত্রে এবং তাছাড়া অন্যান্য কারণেও তাঁর 'রাইকমল' বইখানির কথা মনে পড়ে।

গ্রন্থাকারে 'রাইকমল' প্রথম দেখা দেয় তেরশ বিয়াল্লিশের আশ্বিনে। আট বছর পরে তেরশ পঞ্চাশের শ্রাবণ মাসে সে বই পুনর্মুদ্রিত হয়। তেরশ বাহান্নো সালের ভাদ্র মাসে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়—এবং তার তিন বছর পরে তেরশ পঞ্চান্নোর শ্রাবণ মাসে আবার এক পুনর্মুদ্রণ ঘটে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (ভাদ্র, ১৩৫২) তারাশঙ্কর বলেছিলেন: 'চৈতালীঘূর্ণী' প্রথম প্রকাশিত হইলেও---রচনা হিসাবে 'রাইকমল'ই আমার প্রথম উপন্যাস।'

সেই ভূমিকাতেই আরো বলা হয়েছিল:

> 'ইহার পূর্বে 'রাইকমল' দুইবার ছাপা হইয়াছে। এবার মুদ্রণের সময় হঠাৎ হাতে পড়িল—'রাইকমলে'র মূল গল্প দুইটি. 'কল্লোলে' প্রকাশিত প্রথম অংশ 'রাইকমল' ও 'উপাসনা'য় প্রকাশিত দ্বিতীয় অংশ 'মালা-চন্দন'। মিলাইয়া দেখিতে চোখে পড়িল গ্রন্থাকারে

প্রকাশের সময় কতক-অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ অবশ্য আমিই দিয়াছিলাম সে-কালে। এ কালে তাহার কতক-অংশ নিজের খুব ভাল লাগিল। সেই অংশটুকু যোগ করিয়া দিলাম, এবং মূল রূপের পরিবর্তন যখন হইলই, তখন প্রথম দিকে—বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র রাঢ় দেশের কেন্দ্রবিন্দু এবং নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অজয়ের তীর-ভূমির কিছু পরিচয় প্রয়োজন-বোধে যোগ করিয়া দিলাম। চালচিত্র না হইলে প্রতিমা মানায় না; স্থান ও কালের পটভূমি উপযোগী না হইলে পাত্র-পাত্রীর পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। পাঠকেরও বুঝিতে কষ্ট হয়।'

চালচিত্রের সঙ্গে প্রতিমার এই সংগতি-রক্ষার ভাবনা তিনি অবিশ্যি বেশিক্ষণ ভাবতে পারেন না। বোধ হয়, প্রথম রচনায় সময়ে—এ সব চিন্তা তাঁকে কিছুতেই আক্রমণ করতে পারে না। নতুন সংস্করণের তাগিদ না ঘটা পর্যন্ত তাঁর লেখক-জীবনে এ-ধরনের ভাবনার অবকাশই দেখা দেয় না! 'রাইকমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে সে অবকাশের সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি। সংস্করণে সংস্করণে তাঁর এই পরিমার্জন-স্বভাবের কথা এর আগেও বলা হয়েছে, এখানে তা' পুনরায় বলা গেল। যখন 'সপ্তপদী' বই হয়ে বের হয় (পৌষ, ১৩৬৪), তখন তিনি তা'তেও এই 'রাইকমল'-এর দ্বিতীয় সংস্কণের মতন একটি ভূমিকা যোগ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য-ধারায় তাঁর কলাকৌশলের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে 'সপ্তপদী'র সেই ভূমিকাটিও কাজে লাগবে। তিনি লিখেছিলেন :

'তেরশ ছাপ্পান্ন সালে পূজার আনন্দবাজারে সপ্তপদী প্রকাশিত হয়েছিল। আমার সাহিত্য-কর্মের রীতি অনুযায়ী ফেলে রেখেছিলাম নূতন করে আবার লিখে বা আবশ্যকীয় মার্জনা করে সংশোধন করে বই হিসেবে বের করব। বিগত ১৫।১৬ বৎসর ধরে 'কবি'র সময় থেকে এই রীতি আমার নিয়ম ও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার জীবনে ও শিক্ষায় এ শক্তি আমার নেই, আমি জানি যে, একবার লিখেই কোন রচনাকে নিখুঁত দূরের কথা—আমার সাধ্যমত নিখুঁত করতে পারি। কিন্তু 'সপ্তপদীর' সময়ে ঘটনার জটিলতায় তা সম্ভবপর হয় নি। যেমনটি ছিল তেমনটি ছেপে বইয়ের আকারে বের হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সংশোধন ও

মার্জনা করব, কিন্তু তাও সম্ভবপর হয়নি বইখানির চাহিদার জন্য। দু'বৎসরে আটটি সংস্করণ হয়েছে। প্রকাশকেরা বিলম্ব করতে চান নি, আমাকেও সুযোগ দেন নি।'

ঐ ভূমিকাতেই তিনি জানিয়েছিলেন যে, সাধ্যানুসারে সংশোধন করেও 'সপ্তপদী'র সংশোধন-কর্ম তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। সমুচিত নম্রতা প্রকাশ করেই তিনি জানিয়েছিলেন ঃ

'সংসারে অসহিষ্ণু উদ্‌গ্রীব মানুষের তাগিদে ভারতের জগন্নাথকেও অসম্পূর্ণ থাকতে হয়েছে। হয়তো জগন্নাথকে রূপ দেবার ক্ষমতার দৈন্য মানুষ ওই কাহিনী দিয়ে ঢেকেছে। আমার এ উক্তির মধ্যেও আমার অজ্ঞাত মনের সেই ভানই হয়তো প্রকাশ পেল। সে দৈন্য সবার কাছে স্বীকার করে তাঁদের কাছে হাতজোড় করাই ভাল।'

—এবং সবক্ষেত্রে শুধু শিল্পরূপের কথা দিয়েই যে তাঁর এ-রকম ভূমিকা শেষ হয়, তাও নয়। 'সপ্তপদী'র এই ভূমিকারই শেষ অনুচ্ছেদে তিনি এ-উপন্যাসের কৃষ্ণেন্দু-রিনার আসল কাহিনীর সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য করেছেন। এই লেখাটির পরিশেষে তিনি যে 'পরিশিষ্ট' যোগ করেছেন, তাতে তাঁর উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য বা বিশ্লেষণ নেই বটে, কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক কী, সে-বিষয়ে কিছু কিছু ইশারা আছে,—যেমন সেই 'পরিশিষ্ট' অংশে তিনি লিখেছেন,—'এককালে বাংলার মেলায় মেলায় ঘুরেছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এখনও ঘুরি। এমনই ঘোরার মধ্যে দেখা পেয়েছিলাম একজন মনে রাখার মত মানুষের। ...সপ্তপদী সৃষ্টির এই বিচিত্র সত্যটি—ইদানীংকালে আমার রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বাস্তব-বৈচিত্র্য-অনুসারী।' অতঃপর একটু ব্যাপক ক্ষেত্রে নজর রেখেই তিনি বলেছেন,—'আমার কাছে মনে রাখবার মত মানুষ যারা, তারা আমার লেখার মধ্যে অবশ্যই রূপ নিয়েছে। এক শশী ডোমই কি কম বার এসেছে ফিরে ফিরে। আজ বিশ্লেষণ বিচার করতে গিয়ে দেখছি—নিজেই আমি ছদ্মবেশ নিয়ে বেশিবার এসেছি।' ঔপন্যাসিকের নিজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নায়ক-নায়িকার জগৎ ও জীবনের সম্পর্কের কথা মনে রেখে, সাধারণ ভাবে, এই কথাগুলি বলে নিয়ে,—অতঃপর তিনি 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দু এবং রিনার কথাই বিশেষভাবে বলেছেন।

এখানে তাঁর 'পাষাণপুরী', 'ছলনাময়ী,' 'রাইকমল' ইত্যাদি লেখাগুলির সঙ্গে 'সপ্তপদী'র নামোল্লেখ করা গেল একাধিক কারণে,—প্রথমতঃ এইসব লেখার মধ্যে—নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে,—দ্বিতীয়তঃ রচনার শিল্প-রূপ সম্বন্ধে গভীর বিশ্লেষণ না থাক্, তাঁর সচেতনতার পরিচয় আছে এইসব লেখাতে। আর, 'ছলনাময়ী' গল্পের শেষ দিকে, প্রত্যাশিত সমাপ্তি-স্থান অতিক্রম করে তাঁর স্বভাবের ঝোঁকেই তিনি যে আরো কিছুদূর এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সে কথাও এখানে পুনরায় স্মরণ করা গেল।

তাঁর স্বভাবের এই আরো-কিছুদূর এগিয়ে-যাবার ঝোঁক—এবং ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর দার্শনিকতার খেয়াল,—তাঁর অতিকথন আর বৃথা-ভাবনা,—দুটির কোনোটিকেই তিনি—একেবারে সাম্প্রতিক-কালেও পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

'ছলনাময়ী'র প্রথম গল্প 'সন্ধ্যামণি' সম্বন্ধে 'প্রিয় গল্পের' ভূমিকায় তিনি নিজে যা বলেছেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর কন্যার স্মৃতি-সম্পর্কিত 'সন্ধ্যামণি'র সেই ব্যক্তিগত, করুণ অনুষঙ্গের দিকটি সমুচিত সমবেদনার সঙ্গেই স্মরণীয়! কিন্তু তাঁর অনুরাগী পাঠকের কাছেও গল্প হিসেবে 'সন্ধ্যামণি'র মর্মকথা তীব্র কোনো আবেদনের বিষয় হয়ে উঠতে পারে নি। ছোটো একটি বাজারে তীর্থযাত্রীর ভিড়,—বিড়ির দোকানদার ছকু আর তার বাবা দ্বিজদাস,—কুমোরবুড়ো পাল-কর্তা,—তাদেরই প্রতিবেশিনী বামুনদের মেয়ে কুসুম,—'অল্পবয়সী, বেশ শ্রীমতী, কিন্তু ভাগ্য বড় মন্দ—তিন কুলে কেহ নাই, বাউণ্ডুলে স্বামী'—সেই স্বামীর নাম কেনারাম চাটুজ্জে,—তারই স্ত্রী কুসুমকে মাদুর বুনে জীবিকা অর্জন করতে হয়। এই পাত্র-পাত্রী-সমাবেশ দেখিয়েই গল্পটিকে তিনি অচিরে শ্মশানের দিকে ঠেলে দিয়েছেন! তারপর শ্মশানের চণ্ডাল পৈরুকে আর পৈরুর ঘুমন্ত ছোটো মেয়েটিকে দেখা যায়। কেনারাম চাটুজ্জে নিজের মেয়েকে হারিয়েই যে এই রকম খেয়ালী হয়ে উঠেছে, সে খবরটুকুও অনুক্ত থাকে নি। 'ছলনাময়ী' গল্প-সংগ্রহের প্রথম গল্প 'সন্ধ্যামণি'র শেষ দিকে তারাশঙ্করের অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই, এক রাত্রে উদ্‌ভ্রান্ত কেনারাম চাটুজ্যেকে দেখা গেছে গ্রামের শ্মশান-ঘাটে। সে সেখানে জ্বলন্ত চিতার আগুন অব্যাহত রাখতেই ব্যস্ত! সেই চিতার আলোতেই চোখে

পড়েছে পৈরুর উদ্ভাসিত মুখ,—এবং তারই অদূরে দাঁড়িয়ে, কেনারামের সেই দুর্দশা দেখে স্নেহে-মমতায় বিগলিত কুসুমের চোখে নেমেছে অবিরল জল-ধারা! তারপর, সেই রাত কেটে যাবার পরে, সকালের আলোতে চারদিকের চেহারা বদলে গেছে আবার। দ্বিজদাসের দোকান,—পালকর্তার রঙ-বেরঙের পুতুলের সারি—এই সব পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কুসুমের প্রতীক্ষার সঙ্গে কেনারামের সম্মতির শুভ-সংযোগ ঘটে গেছে হঠাৎ! তখন, কেনারামের সামনেই কুসুমের ঘরের দাওয়া! সেখানে সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছটি দেখে থমকে দাঁড়াতে হয় কেনারামকে। স্বামী-স্ত্রীর মনে মনে আবার জেগে ওঠে পরলোকগত সন্তানের ভাবনা। সেই ভাবনাতেই এ-গল্পের শেষ ছেদ দেখা দিয়েছে :

'কুসুম আবার ডাকিল—এসো।'

'সংকোচভরে চাটুজ্জে কহিল—তেল দাও তো, আগে স্নান করে আসি। রাত্রে শ্মশানে—।'

'হাসিয়া কুসুম কহিল—তা হোক।'

'চাটুজ্জে বলিল—সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে—খুকু গাছ পুঁতেছিল।'

'দোকানে দোকানে তখন হাঁক উঠিয়াছে—'

'—তুফানী বিড়ি, মিঠা পান—'

'—গঙ্গা ফল নিয়ে যান মা।'

'পুতুল মা, পুতুল'

'কুসুম সজল-চক্ষে প্রত্যাশার হাসি হাসিয়া বলিল—সে আবার আসবে।'

॥ রাই-কমল, ধাত্রী দেবতা ॥

'ছলনাময়ী', 'জলসাঘর', 'আগুন', 'রসকলি',—'ধাত্রী-দেবতা', 'কালিন্দী', তাঁর আর একখানি গল্প-সংগ্রহ 'তিনশূন্য',—তারপর তাঁর 'কালিন্দী' এবং 'দুই পুরুষ' নাটক—তারপর 'গণদেবতা',—এবং আরো পরে তাঁর গল্প-সংগ্রহ 'প্রতিধ্বনি',—ঐ বছরেই 'বেদেনী'—তারপর 'রাইকমল' উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণ, এবং সেই একই বছরে—অর্থাৎ উনিশ শ' তেতাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'দিল্লীকা লাড্ডু' গল্প-সংগ্রহও প্রকাশিত হয়। তবে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের এই চারখানি বইয়ের (প্রতিধ্বনি, বেদেনী, রাইকমল, দিল্লীকা লাড্ডু) মধ্যে 'রাইকমল' যে পুনর্মুদ্রণ,—সে-কথা এখানে পুনর্বার বলা হোলো! 'ছলনাময়ী' গল্প-সংগ্রহের 'সন্ধ্যামণি' গল্পটিতে কুসুম নামে যে মেয়েটিকে দেখা গেছে, 'রাইকমল'-এর কিশোরী বৈষ্ণবী—কমলিনীর সঙ্গে তার প্রকৃতির সাদৃশ্য অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। এরাই তারাশঙ্করের প্রিয় নারী-চরিত্র! অবিশ্যি এ-ছাড়া অন্য ধরনের নারী-চরিত্রও তাঁর লেখাতে ব্যক্ত হয়েছে,—যেমন তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র শৈলজা আর জ্যোতির্ময়ী! কিন্তু সে হোলো সমাজের অন্য স্তরের কথা। বৈষ্ণব সমাজের কথায় এগিয়ে গেলেই তাঁর কলমে 'রাইকমলে'র কমলের ছবিই যেন নানাভাবে ফুটে ওঠে!

'রাইকমল' নামটির আলোচনা তিনি নিজেই করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তখন 'কল্লোল' সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই তেরশ' ছত্রিশ সালের কথা স্মরণ করে 'আমার সাহিত্য জীবন' বইখানিতে তারাশঙ্কর লিখেছেন,—'দীনেশবাবু (দীনেশরঞ্জন দাশ) ছায়া-ছবির জগতে চলে গেলেন। অচিন্ত্যবাবু আমাকে গল্পের জন্য লিখলেন। আমি 'স্বৈরিণী' নাম দিয়ে একটি গল্প লিখে পাঠালাম। অচিন্ত্যবাবু গল্পটি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোলে' ছাপতে দিয়ে লিখলেন 'স্বৈরিণী' নামটি বদলে দিলাম। নামকরণ করলাম 'রাই-কমল'।

'রাই-কমলের' সূচনাতে তিনি যে বিশেষ রীতি বা ভঙ্গি দেখিয়েছেন,—এখানে সে-বিষয়েও দু'একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। কিন্তু তার আগে 'রাই-কমল' উপন্যাসের সেই সূচনা থেকে এখানে কয়েক লাইন তুলে দেখা যাক :

'পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ।

এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল যেদিন, সেদিনের অনেক কাল পূর্ব হইতেই এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' যে বাঁশি বাজে তাহার ধ্বনি শুনিয়াছিল। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম-শুকপাখি ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষে জানিত, 'সুখ দুখ দুটি ভাই',—'সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই।'

অতঃপর চাষী-প্রধান এই সব গ্রামের উল্লেখ ক'রে,—রাঢ়ের এই অঞ্চলের বাউল, বৈষ্ণব, ফকিরদের কথা তিনি তো বলেইছেন, তা'ছাড়া সে-অঞ্চলের শালিখ পাখিও যে থেকে-থেকে 'রাধা-কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করে,—এবং সেখানে সাধারণ লোকে যে শখ করে এখানে-সেখানে মালতী-মাধবী-কদম লাগিয়ে থাকে, সে-সব প্রসঙ্গও উহ্য থাকেনি। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র সূচনাতে,—এবং শুধু 'ধাত্রীদেবতা'তেই বা কেন,—তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসেই সূচনা-প্রকৃতির এই সমধর্মিতা চোখে পড়ে। আদিতেই কিঞ্চিৎ স্থান-বর্ণনা এবং লোক-চরিত্রের বর্ণনা দেওয়া তাঁর অভ্যস্ত রীতি! 'রাই-কমলের' পাশাপাশি তাঁর 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি বইগুলি এই কারণেই একটু তুলনার দৃষ্টিতে দেখা দরকার।

'রাই-কমল'-এর বৈষ্ণব-অধ্যুষিত সেই গ্রামেরই উত্তর প্রান্তে হরিদাসের কুঞ্জ। হরিদাস মহান্ত ছিল প্রতিষ্ঠাবান গায়ক। সে একটি অ'খড়া প্রতিষ্ঠা করে গেছে। এখন হরিদাস নেই। হরিদাসের মৃত্যুর পরে আখড়ায় আছে হরিদাসের স্ত্রী কামিনী আর তার কিশোরী মেয়ে কমলিনী। কামিনীর গলাটি খুবই মিষ্টি। কামিনীর এই কণ্ঠ-মাধুর্যের উল্লেখ করে হরিদাস বলেছিল—'জান, এসব হোলো গোবিন্দের দান, এই রূপ, এই কণ্ঠ—এর অপব্যবহার করতে নাই। এতে তাঁরই পুজো করতে হয়।' হরিদাসের মৃত্যুর পরে কামিনী আর পত্যন্তর গ্রহণ করেনি। এখন গানই তার সম্বল।

কামিনীর মেয়ে কমলিনীও সংগীতে পটু। কমলিনীর বয়স যখন ছ'সাত বছর, তখন ভাগ্যগুণে, হরির কৃপায়, বৃদ্ধ বাউল রসিক দাস একতারা হাতে

গান গাইতে গাইতে সেই গ্রামে এসেছিল। তার সেই গানের প্রথম কয়েক ছত্র এখানে তুলে না দেখলে 'রাই-কমল' এর যথার্থ আবহের ধারণা পূর্ণ হবে না। রসিক দাস গেয়েছিল :

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন্ কদমতলিতে
কোন্ মহাজন পারে বলিতে ?
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।
ওগো ললিতে।

এই ভাবেই কথায় কথায় গান এসে যায় তারাশঙ্করের কলমে। গ্রামের মাতব্বর মণ্ডল চাষী মহেশ্বর তখন নিজের দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে ঢেঁড়ায় শনের দড়িতে পাক দিচ্ছিল। রসিক দাসের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মহেশ তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলে। অজয়ের পলিমাটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে চাষী মহেশ। ওদিকে বাউল জিগেস করে, 'হ্যাঁ বাবা, অজয়ের জলের শব্দে রাত বিরেতে এখনও শোনা যায় ? বাঁশি ! বাঁশির সুর ?'

বিষয়ী মানুষ মহেশ সেই সরল ভক্তের কথা শুনে জবাব দেয়—'মহতের কথা মহতে বোঝে। মেঘের ডাকে ময়ুর নাচে, গেরস্ত তাকায় ফুটো চালের পানে। বাবুরা সর্ষেফুল দেখে মূর্চ্ছা যায়, আমাদের ক্ষেতে সর্ষেফুল দেখে সাত মণ তেলের কথা ভাবি—চোখের সামনে রাধা নাচে। ও বোবার গায়েন কালায় বোঝে, ঢেঁকির নাচন ঘোড়ায় বোঝে ; বাঁশি শুনে রাই উদাসী জটিলে কুটিলের হৃৎকম্প।'

নিজের প্রশ্নের এই উত্তর শুনে রসিক দাস মহেশ মণ্ডলের রসিকতার তারিফ করেছিল। মহেশের ছেলের নাম রঞ্জন। রঞ্জনের সঙ্গে খেলা সেরে কমলিনী তখন ঘরে ফিরছে। তার কাঁচ মুখে রসকলি, আর, খাটো চুলে বাঁধা চুড়া-ঝুঁটি দেখে বাউল বলেছিল—'এ যে দেখি খাসা বষ্টুমী' !

সেই দিনই রসিকদাস কমলিনীর নতুন নাম রেখেছে—'রাই-কমল'। এদিকে রসিকদাসের লম্বা গড়ন দেখে কমলিনী তার নাম রাখে—'বগ-বাবাজী'। হাসতে হাসতে দিন কেটে যায়। রসিকদাসের সঙ্গে কমলিনীর পরিহাসের প্রগল্ভতা দেখে কামিনী তিরস্কার করে। মেয়ে কমলিনীর ইতিমধ্যে বয়স হয়েছে চোদ্দ বছর। গান শিখতে শিখতে কমলিনী

হঠাৎ যখন এইভাবে চলে যায়, তখন পরম স্নেহে গুন্‌-গুন্‌ করে নতুন গান ধরে রসিকদাস:

ফুটল রাই-কমলিনী বসল কৃষ্ণভ্রমর এসে।
লোকে বলে নানা কথা তাতে তার কি যায় আসে?
কূল তো কমল চায় না বৃন্দে মাঝ-জলেই সে হাসে ভাসে।

রসিকদাসের এই বিশেষ দৃষ্টির পরিচয় দিতে গিয়েই তারাশঙ্কর লিখেছেন—'বাউল পথ চলে আর মাথা নাড়ে। এই কিশোর-কিশোরীর লীলার মধ্যে সে দেখে ব্রজের খেলা।'

মহেশ্বর মোড়লের ছেলে রঞ্জনের সঙ্গে কামিনীর মেয়ে কম্‌লির বাল্য-প্রণয়ের বৃত্তান্ত জানানো হয়েছে 'রাই-কমল'-এর প্রথম অধ্যায়ে। মাঠের কুলগাছ থেকে রঞ্জন কুল পেড়ে দিয়েছিল কমলিকে,—সেই কুলেরই একটি খেয়েছিল দু'জনে। মাঠে গরু চরাতে গিয়ে মহেশ্বর স্বয়ং সে-দৃশ্য দেখে ফেলে। সে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে সে-কথা বলে দেয়। কমলির উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্যে রঞ্জনকে তাই অনেক কটু কথা শুনতে হয়। রাগ করে সে তার মাকে বলে দেয় যে,—সে বোষ্টম হবে! তারপরে রসিকদাসের আখড়ায় গিয়ে সত্যিই বোষ্টম হবার সংকল্প জানিয়ে দেয় সে। এদিকে কমলির সঙ্গে ভোলাকে হাস্য-পরিহাসে নিযুক্ত থাকতে দেখে রঞ্জনের আর এক-দফা রাগ হয়। রঞ্জন রাগ করে আখড়া থেকে চলে যায় বলেই কম্‌লিও বিষণ্ণ বোধ করে। এদিকে মহেশ্বর মোড়ল এসে কামিনীকে বলে, 'কামিনী, তোরও সন্তান আছে। আমার ঐ একমাত্র সন্তান। আমার সন্তান আমাকে ফিরে দে কামিনী।' সব শুনে কামিনী বলে, 'যাও মোড়ল, আমি কম্‌লিকে নিয়ে গাঁ থেকে চলে যাব।'

এদিকে, আড়াল থেকে সবই শুনছিল কম্‌লি,—সবই দেখেছিল। ভরা কলসী কাঁখে নিয়ে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েছিল সে। মহেশ্বর মোড়লের সঙ্গে কামিনীর এই কথাবার্তা শুনে কমলির মনে ধাক্কা লেগেছিল খুবই,—তার কাঁখের জলভরা মাটির কলসীটা পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। কমলি বলে, 'রাসে নবদ্বীপে মেলা হয়—চল মা, তার আগেই আমরা চলে যাই—সন্তান হারানোর অনেক দুঃখ মা—নন্দরাণীর দুঃখের কথা ভেবে দেখ'।

গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে সে তার সখী কানু-ননদিনীর সঙ্গে দেখা করে আসে—এবং সে আখড়ায় ফিরে আসতেই বগ-বাবাজীর গান শুরু হয় :

'গোরার সেরা গোরাচান্দ চল দেখে আসি সখি'

এই নবদ্বীপ-যাত্রার সংকল্প প্রকাশের সঙ্গেই এ-কাহিনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটেছে। তারপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে নবদ্বীপ-বাসের কথা। সেখানে কামিনী তার স্বামীর আমলের গোপন সঞ্চিত অর্থে বাড়ি-ঘর কিনে আখড়া বেঁধেছে। রসিকদাস সেখানে বলাইদাস আর সুবলচাঁদ নামে দুই তরুণ বন্ধু পেয়েছে,—তাদের মধ্যে সুবল আবার বেশ সুদর্শন। এদিকে কমলের পূর্ণ যৌবন। হাস্য-পরিহাসের মধ্যেও,—বৈষ্ণব ভক্তদের সহজ ভক্তিভাবটি তারাশঙ্কর নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত হতে দিয়েছেন, যেমন—

'কমলি সেই তেমনই আছে। সেই যেদিন তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া নবদ্বীপে আসে, সেদিন হঠাৎ সে যতটুকু বড় হইয়া গিয়াছিল, ততটুকু বাড়িয়াই সে আর বাড়ে নাই।

'অবসর সময়ে রসিকদাস কমলকে বলে, এ যে চাঁদের হাট বসিয়ে দিলে গো রাইকমল। আহা—হা—কি সুন্দর রূপ গো। গোরাচান্দের দেশের রূপই আলাদা।

কমলিনী বলিল, তাহলে গঙ্গাতীরের রূপে তুমি মজেছ বল। এইবার ভাল দেখে একটি বোষ্টুমী করে ফেল গে বাবাজী।

বলিয়াই সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। কমলের পরিহাসে রস-পাগল রসিকের একটু লজ্জা হইল। সে সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বলিল, রাধে রাধে। রাধারাণীর জাত কৃষ্ণপূজার ফুল—কি যে বল তুমি রাই-কমল।

হাসিতে হাসিতেই উজ্জ্বলভাবে কমলিনী বলিল, প্রসাদী মালা গলায় পরাও চলে গো। পায়ে না মাড়ালেই হোলো।'

এই হাস্য-পরিহাসের ধারাতেই কমলকে বলতে শোনা যায় যে, সুবলকে বা বলাইদাসকে মালা-চন্দন করতে সে রাজী নয়। রসিকদাস বার-বার বলেছে—'আমরা হলাম, রাই-কমল—ব্রজের শুক আমরা,—লীলার গান গাওয়াই আমাদের কাজ গো'। সুবল তো একদিন আবিষ্টের মতন কমলিনীর হাত ধরতেও এগিয়েছিল, কিন্তু অদ্ভুত চরিত্রের সেই কিশোরী

মেয়েটির সযত্ন শাসনে তাকেও নিরস্ত হতে হয়েছে। তাই রসিকদাসকে সে বলেছে,—'মানুষে ওর মন ওঠে না মহান্ত।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শুরুতেই নবদ্বীপে কামিনীর দেহত্যাগের খবর পাওয়া যায়। তার মা যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখন কমল বিয়ে করতে সম্মতি জানায়। কামিনী সস্নেহে তখনো বলে যায়—'বাপ-মায়ের ছেলে কেড়ে নিস না যেন।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদে গোবিন্দ সাক্ষী রেখে কমল রসিকদাসের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার গুণে ভাবোচ্ছ্বাসময় কাহিনীর ধারায় বেশ একটু চমক দেখা দিয়েছে। আর্ত কণ্ঠে রসিকদাসকে বলতে শোনা যায়—'কি করলে রাই-কমল?' কমল তখন—'চন্দন লইয়া রসিকের জরাজীর্ণ পাণ্ডুর ললাট চর্চিত করিয়া দিল।' কমলের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে রসিকদাস গান ধরে—'কৃষ্ণপূজার কমল আমি রেখে দিব মাথায় করে।' পঞ্চম পরিচ্ছেদে রসিকদাস আর কমলের বিবাহ-বাসর আর ফুলশয্যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই অসম বিবাহের ফলে উভয় পক্ষের যা মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তাই যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

> 'আজন্ম-কুমার বৈরাগীর বুকের ক্ষুধা এতদিন ঘুমন্ত জনের ক্ষুধার মত অবিচলিত ছিল। আজ আহার্য সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলায় সে ক্ষুধা অজগরের গ্রাস বিস্তার করিয়া মাথা তুলিল। সে অজগর বাউলের আজন্ম-সাধনায় অর্জিত বৈরাগ্যকে অসহায় বনকুরঙ্গের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহোকে পিষিয়া মারিয়া সে তাহাকে নিঃশেষে গ্রাস করিবে। রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। সে যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার রসের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।'

এবং—

> 'ধীরে ধীরে দুইটি নরনারীর জীবন কেমন একটা স্পন্দহীন গুমটে অসহনীয় হইয়া উঠিল। কমলেরও যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। একদিন সে বলিয়া ফেলিল, এ তো আর ভাল লাগে না মহান্ত।'

সেই বিয়ের দিন থেকে রসিকদাস আর গোরাচাঁদের মন্দিরে যায় নি। বৃন্দাবনে যেতেও তার আর আগ্রহ নেই। এই গ্লানি থেকে উদ্ধারের পথ কোথায়? তখন—

'কমলের মরিতে ইচ্ছা করিল। আপনার পানে চাহিতেও যেন তাহার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে মহান্তকেই প্রশ্ন করিল, আমার মাঝে কি এতই পাপ আছে মহান্ত?

'রসিক সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। একান্ত অপরাধীর মত নত মস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রইল। কমল চোখ মুছিতে মুছিতে আবার বলিল, বেশ, কোথাও গিয়ে কাজ নাই। চল, পথে পথেই ঘুরব আমরা।'

এবং সেই প্রস্তাবে—

'পরাজিত বন্দী বৈরাগী মুক্তির আশায় কাঁধে ঝোলা লইয়া মাথায় বাঁধিল নামাবলী।'

অজয়ের তীর ধরে পথে পথে এগিয়ে চলে বৈষ্ণবী। এইভাবে চলতে চলতেই তারা গিয়ে পৌঁছোয় নিজেদের ফেলে-আসা গ্রামে—'রসকুঞ্জের ধসিয়া পড়া ভিটার প্রান্তে'!

গ্রামে ফিরে, তারা যখন ভিক্ষায় বেরোয়, তখন একে একে গ্রামের অনেক খবরই কানে আসে। ভাঙা ভিটেতেই আবার আখড়া বাঁধা হয়। কিন্তু পুরোনো সুর কিছুতেই আর ফিরে আসে না। সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, কমল তার পুরোনো সখী কাতুর কাছ থেকে অনেক খবর পেয়েছে। বাল্যসখী পরীকে বিয়ে করে রঞ্জন না-কি বোষ্টম হয়েছে! এদিকে বৈরাগী মহান্ত রসিকদাসের মনেও স্বামীত্ব-বোধের সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষাবোধের প্রবলতা ঘুচতে চায় না! দাম্পত্য কলহের পরে একদিন সে গান গাইতে বসে—'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'! অবিশ্যি তার পরেও অষ্টম পরিচ্ছেদে আর-একবার আখড়া জমিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে আর কিছুতেই জমে নি। নবম পরিচ্ছেদে প্রবেশের পূর্বেই রসিকদাসকে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হতে দেখা গেছে। তবু ভোলা, পঞ্চানন, বিনোদ ইত্যাদি অনেকেই আসতে থাকে রসকুঞ্জে। কমলের সম্বন্ধে ভোলার অনুরাগের খবর পেয়ে ভোলার মা তিরস্কার করে কমলকে। কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ দেখা যায় না কমলের।

এইভাবে চলতে চলতে প্রেমের ঠাকুর জয়দেবের গ্রাম দর্শনের অভিলাষে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে কমল। রঞ্জনের সঙ্গে আবার দেখা হয়। পঁচিশ ক্রোশ পথ হাঁটতে হাঁটতে,—বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে নিঃসঙ্গ

নির্জন মাঠে পথ হারিয়ে পথচারী রঞ্জনের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় তার!

রাঢ়ের এই বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে সারারাত পথ চলতে দেখা যায় কমলকে। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ,—মনে সৌন্দর্য-বিস্ময়-ভয়-আগ্রহের মিশ্র চেতনা। কমলের এই পথ চলা যেন জীবনের পথ-পরিক্রমারই রূপক হয়ে উঠেছে!

কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গে কমলের এই শেষ মিলনও স্থায়ী হোলো না। রঞ্জনের সঙ্গিনী পরী মারা গেছে, বটে। দশম পরিচ্ছেদে কমল আর রঞ্জনের মিলনও ঘটতে দেখা গেছে। এগারোর পরিচ্ছেদে জয়দেবধামের মন্দির-প্রাঙ্গণে রঞ্জনকে বরণ করে—সেখান থেকেই কমল তার অনুগামিনী হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রঞ্জনকে যখন আবার এক নতুন সঙ্গিনী নিয়ে আসতে দেখা গেল, তখন পরীর কথা ভেবে,—নিজের রূপ-যৌবনের নশ্বরতার কথা ভেবে,—বৈষ্ণবীর শ্যাম-কিশোরের স্বপ্ন মনে জাগিয়ে রেখে,—সব ছেড়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে কমল! অজয়ের নির্জন তীর ধরে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যায় সে—'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'!

তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'র কাহিনী অন্য ধরনের। সেখানে তাঁর অভ্যস্ত রীতির এবং নিজস্ব প্রবণতার অনেক চিহ্ন আছে—এবং তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'ধাত্রীদেবতা' একখানি বিশিষ্ট বই যে, তাতেও সন্দেহ নেই। এর প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে যেটুকু কাহিনী পাওয়া যায়, তাতে লাঘাটা বন্দরের বাঁড়ুয্যে পরিবারের সাত আনির মালিক স্বর্গত কৃষ্ণদাস বাবুর বালক-পুত্র শিবনাথের—আর, তার মা-পিসিমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে,—সে বৃত্তান্ত আগেই বলা হয়েছে (পৃঃ১০৫)। শিবনাথের মা আর পিসিমা,—এই দুটি স্নেহময়ী মানুষের প্রভাব, তাঁদের পরস্পরের মিলে-গরমিলে,—সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আরো দু'একটি চরিত্রের সংস্পর্শে—শিবনাথের শৈশব গিয়ে কৈশোর শুরু হয়েছে। 'ধাত্রাদেবতা'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম কয়েক ছত্রের মধ্যেই তাদের কাছারি-বাড়ির বারান্দাতে নায়েব সিংহ মশায়ের সেরেস্তা চোখে পড়ে। চাকর সতীশ সেখানে শনের দড়ি পাকাতে ব্যস্ত,—চাপরাশি কেষ্ট সিংকেও দেখা যায়। তা'ছাড়া আছে ফুল-বাগান, গোশালা, চাষ-বাড়ি—বাঁড়ুজ্যে বাবুদের শ্রীপুকুর চাকর-

চাপরাশিদের ঘর,—একখানা বাড়ির কর্তার,—তার নাম 'কর্তা সওয়ারী'—আর একখানি গিন্নির,—তার নাম 'গিন্নি সওয়ারী'! কাহিনীর এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, পিসিমা এসে সতীশকে কাছারি-ঘর খুলতে বলেছেন। সেই ঘরের আসবাবপত্র দেখে ভাইয়ের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তিনি,—নায়েবকে ডেকে বলেছেন শিবনাথের কোষ্ঠি বিচারের জন্তে বগতোড়ের মহেন্দ্র গণকের কাছে একটা লোক পাঠাতে হবে'। কাছারি-বাড়ির সংলগ্ন শ্রীপুকুরের বাঁধানো ঘাটে এসে দাঁড়াতেই পাশের সাহা পুকুরে জরীপের আয়োজন তাঁর চোখে পড়েছে। পিসিমার পুরুষালী প্রতাপ,—তাঁর অধিকারবোধ,—তাঁর স্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠের হাঁকডাক—সবই শোনা গেল এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সাহা-পুকুর জরীপের কাজে এসেছিল যারা, তাদের জরীপের শেকল তাঁর জমিতে পড়েছিল বলে বৃদ্ধ শশী রায়ের সঙ্গে পিসিমার খুবই বাদ-প্রতিবাদ ঘটলো। শিবনাথ তখন পরিচারক শম্ভুর সঙ্গে নেকড়ে বাঘ ধরবার পরামর্শে ব্যস্ত ছিল। সরকারী কানুনগোকে ডেকে এনে পিসিমা তাঁকেও শুনিয়ে দিলেন যে, সরকার-তরফ থেকে নাবালক শিবনাথের অভিভাবক জজসাহেব। সেই জজসাহেবেরই কানুনগোকে তিনি নিজে চা-জলখাবারে আপ্যায়িত করবার পরেই বারান্দায় এক দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হন। তাঁরই নাম রামকিঙ্কর। লক্ষপতি ব্যবসায়ী তিনি,—কলকাতায় থাকেন। শৈলজা ঠাকুরাণীকে (পিসিমা) তিনি বললেন, 'লোকে আপনাকে আড়ালে ঠাট্টা করে বলে, ফৌজদারির উকিল। তা দেখলাম উকিলের চেয়েও বড় আপনি, ব্যারিষ্টার।' এই পরিহাসে খুশি হয়ে শৈলজা জবাব দেন, 'আমায় তাহলে এবার কলকাতা থেকে গাউন আর টুপি এনে দিও, আর মামলা থাকলে খবর দিও'। রামকিঙ্কর বললেন, মামলা একটা নিয়েই এসেছি ঠাকরুন দিদি'—'আমার মা মরা ভাগ্নীটিকে আপনাকে নিতে হবে। শিবনাথের আপনি বিয়ে দিচ্ছেন শুনলাম।' শৈলজা ঠাকরুন রামকিঙ্কর বাবু কথা শুনলেন, কিন্তু জবাব তিনি পরে দেবেন। রামকিঙ্করবাবু তাতে অভিমান করে বলেন,—কেন, আপনাদের জমিদারের ঘরের উপযুক্ত হবে না আমার ভাগ্নী?' পিসিমা বললেন, 'ঠিক উল্টো ভাবছি ভাই,—ভাবছি হাতির খোরাক জোগাতে কি আমার শিবনাথ পারবে?'

কানুনগোকে শৈলজা যখন জরীপের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে হুমকি

দিচ্ছিলেন, শিবনাথ তখন নেকড়ে-বাঘ ধরবার জল্পনায় ব্যস্ত ছিল। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রামকিঙ্করবাবু সঙ্গে শিবনাথের পিসিমার কথা-কাটাকাটির সময়ে শিবনাথকে তাদের প্রজা,—দোগাছির মোড়ল সবজান শেখের দুরন্ত এক ঘোড়া শাসন করতে ব্যস্ত দেখা যায়। কিন্তু পিসিমাই এ-অংশের প্রধান চরিত্র! তারাশঙ্করের নিজের কথায়—পিসিমা 'অল্প পড়িতে জানেন, কিন্তু লিখিতে জানেন না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রবেশ করেই দেখা যায় যে, সেদিন সন্ধ্যায় এই মা আর পিসিমার মধ্যে শিবনাথের বিয়ের আলোচনা চলছিল, ঠিক সেই সময়ে একটি নেকড়ের বাচ্ছা ধরে নিয়ে বালক শিবনাথ ঘরে ফেরে। সমবেদনা আকর্ষণ করবার অভিপ্রায়ে মাকে আর পিসিমাকে সে তার রক্তাক্ত হাত দেখায়। বাড়ির পুরোনো পাচিকা রতনকেও এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—আর সেই সঙ্গে বিশালকায় প্রৌঢ় সন্ন্যাসী গোঁসাইবাবাকেও—শৈলজা ঠাকরুন যাঁকে বলেন 'রামজীদাদা'। এই সন্ন্যাসী আগে ছিলেন সেনাদলের হাবিলদার—মিশরে, আফগানিস্থানে, বর্মাতেও তাঁর অনেকদিন কেটেছে। পনেরো-ষোলো বছর আগে এই গ্রামের অট্টহাস-মহাপীঠ দেখতে এসে কৃষ্ণদাসবাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কৃষ্ণদাস বাবুর শখের বাগান দেবীবাগে তাঁর জন্যে এক আশ্রমও তৈরি করে দেওয়া হয়। শিবনাথের সঙ্গে গোঁসাইবাবুর প্রীতির সূত্রপাত ঘটে তখন থেকেই। সন্ন্যাসীর ছিল অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার, তাইতেই শিবু তাঁর বশীভূত ছিল। রামকিঙ্করবাবুর মায়ের কাছে শিবুর বিয়ের কথা শুনে, সেই বিয়েতে সম্মতি জানাতে এসেছেন, গোঁসাইবাবা। সেই বিয়ের অনুকূলে তাঁর যুক্তি এই যে, 'রামকিঙ্করবাবু আজকাল ই জাগা কে প্রধান আদমি। শিবুর হামার বল বাড়বে, সহায় হোবে।' গোঁসাইবাবার মুখে ঐ আধা হিন্দী, আধা বাংলা মিশ্রভাষা,—আর, তাঁর প্রিয় মণিপুর-যুদ্ধের গল্প,—তাঁর সারল্য, সাহস আর সততা তাঁকে এই উপন্যাসের চিত্তাকর্ষক চরিত্র হিসেবে স্মরণীয় করে তুলেছে। সেই দিনই রাত্রে, রামকিঙ্করবাবুর ভাগ্নীর সঙ্গে শুভবিবাহের সেই প্রস্তাবটি ধরে পিসিমার সঙ্গে শিবনাথের আরো অনেক আলোচনা ঘটে গেল :

'পিসিমা বলিলেন, মা তোর আজ দুঃখ করছিল, কেঁদে ফেললে বেচারী।

শিবু চকিত হইয়া বলিল, কেন ?

পিসিমা বলিলেন, বলছিল, আমি যা চাই, শিবু তা হল না।

শিবু বলিল, কেন, প্রথম বছর মা আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিল তিরিশে আশ্বিন, আমি সেই থেকে তো বিলিতী জিনিস কিনি না। পড়াও তো করি, এবারো থার্ড হয়েছি। আচ্ছা, আর জীব-হিংসে করব না।'

এই কথাবার্তার মধ্যেই রামকিঙ্করবাবু ভাগ্নী নাস্তির সঙ্গে পরিণয়ের প্রস্তাব শুনে শিবনাথকে রাজী হয়ে যেতে দেখা যায়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হবার আগেই রামকিঙ্করবাবুর এই প্রস্তাবটি উচ্চারিত হয়েছে। শৈলজা ঠাকরুনকে তিনি তাঁর মা-মরা ভাগ্নীর সঙ্গে শিবনাথের বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বলেছিলেন। তবে, স্বপক্ষের মর্যাদা সম্বন্ধে শৈলজা ঠাকরুনকে একটু বেশি মাত্রায় সচেতন থাকতে দেখা যায়,—রামকিঙ্করকে তিনি পরদিন সকালে নাস্তির কোষ্ঠী নিয়ে আসতে বলেছেন, তারপর তিনি আশান্বিত হয়ে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের পিসিমা শৈলজার অন্য কর্তব্য শুরু হয়েছে।

এ দৃশ্যে রামকিঙ্করের প্রবেশের পূর্বেও তিনি তাঁদের পারিবারিক প্রতাপ, প্রভুত্ব এবং মর্যাদা প্রদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন। কানুনগোর সঙ্গে তাঁর যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে,—তারই মধ্যে তার নজীর আছে। আবার, রামকিঙ্কর চলে যাবার পরেও পুনরায় সেই কাজ শুরু হয়েছে। কানুনগো সরকারী কর্মচারী। শৈলজা ঠাকরুন তাঁকে প্রয়োজনোচিত আদর আপ্যায়ন জানিয়ে তাঁর স্বর্গত সহোদরের নাবালক উত্তরাধিকারী শিবনাথ সম্বন্ধে তাঁর নিজের কর্তব্যের কথাও বলেছেন, শৈলজার বাক্‌পটুতার নমুনা হিসেবেই সে অংশ মনে পড়ে:

'কানুনগোবাবু বলিলেন, আমাকে কিছু বলবেন ?

পিসিমা ভিতর হইতে বলিলেন, হ্যাঁ। আমার সীমানার মধ্যে শেকল আনবার পূর্বে আমাকে কি জানাবারও দরকার হয়নি ? আমি স্ত্রীলোক, আইনের কথা ভাল জানি না, আইন কি আপনাদের তাই ?

কানুনগো একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ ম্যাপ অনুযায়ী জরিপ করলে জানাবার ঠিক দরকার হয় না।

প্রশ্ন হইল, ম্যাপ অনুসারেই কি জরিপ করেছেন ?

কানুনগো জবাব দিলেন,—না, ওঁদের কহত মতই জরিপ করলাম। আর ওঁরা ঠিক আপনার সীমানা জরিপ করছিলেন, না তালগাছের বেড়ার জন্যে ওপাশে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাইতে আপনার সীমানার—

এবার পিসিমা বাধা দিয়া বলিলেন, সীমানা আমার নয়, নাবালকের; এই ছেলেটির অভিভাবক সরকার তরফ থেকে জজ-সাহেব, আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

সেদিন রামকিঙ্করবাবু চলে যাবার পরে শৈলজা তাঁদের দোগাছির মোড়ল প্রজা সবজান শেখের সঙ্গে যে কথা বলেছেন, তা থেকে পুনর্বার তাঁর প্রতাপ আর প্রভুত্বেরই পরিচয় পাওয়া গেছে! জমিদারের লোককে অপমান করবার অভিযোগ ছিল সবজানের বিরুদ্ধে। শিবনাথের সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ তো সবজানের ঘোড়া নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। এদিকে শৈলজার সঙ্গে সবজানের কথা চলছে। এবং সেই কথার মধ্যেই শিবনাথকে এসে দাঁড়াতে হয়েছে পিসিমার নির্দেশে। সবজানের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু সে-অবস্থাতেও পিসিমার কথার ভঙ্গিটুকু ভোলবার নয়।

'সবজান বার বার সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিসিমা বলিলেন, দুফোঁটা চোখের জলে তুমি আমার কাছে রেহাই পেতে না সবজান। আরও একটু শিক্ষা তোমার আমি দিতাম। যাক, কিন্তু স্বীকার করে যাও, জমিদারের লোককে বিনা কারণে অপমান আর কখনও—

সবজান বলিয়া উঠিল, আমরাও তো আপনার ছেলে মা।

পিসিমার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, কথার ওপর কথা বলতে নেই সবজান। ছেলে তো তোমরা নিশ্চয়ই, কিন্তু অবাধ্যতার জন্যে তোমাদের ওই মালিক শিবনাথের পিঠেও মারের দাগ দেখতে পাবে।'

এই সবজান-প্রসঙ্গের সঙ্গেই 'ধাত্রী-দেবতা'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতেই দিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে দেখা এই দুটি নারী-চরিত্রের দিনান্ত-বেলার ছবি দেখানো হয়েছে। তখন জমিদার-বাড়িতেও অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশ।

'সন্ধ্যায় নিচের তলার দরদালানে বসিয়া ননদ ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে কথা হইতেছিল। একখানি গালিচার উপরে বসিয়া পিসিমা

পায়ে তেল লইতেছিলেন। পাশে একখানি ডালায় গোটা সুপারি ও জাঁতি রহিয়াছে। এ পাশে শিবনাথের মা হ্যারিকেনের আলোর সম্মুখে বসিয়া মজুরি সহিযুক্ত টিপের সহিত জমাখরচের খাতা মিলাইয়া দেখিতেছিলেন, অনুজ্জ্বল আলোকেও তাঁহার দেহবর্ণ মোমের মত শুভ্র মনে হইতেছিল।'

অন্য সময়ের তুলনায় এই দৃশ্যান্তরের মধ্যে পিসিমাকে অনেক কোমল মনে হয়। তারাশঙ্কর নিজেই সে-কথা বলেছেন :

> 'অন্তরাল হইতে শুনিলে এখনকার এই পিসিমাকে প্রাতঃকালের সেই পিসিমা বলিয়া চেনা যায় না, ভাষায় ভঙ্গিমায় কোনোখানে মেলে না। এখনকার ভাষায় ভঙ্গিমায় কেমন একটি সকরুণ দীনতার আবেদন সুস্পষ্ট, সংশয় করিবার অবকাশ পর্যন্ত হয় না।'

তাঁরই ভ্রাতৃজায়া—শিবনাথের মা যখন বলেছেন যে, শিবনাথকে তিনি তাঁরই (অর্থাৎ শৈলজারই) ছেলে মনে করেন,—অতএব শৈলজা-ঠাকরুনের নিজের আগ্রহ—যে-বিয়ের প্রস্তাবে,—তাতে তিনি যা স্থির করবেন, তাই-ই হবে, তখন—

> 'যেন শিহরিয়া উঠিয়া পিসিমা বলিলেন, না না বউ, তোমার শিবু তোমার। আমারে এ কথা বোলো না, আমার হলে থাকবে না। থাকলো না তো ভাই একদিনে স্বামী-পুত্র গেল। আমার মনে হয় কি জান বউ, মনে হয়, তোমার বৈধব্যের জন্যেও আমি দায়ী।'

সে-রাত্রে পিসিমার এই দৈন্য আর ভাবাবেগ,—তারই মধ্যে শিবনাথের মায়ের মন্তব্য—'বাবাকে আমার চিঠি লিখেছিলাম আমি, তিনিও তাই লিখেছেন,—লিখেছেন, শৈলজা মায়ের সাধে বাধা দিও না, সে তোমার অধর্ম হবে, সে কথা শুনে পিসিমার হর্ষোৎফুল্ল ভাব—এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই নেকড়ে-শাবক সমেত শিবনাথের ঘরে ফেরা,—এইসব ঘটনা-সমাবেশের সাহায্যে তারাশঙ্কর তাঁর 'ধাত্রী দেবতা'য় বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন! সেই নেকড়ে-শাবকটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা নিয়েও মা-পিসিমার মতভেদ সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত থাকেনি। বালক শিবনাথ সুকৌশলে তার আহত হাতের ক্ষতস্থানটি দেখিয়ে পিসিমার সমবেদনা দাবি করেছে। মা বলেছেন—'তোমার এখন পড়ার সময়, বুঝলে? তা ছাড়া হিংসা করা আমি পছন্দ

করিনা'। শিবনাথের এই শাসন-লালনের মধ্যেই বাড়িতে গোঁসাই-বাবার শুভাগমন ঘটেছে।

তারাশঙ্করকে কথায়-কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করতে দেখা যায়। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'তেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র কথা উঠেছে। একাদশ পরিচ্ছেদে শিবনাথের টেবিলে যে দু'খানি বই পড়ে থাকতে দেখা গেছে, তার একখানি 'আনন্দমঠ,'—অন্যটি 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'! তার আগেই দশম পরিচ্ছেদে শিবনাথ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'জীবনে সে প্রথম উপন্যাস পড়িয়াছে 'আনন্দমঠ'। পড়িয়াছে নয়, শুনিয়াছে। মা তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।' আবার, ষোড়শ পরিচ্ছেদে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র সুশীল আর পূর্ণর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে, মহামারী-বিধ্বস্ত গ্রামের শ্মশানে কালী-মূর্তি দেখে মনে পড়েছে আনন্দমঠের কথা! তাই মনে হয়, এ-কাহিনীতে এই সন্ন্যাসী গোঁসাইবাবা ওরফে রামজীদাদাও হয়তো কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রভাবে সমাগত! বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসী-প্রীতির কথা কে না জানেন? তারাশঙ্করও সন্ন্যাসী-অনুরাগী কথাকার! তাঁর 'আগুন', 'রাইকমল', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'যোগভ্রষ্ট' ইত্যাদি অনেকগুলি উপন্যাসে কোনো-না-কোনোভাবে সন্ন্যাসের কথা দেখা দিয়েছে। শাক্ত-তান্ত্রিকই হোক্ আর বৈষ্ণবই হোক্—কেউ না কেউ এসেছে বৈরাগ্যের কথা ব'ল্তে। 'ধাত্রীদেবতার' এই সন্ন্যাসীটির তিনি এই পরিচয় দিয়েছেন:

> 'এই সন্ন্যাসীটি পূর্বে ছিলেন সৈন্যদলের একজন হাবিলদার। বহু যুদ্ধে তিনি গিয়াছিলেন,—মনিপুরের রাজবংশকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তিনি ছিলেন; মিশরে প্রেরিত সৈন্যদলের মধ্যে ইনি একজন; আফগানিস্তান এবং বর্মাতেও অনেকদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন। শরীরের কয়েক স্থানেই গভীর ক্ষতচিহ্ন আজও বর্তমান। তাঁহার ঝুলির মধ্যে তিন চারিখানি মেডেল সযত্নে রক্ষিত আছে। একদা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সহসা সৈন্যদলের পদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তারপর পনেরো ষোলো বৎসর পূর্বে একদিন এই গ্রামের মহাতীর্থস্থল, মহাপীঠ বলিয়া খ্যাত অট্টহাস দর্শনে আসিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। কৃষ্ণদাসবাবু তাঁহার

ওই শখের দেবীবাগে সন্ন্যাসীর জন্য আশ্রম তৈয়ারী করিয়া দিয়া তাঁহাকে স্থাপন করেন। বাগানের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাও এই সন্ন্যাসীবাবুর প্রেরণায় এবং প্রয়োজনে।

শিবনাথদের এই পারিবারিক বন্ধু,—সন্ন্যাসী-গোঁসাইবাবা এসে তাঁর হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত ভাষায় রামকিঙ্করবাবুর ভাগ্নী নাস্তির সঙ্গেই শিবনাথের বিবাহ ঘটিয়ে ফেলবার পরামর্শ দিলে পিসিমা সেই রাত্রেই শিবনাথকে জানিয়ে দেন যে, সেই মাঘ মাসেই তার বিয়ে হবে। শিবনাথ বলে, 'যা মন হয় তোমাদের তাই কর বাপু, বিয়ে একটা হলেই হোলো।'—এবং এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৃতায় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই আবার শৈলজাঠাকুরাণীর প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়:

> 'পরদিন প্রাতঃকালে রামকিঙ্করবাবু শিবনাথের বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে করিতেই শুনিতে পাইলেন, শৈলজা-ঠাকুরাণী বলিতেছেন, গাছ একটা সামান্য জিনিষই বটে বউ, কিন্তু এ মান-অপমানের কথা, ইজ্জতের কথা। ইজ্জতের কথা, এখানে তুমি কথা কোয়ো না।
>
> কণ্ঠস্বরে সুকঠোর দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার তিনি বলিলেন, এ আমার বাপের বংশের অপমান। দাদা আমাকে বলতেন, শৈল, না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত। এ আমাদের পিতৃপুরুষের শিক্ষা। মাথা নিচু করে জবরদস্তি তো কারও সইতে পারব না।'

রামকিঙ্করবাবুর চোখ দিয়েই সেখানে নায়েব রাখাল সিং, চাপরাশি কেষ্ট সিং ইত্যাদি কর্মচারীকে পিসিমার হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়! আগের দিন, জরীপের কানুনগোর সঙ্গে আলাপের আগে ও-পাড়ার শশী রায়ের সঙ্গে যে কথা-কাটাকাটি ঘটে গিয়েছিল, সেই রাগেই শশী পুকুর-পাড়ে এ-পক্ষের দখলী বহুকালের একটা গাছ কেটে ফেলছে! সে-দৃশ্যে শৈলজা ঠাকুরুনের এই কথা:

> 'পিসিমা বলিলেন, গাছ যখন আমার দখলে আছে, তখন তার তলার মাটিও তা হলে আমার। সবই তো দখলের প্রমাণের ওপর

ভাই। কিন্তু সে কথা তো পরের কথা। আজ যে শিবনাথের মাথা হেঁট হবে, তার কি? বিষয় বাপের নয়, বিষয় দাপের।'

এই মর্যাদা-সচেতন, প্রতাপশালী পরিবারের শিবনাথের সঙ্গে নাত্নির বিবাহের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। শিবনাথের মা মৃদুস্বরে তাঁর একটিমাত্র শর্তের কথা জানিয়েছেন—'বিয়ের পর বউ কিন্তু আমার এখানে থাকবে।' রামকিঙ্কর তৎক্ষণেই রাজী হয়েছেন। পিসিমা গণক ডাকতে বলেছেন।

এদিকে আপত্তি তুললেন শিবনাথের গৃহশিক্ষক। এই সরল, শিক্ষিত, আন্তরিকতাময় মানুষটি 'ধাত্রীদেবতা'র গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত ভাষায়,—তাঁর ঘাড় নাড়বার ভঙ্গিতে,—তাঁর প্রতিবাদে অথবা সম্মতিতে,—সব কথায়, সব রীতিতেই, বিশেষ এক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করা যায়। তিনি বলেন 'নো, আই ওন্ট্ অ্যালাও ইট। চোদ্দ বছরের ছেলের বিয়ে! অ্যাবসার্ড!' তাঁর এই বিশেষ স্বভাবের কথা-প্রসঙ্গেই আরো যা বলা হয়েছে, সেটুকু এখানেই স্মরণীয় :

> 'মাষ্টারের নাম রামরতনবাবু, লোকে অন্তরালে তাঁহাকে পাগল বলিয়া থাকে; এককালে পঠদ্দশায় তাঁহার মাথা নাকি সত্য সত্যই খারাপ হয়েছিল। মাষ্টার যেন কত গোপনীয় কথা বলিতেছেন, এমনই ভঙ্গিতে বলিলেন, দেখুন একটা ছড়া বলি।'

—এই বলে তিনি তাঁর স্বজাতির—অর্থাৎ কুম্ভকার-সমাজের সুপরিচিত একটি ছড়ার সাহায্যে বাল্য-বিবাহের কুফল সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। অগত্যা শিবনাথের মায়ের প্রতিনিধিত্ব ক'রে, বাড়ির পাচিকা রতন এসে মাষ্টারমশাইকে বলে—'মাসিমা—শিবুর মা বললেন, বিয়েতে অমত করবেন না। পিসিমা বড় আঘাত পাবেন। আর বললেন, বিয়ে হয়ে শিক্ষার পথে বাধা হয়, তা ঠিক, কিন্তু বিয়ে হয়েও মানুষ শিক্ষিত হয়, বড় হয়। একটু কঠিন হয়, কিন্তু কঠিনকে ভয় করতে গেলে কি চলে?'

এই যুক্তিতে রামরতনমাষ্টারমশাইয়ের মত বদলে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—'হুঁ, মায়ের কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে।'

অতঃপর সেই কিশোর ছাত্রের বিবাহে সম্মতি দানের পর মাষ্টারমশাই মেঘনাদবধকাব্য পড়াতে বসলেন। সেই সূত্রেই মিল্টন-রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেছে। এই মাষ্টার চরিত্রটির সারল্য আর আদর্শবাদ শিবনাথের মা-

পিসিমার একরঙা গৃহস্থালির পাশে সত্যিই বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হয়। এদিকে রামরতনবাবু চলে যাবার পরেই নাস্তির বড় ভাই বালক কমলেশকে দেখা গেছে। 'ধাত্রীদেবতা'র প্রথম দিকে, মাঝে মাঝে যে হাস্যরস দেখা দিয়েছে, তাতে বালক শিবনাথ এবং কমলেশ দুজনেরই অংশ আছে। নেকড়ের বাচ্চা ধরতে গিয়ে, আহত অবস্থায় বেশি দেরি করে বাড়ি ফেরবার অপরাধে জননী জ্যোতির্ময়ীর কাছে শিবনাথ যখন তিরস্কৃত হয়,—সে তখন নেকড়ের দংশনে বিষ-ক্রিয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ ক'রে পিসিমার প্রশ্রয় এবং সমবেদনা আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে! চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিবনাথের উদ্দেশ্যে নাস্তির বড় ভাই বালক কমলেশকে বলতে শোনা গেছে—'ব্রাদার-ইন্-ল। মানে কি?' তার উত্তরে শিবনাথ বলেছে—'তোমার মানের বইয়ে কি লেখে জানিনা, আমার বইয়ে লেখা আছে, তালব্য শ-য়ে আ-কার লয়ে আকার।'

এই ধরনের হাস্য-পরিহাস আর জমিদারী পরিবেশের মধ্যে দিয়েই আখ্যানবস্তুর ক্রমোদ্‌ঘাটন ঘটেছে। এ-রচনার কোনো কোনো জায়গা দেখলেই মনে হয় যে এ-বই তাঁর আত্মজীবনী! এই জমিদারীর আয়ের সঙ্গে তাঁদের সেকালের সম্পত্তির আয়ের অঙ্কেও যেন মিল চোখে পড়ে। আবার, তারাশঙ্করের নিজের মা আর পিসিমার কথাও মনে আসে। বাস্তব সম্ভাব্যতা বজায় রেখে তিনি কোথাও বা বর্ণনা করে গেছেন, কোথাও সমুচিত নাট্য-রীতি অবলম্বন করে পাত্র-পাত্রী এবং ঘটনাধারার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। যেমন পঞ্চম পরিচ্ছেদে,—শিবনাথের বিয়ের উৎসবে পিসিমা যে-হারে খরচ করতে প্রস্তুত ছিলেন, নায়েব রাখাল সিং, গোমস্তা প্রতাপ মুখুজ্যে—এবং স্বয়ং শিবনাথের মা জ্যোতির্ময়ীও যখন সে-বিষয়ে আপত্তি জানান, তখনকার দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নাটকীয় রীতিতে:

> 'পিসিমা বলিলেন, মতির মা, আমার তেল-গামছা বের কর তো, বেলা অনেক হয়ে গেল।
>
> নায়েব বলিলেন, তা হলে ফর্দ-টর্দ কি রকম কি হবে?
>
> পিসিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা ঠিক কর সব। কই রে মতির মা, কোথায় গেলি? অ মতির মা। হারামজাদি গেল কোথায়? কে? কারা ওখানে দাঁড়িয়ে?

কেষ্ট সিং আসিয়া বলিল, আজ্ঞে ২১৭ নম্বরের মুচি আর বাগ্দি প্রজারা।

কি, বলে কি সব?

প্রাণকৃষ্ণ বায়েন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিল, আজ্ঞে মা, আমরা বাবুর বিয়ের বাজনার বায়না নিতে এসেছি। বাগ্দিরা এসেছে রায়বেঁশের জন্যে।

পিসিমা তাহাদের কোন কথা কহিলেন না, ডাকিলেন নিত্যকে,—নিত্য দেখ্ তো, মতির মা গেল কোথায়?

প্রাণকৃষ্ণ বলিল, আমাদের রোশনচৌকি আর ঢোলের বাজনা আর কেউ নেয় না, কিন্তু আমাদের বাবুর বিয়েতে আমরা যেন বাদ না পড়ি।

কৃষ্ণবর্ণ বিশালকায় প্রৌঢ় রামভল্লা জোড়হাতে পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে শুধু বলিল, আমরাও মা, আমরা রায়বেঁশে।

মতির মা এতক্ষণে তেল-গামছা আনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

পিসিমা বলিলেন, তোকে জবাব দিলাম আমি মতির মা। তোর কাজে বড় অবহেলা হয়েছে।

তাহার হাত হইতে গামছাটা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া তিনি রুক্ষই স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।'

শৈলজা-ঠাকুরাণীর রাগের ছবি চমৎকার ফুটেছে,—আবার কেষ্ট সিং, প্রাণকৃষ্ণ বায়েন, রামভল্লা,—সেই সঙ্গে মতির মা—এবং মুচি আর বাগ্দি প্রজার দল,—নাটকের ভাবসংঘাতময়, উত্তেজনাজনক কোনো এক দৃশ্যে এঁরা সবাই যেন একসঙ্গে সম্মিলিত হয়েছেন!

শৈলজা-ঠাকুরাণীর দেওয়া ফর্দই গৃহীত হয়েছে,—এবং শিবনাথের বিয়েতে এই আড়ম্বরের ফলে হাজার টাকা ঋণ হয়ে গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শৈলজা-ঠাকুরাণীর কৃতিত্বের কথা ভোলবার নয়। ঔপন্যাসিক নিজে বলেছেন—'রায়-বেঁশে, ঢুলীর বাজনা, ব্যাণ্ড, ব্যাগ্‌পাইপ, নাচ, তরজা, আলো, চতুর্দোল, শোভা-যাত্রা কিছুই বাদ পড়িল না। ব্রাহ্মণ শূদ্র ইতর-জাতি সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল। আয়োজন-অনুষ্ঠানে কিছু ঋণ করা ভিন্ন উপায় ছিল না। সমস্ত এস্টেটের আয়ের অর্ধেক টাকাতেও এ কুলাইবার কথা নয়। কিন্তু কৌশলপরায়ণা

এই জমিদারকন্যা এমন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে, নায়েব গোমস্তা পর্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারিল না। উদ্যোগের প্রারম্ভেই এস্টেটের উকিলদিগকে লোক পাঠাইয়া আনিয়া যে সব মকদ্দমা চলিতেছিল, তাহারই অগ্রিম কিছু কিছু টাকা লইয়া বারো শত টাকার সংস্থান করিলেন।'

এবং—শৈলজা-ঠাকরুন 'নায়েবকে বলিলেন, এ টাকার সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ কি? এ তো বকেয়া পাওনা টাকা, এ হোলো এষ্টেটের মজুত তহবিল; মামলা-খরচের টাকা আমি নিলাম না, সে তো আপনার মজুতই রইল উকিলের কাছে।'

এইসব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে শিবনাথের এই পিসিমা শৈলজা-ঠাকরুনকে একরকম বিশিষ্টতায় চিহ্নিত বলে চেনা যায়। জমিদার-পরিবারে কর্মক্ষম, নেতৃস্থানীয় পুরুষের যা দায়িত্ব, তা তিনি অবলীলাক্রমে পালন করে থাকেন। পিতৃকুলের প্রতিপত্তির ঐতিহ্য সমুচিত গর্বের সঙ্গেই তিনি স্মরণ করে থাকেন। 'ধাত্রীদেবতা'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শিবনাথের মা আর পিসিমা—এই দুটি চরিত্রের একটু তুলনার চেষ্টা করেছেন তারাশঙ্কর—আর, সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গগুলিও তিনি ছুঁয়ে গেছেন। বিয়ের পরে নববধূ নাস্তি শ্বশুর বাড়িতে এসেছে।—'শ্বশুরবাড়ির জানালা খুলিয়া বাপের বাড়ির জানালার মানুষ চেনা যায়, কথা কওয়াও চলে'—অতএব নাস্তির কোনো কষ্ট নেই। এদিকে শৈলজা তাঁদের গোমস্তা শ্রীপতিকে মৌজা বেলেড়ার গোমস্তার ইরসাল—অর্থাৎ সদরে পাঠানো টাকার পরিমাণ কম হওয়ার জন্যে আদেশ করেছেন—'আদায় না হয়ে থাকে, তুমি নিজে দিয়ে পূরণ করে দাও; তারপর আদায় করে নেবে'। শ্রীপতি নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানাবার পরেও তিনি বলেন—'সে শুনলে নাবালকের এস্টেট চলবে না শ্রীপতি, চৈত্র-কিস্তিতে টাকা আমার আদায় চাই-ই। আদায় না হলে তোমাকে হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিতে হবে।' 'ধাত্রী দেবতা'য় একদিকে পিসিমার এই কঠোর মূর্তি,—অন্যদিকে শিবনাথের জননী জ্যোতির্ময়ীর কোমলতা। শ্রীপতিকে তিনি জিগেস করেন—'আচ্ছা, শিবুর বিয়েতে প্রজাদের কাছে কৌশল করে টাকা আদায় করায় কি দুর্নাম হয়েছে বাবা?' এই প্রশ্নোত্তরের সময়ে ঘরের হাওয়া যেন ভারি হয়ে উঠেছে! জ্যোতির্ময়ী টাকাটা ফিরিয়ে দেবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শৈলজার মুখের ওপর কিছুই বলতে

চান নি তিনি। তিনি জানেন যে, টাকা ফেরৎ দিতে হ'লে সোজাসুজি এগুনো যাবে না, সে জন্যে কৌশল দরকার। শৈলজার বৈশিষ্ট্য—তাঁর নেতৃত্বে, প্রভুত্বে, জমিদারি কর্মকৌশলে। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী আরো শান্ত, কোমল, গভীর এবং গম্ভীর! এই দুই চরিত্রের বিভেদ-বৈষম্য-বিরোধের দিকটির ইশারা দিয়েই নিজের মনে মনে নায়েব বলেছে—'আমারই হয়েছে মরণ শ্রীপতি, এক মালি - যান উত্তরে তো আর একজন যাবেন দক্ষিণে।' এই তুলনার প্রয়াস—এবং এই ভারি হাওয়ার মধ্যেই পাশের ঘরে আসন্ন দোলের উৎসব উপলক্ষে শিবনাথ আর তার বালিকা-বধূ নান্তির আলাপ-আলোচনার ছবি দেখা দিয়েছে :

> 'সে সময়ে দোলের ছুটি, শিবনাথ তাহার ঘরের মধ্যে বসিয়া একটা পিতলের পিচকারিতে ন্যাকড়া জড়াইতেছিল। দোল আসিতেছে, রঙ খেলিতে হইবে। নয় বৎসরের নান্তি পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সিঁড়ির উপর হইতেই মা প্রশ্ন করিলেন, শিবু আছিস?'
>
> 'ঘরের মধ্যে ঠিক পাশেই বধূর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া শিবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে শুষ্কস্বরে বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ!
>
> 'নান্তি কিন্তু অপ্রতিভ বা বিব্রত হইল না, সে চুপ করিয়া গুঁড়ি মারিয়া খাটের এক কোণে আত্মগোপন করিয়া বসিল। মা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিবু ভয়ে শুকাইয়া গেল!'

প্রজাদের টাকা ফেরৎ দেবার কথাটাই জ্যোতির্ময়ী ছেলেকে বলতে এসেছিলেন। কিন্তু সেই সংকল্প-সাধনের পথে হঠাৎ সরসতা এবং গাম্ভীর্যের অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটে গেছে। শিবুকে তিনি বললেন—'শোন্ বিয়ের টাকা ফিরে দিতে গেলে প্রজাদের অপমান করা হবে। তার চেয়ে সবার খাজনা থেকে এবার এক টাকা করে মাপ দেওয়ার হুকুমটা তোকে পিসিমার কাছে করিয়ে নিতে হবে। অধিকাংশ লোকই তো এক টাকা করে দিয়েছে। বল্‌বি, 'আমার বিয়ের এক টাকা করে মাপ দিলে প্রজারা চিরদিন নাম করবে আর আশীর্বাদ করবে।' এই পরামর্শের পরে মা চলে গেলেন,—'বউও সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একরাশ ঝুল মাখিয়া গুটিগুটি বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে শিবুর পিঠে গুম করিয়া একটা কিল মারিয়া বাহির হইয়া পলাইল।'

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন উচ্চকিত রৌদ্রস্ফুরণ।

এই পরিচ্ছেদেই শিবনাথের মাষ্টারমশাই তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। এই রতন-মাষ্টারকে শৈলজা, জ্যোতির্ময়ী দু'জনেই খুবই স্নেহের চোখে দেখেন। মাষ্টারের নিজের বিশ্বাস—শিবুর সঙ্গে তাঁর নাকি হিন্দু আমলের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যে সামান্য মতবিরোধ হয়, তারই ফলে তাঁর এই পদত্যাগ এবং বিদায়-প্রার্থনা! রতন মাষ্টারের এই বিদায়ের দৃশ্যে— ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে ছাত্র শিবনাথকে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখা যায়। মা, পিসিমা, রতন-মাষ্টার—এই তিন জনেই তার বাল্যপর্বের অভিভাবক,—এঁরা প্রত্যেকই তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। পিসিমার চরিত্রে প্রতাপ, প্রভুত্ব, পারিবারিক মর্যাদাবোধ এবং কুলগৌরবের ধারণা তো আছেই,—তাছাড়া তাঁর ভাবালুতা আর মান-অভিমানের প্রসঙ্গও মনে পড়ে। সপ্তম পরিচ্ছেদে নাস্তি যখন বলেছে যে, শিবনাথ পদ্য লেখে—এবং সে তার মায়ের নামে লিখেছে 'পারিজাত ফুল তব চরণের',—নাস্তির সম্বন্ধে 'সখি' সম্বোধনটিও তাকে অনেক বার ব্যবহার করতে হয়েছে,—কিন্তু পিসিমার সম্বন্ধে কোনো কবিতাই পাওয়া যায় নি, তখন—'পিসিমার চোখের সম্মুখে পৃথিবী অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। শিবু মায়ের নামে পদ্য লিখিয়াছে, বধূর নামে লিখিয়াছে, আর তিনি কেউ নন! সমস্ত পৃথিবীটাই আজ মিথ্যা হইয়া যাইতেছে।' এই সপ্তম পরিচ্ছেদেও পিসিমা আর মায়ের বিপরীত মনোধর্মের তুলনা-প্রয়াস দেখা দিয়েছে। শৈলজা-ঠাকুরাণীর অপরিমিত রুক্ষতা,—বিষয়-কর্মে হঠাৎ তাঁর অসহযোগ ইত্যাদি ব্যাপারের খবর দিয়েছেন লেখক। সেই সঙ্গে আরো বলেছেন—'শিবনাথও সময়ে সময়ে বিদ্রোহ করিয়া উঠে, তাহার সহিত কোন কিছু বাধিলেই সে নিরম্বু উপবাস আরম্ভ করিয়া দেয়। একমাত্র শিবনাথের মা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। সমস্ত কিছু অগ্ন্যুদ্গারের মধ্যে তিনি শ্বেতবরণা গঙ্গার মত সুশীতল বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে পড়িয়া অগ্নিকণাগুলি অঙ্গার হইয়া মিলাইয়া যাইত।' এই সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে, পিসিমাকে জ্যৈষ্ঠ মাসের রুদ্ধ গৃহকক্ষে নাস্তি শিবনাথের দাম্পত্য আলাপ আর হাস্য-পরিহাস শুনতে দেখা যায়। আর, সেই দিনই সন্ধ্যায় তাঁর 'ফিট' দেখা দেয়। ডাক্তারকে জ্যোতির্ময়ী বলেন,

'আজ পনেরো বছরের মধ্যে হয়নি। তবে পনেরো বছর আগে ফিটের ব্যারাম ছিল ঠাকুরঝির। এক দিনে এক বিছানায় ওর স্বামী আর ছেলে মারা গিয়ে এ অসুখ হয়েছিল।'

'ধাত্রীদেবতা' যেন তাঁর আত্মজীবনী—একথা বার বার মনে জেগে ওঠে। তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার কালের কথা' বইখানিতে তাঁর মা-পিসিমার কথা,—তাঁর পিতার মৃত্যুর বিবরণ,—'রামজী' সাধুর কথা ইত্যাদি ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাই বলেছেন। তিনি তাঁর সেই 'আমার কালের কথা'র ষোড়শ পরিচ্ছেদে,—দু'শ সতেরোর পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> 'আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে-কালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের কথা। শালপ্রাংশু মহাভুজ, লৌহকপাটের মত বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল বলিরেখা।...আমার বাবা তাঁর দিনপঞ্জীতে তাঁর চরিত্রের কোন দিক অনুদ্‌ঘাটিত রাখেন নি। এবং সে দিনলিপি আমাকেই উদ্দেশ করে লিখে গেছেন, সব জানিয়ে গেছেন; বার বার বলে গেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, বংশগত ঐতিহ্য-মহিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে, অপূর্ণ কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। সে ঐতিহ্য সে মহিমা ব্রাহ্মণের। ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের।'

আর, নিজের মায়ের সম্বন্ধে সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

> 'আমার কালের অপরার্ধ নূতন কাল যেন আমার মা।
>
> জ্যোতির্ময়ী—প্রসন্ন।
>
> তিনি বলেন, আঘাতে বিচলিত হোয়ো না, ক্লান্ত হোয়ো না, পথ চল।'

সে বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁকে আবার বলতে শোনা গেছে :

> 'অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত-দৃষ্টি, শুভ্রবাস-পরিহিতা, তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ;

আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই।'

'ধাত্রীদেবতা'র সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব-সংশয়াতীত এই আদর্শই নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বইয়ের নাম সম্বন্ধে লেখকের নিজের দেওয়া ব্যাখ্যার মধ্যেও এই কল্যাণের কথাই পুনরায় উচ্চারিত হয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে স্বদেশী হাঙ্গামায় গ্রেপ্তার হয়ে শিবনাথ যখন জেলখানায় বন্দী,—তার পিসিমা তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন,—সেই সঙ্গে অনেক কালের অভিমান এবং অদর্শনের পরে শিবনাথের স্ত্রী গৌরীও গিয়েছে খোকাকে কোলে নিয়ে। তখন শিবনাথ বলেছে,—'তুমি ওকে যেন আমার মত করেই মানুষ কোরো পিসিমা।' জেলখানায় সেই প্রিয়জন-সম্মিলনের দৃশ্যে লেখক বিধাতাকে এই মন্তব্য করতে শোনা যায়—'অনাদিকালের ধরিত্রী-জননীর বুকে শিশু সৃষ্টি ধীরে ধীরে লালিত হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহারই হাতে সব কিছু সঁপিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় মানুষ অনন্তকাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, মানুষের হাতে ভার দিয়া রাখিয়া যাওয়ার সকল মিথ্যার মধ্যে ওই রাখিয়া যাওয়াই তো আসল সত্য।' আবেগ-চিহ্নিত সেই সাক্ষাৎ-পর্বেরই শেষদিকে—

> 'জানালার চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া শিবু বলিল, এখান থেকেই প্রণাম করছি পিসিমা। মনে মনে সে বলিল, সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু; সেই বাস্তুর মূর্তিমতী তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তুর বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমি তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমার চেনা শেষ করতে পারি।'

'ধাত্রীদেবতা' যে দেশমাতৃকারই নামান্তর এবং শিবনাথের পক্ষে পিসিমা যে তার সেই দেশকে চিনিয়ে দেবার কল্যাণময়ী নেত্রী,—এ-উপন্যাসের এই শেষের কয়েক ছত্রে সে-বিষয়ে এই স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। জননী, স্বদেশ, পিসিমা, কল্যাণ, সৌন্দর্য,—সব যেন এক হয়ে গেছে! গৌরীও তখন মান-অভিমান বিসর্জন করতে পেরেছে। সেই ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাতের পরে—

'প্রদীপ্ত হাসিমুখে পরিপূর্ণ অন্তরে শিবনাথ ফিরিল। গৌরীর অবগুণ্ঠন তখন খসিয়া গিয়াছে, অনাবৃত মুখে, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে ওই দিকে চাহিয়াছিল। পিসিমা তাহার মাথার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ডাকিলেন, বউমা, খোকা ডাকছে তোমাকে।

ওদিকে লোহার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।'

এই কয়েক ছত্রেই 'ধাত্রীদেবতা'র পরিসমাপ্তি!

শিবনাথের বিয়ের ঠিক পরেই দেশ, সমাজ এবং পারিবারিক যে-যে অবস্থার কথা এ-উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা গিয়েছিল, সেখান থেকে এগিয়ে একত্রিশের পরিচ্ছেদের রাজনৈতিক আন্দোলনের বর্ণনায় পৌঁছবার পথে একে একে অনেকগুলি অধ্যায় পেরিয়ে যেতে হয় বটে। অষ্টম পরিচ্ছেদে বালক শিবনাথ যখন পুরোনো আমলের এক পাঞ্জাবী ঘোড়া-বিক্রেতার কাছ থেকে পছন্দ মতন একটা ঘোড়া কিনতে চেয়েছে, তখন তাকেও কল্যাণের কথা মনে করিয়ে দিয়েই জননী জ্যোতির্ময়ী বলেছিলেন—'ছি বাবা সংসারে কি মনের বাসনাকে প্রবল করতে আছে। জেনে রেখো, ভোগ করে বাসনা কখনও কমেনা, বাড়ে। আরও চাই, আরও চাই—এ অশান্তির চেয়ে বড় অশান্তি আর নেই।' শিবনাথের পিসিমা তাকে সে-ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন—এস্টেটের টাকায় নয়,—নিজেরই টাকা দিয়ে! নবম পরিচ্ছেদের প্রধান খবর—বালিকা-বধূ নান্তির পলায়নের বৃত্তান্ত! পূজোর বাসন মাজতে গিয়ে তার হাতে আঘাত লেগেছিল,—সে একটা কারণ, আর, 'পিস্‌শাশুড়ীর এত বকাঝকা কি ওই কচি মেয়ে সইতে পারে?' নান্তির দিদিমার বাড়ির এক প্রবীণা প্রতিনিধি এসে জানিয়েছেন যে নান্তি অতঃপর সেখানেই থাকবে। খুবই প্রশংসনীয়ভাবে শৈলজা সেদিন আত্মসম্বরণ করে সে-স্ত্রীলোকটিকে জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ময়ীকে কিছু বলতে হয় নি। শিবনাথ নিজেই নান্তির বাক্স-পেঁটরা বারান্দায় বের করে দিয়ে বলেছিল—'আমার পিসিমার কথা শুনে যে না থাকতে পারবে তার ঠাঁই এ বাড়িতে হবে না।'

দশম পরিচ্ছেদে নান্তির পক্ষে-বিপক্ষে যথাক্রমে নান্তির দিদিমা আর শৈলজার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ ক'রে—এবং শিবনাথের মায়ের পক্ষ থেকে তাঁর ননদের সম্বন্ধে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশিত হতে দিয়ে (শিবানাথের মা

বলেছেন, 'এ বাড়ির মালিক ঠাকুরঝি। আমি শিবনাথকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি, কিন্তু ঠাকুরঝি তাকে পনেরো বছর পালন করেছেন বুকে করে।')—অতঃপর দেশে অনাবৃষ্টির ফলে প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের কথা তোলা হয়েছে। এই দুঃখ-দুর্যোগের মধ্যেই শিবনাথের ভবিষ্যৎ জন-সেবার সূত্রপাত হয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা'র এই দশম পরিচ্ছেদটি সেই কারণে স্মরণীয়। প্রজারা এসেছে মহল থেকে। পিসিমা শৈলজা-ঠাকরুন নায়েবের সঙ্গে সেই কথাই আলোচনা করছিলেন। নায়েব চলে যাবার পরে শিবনাথ বলেছে—'আমাকে কিছু ধান দিতে হবে পিসিমা।' ধান নিয়ে দরিদ্র-ভাণ্ডার করবে শিবনাথের দল। তাছাড়া এই দশম পরিচ্ছেদেই শিবনাথ তার ইস্কুলের প্রাইজের বই 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' পড়েছে। সেইসূত্রে 'আনন্দমঠে'র কথাও তার মনে পড়েছে। তার মা তাকে 'আনন্দমঠ' পড়ে শুনিয়েছিলেন এক রাত্রে। শিবনাথ তখন ছিল থার্ডক্লাসের ছাত্র। লেখকের নিজের কথায়—'তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বই পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু পড়িয়াছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ' তাহার জীবনের আনন্দ। এতদিন পরে আজ 'আঙ্কল টম্‌স, কেবিন' পড়িয়া সেই ধারার আনন্দ পাইয়াছে।'

শিবনাথের এইসব গ্রন্থ-পাঠের খবর এবং তার জনসেবার সূচনা—দশম পরিচ্ছেদের এই দুটি মুখ্য প্রসঙ্গ ছাড়া খেলার ঝোঁকে শ্বশুর-বাড়িতে নান্তির পুনরাগমনের খবরও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্ময়ী তাকে কাছে বসিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছেন,—সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিয়েছেন। নান্তি শিবনাথের ঘরের ধুলো ঝেড়ে, পরিষ্কার করে দিয়েছে। তারপর—'কয়দিন পরেই নান্তির দিদিমা নান্তিকে লইয়া তাঁহাদের কলিকাতার বাসায় চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে যাইবেন কাশী। তিনি নান্তির সম্পর্কে মা ও পিসিমার যে একটা সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন অথবা পালনীয় রীতি ছিল সেটুকুও মানিলেন না।' ফলে,—'পিসিমা গর্জন করিয়া উঠিলেন। মা হাসিলেন।'

একাদশ পরিচ্ছেদে শিবনাথের বয়োবৃদ্ধি এবং ক্রমপরিণতির কথাই প্রধান। তার প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেছে। বিপুল অবসরে সে আবার বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বসেছে। পিসিমার আগ্রহাতিশয্যে তাকে একদিনের জন্য জমিদারির কাজে কাছারি-ঘরে বসতে হয়েছে। দুই তৌজির দশজন মণ্ডল এসে প্রণাম করেছে তাকে!

কিন্তু তার কিশোর মনে সেইসব প্রণামের আবহাওয়া ঘনীভূত হবার আগেই—উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, জ্যোতির্ময়ী দেখা দিয়েছেন কল্যাণী মূর্তিতে। ছেলেকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন। বিষয়-সম্পত্তির কাজে শিবনাথের তখনো আসবার সময় হয়নি—একথা তিনিই বিশেষ ভাবে বুঝেছেন। এই পরিচ্ছেদে একদিকে লেখাপড়ার শুভ প্রয়োজনবোধে ছেলেকে রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এই অভ্যুদয়,—দ্বিতীয়তঃ রাখাল সিং নায়েব এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অধীনে কাজ করবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ,—এবং তৃতীয়তঃ শিবনাথের নিজের মনের ঘাত-প্রতিঘাত,—তার আত্মচিন্তা—এই ক'টিই প্রধান কথা। সেই দিনই সকালে শিবনাথ সমাজ-সেবক সমিতির অধিবেশনেও যোগ দিয়েছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শিবনাথের পরীক্ষায় কৃতিত্বের খবর পাওয়া যায়। দেবীমন্দিরে মাকে এবং—সেই সন্ন্যাসী গোঁসাইবাবাকে প্রণাম করতে গেছে সে। পথে ফ্যালার মায়ের কান্না এবং ফ্যালার কলেরার খবর শুনে—এবং সেই সঙ্গে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কর্মোদ্যম দেখে অনুপ্রাণিত বোধ করে শিবনাথ আর তার বন্ধু কমলেশ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ফ্যালা ডোমের মৃত্যু ঘটে গেছে। গ্রামে মহামারী দেখা দিয়েছে। মেডিক্যাল ভলান্টিয়ার সুশীল আর পূর্ণ এসেছে কলকাতা থেকে। পর পর তিনটি পরিচ্ছেদে সেই মহামারীতে জন-সেবার উন্মাদনা বর্ণনা করা হয়েছে। সুশীল আর পূর্ণ, সমবয়স্ক এই দুটি বন্ধু এসে শিবনাথকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে অনেকটা। রামকিঙ্করবাবু এসেছিলেন শিবনাথকে কাশীতে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই যেতে চায় নি সে।

তারাশঙ্কর রক্ত-সন্ধ্যা বর্ণনা করতে খুবই ভালোবাসেন। এর আগে 'আগুন' উপন্যাসের আলোচনা-প্রসঙ্গেই তা' দেখা গেছে। প্রকৃতির বিশেষ লগ্ন বর্ণনার দিকে তাঁর আগ্রহের কথা মনে পড়ে। এখানে যেমন রক্ত-সন্ধ্যার বর্ণনা, তেমনি কোনো কোনো জায়গায় তিনি দুপুরের ছবি এঁকেছেন। তাঁর 'মাটি' গল্প-সংগ্রহের প্রথম গল্প 'মাটি'তে কলকাতার দুপুরের ছবি আছে। 'ধাত্রীদেবতা'র এই মহামারী প্রসঙ্গে দেখা দিয়েছে রক্ত-সন্ধ্যা। ভোলা মুচির স্ত্রী যখন মারা গেছে, তখন—'সুশীল মুগ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, রক্ত-সন্ধ্যার সঞ্চারে সমস্ত আকাশটা লাল!'

সেই অবকাশেই তাঁর আর-এক প্রিয় প্রসঙ্গ মৃত্যুর কথা উঠেছে। তারপর, আরো নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শিবনাথের জীবনাভিজ্ঞতা আরো পরিণত হয়ে উঠেছে। সুশীল আর পূর্ণ ফিরে গেছে কলকাতায়।

আঠারোর পরিচ্ছেদের শুরুতেই শৈলজা ঠাকুরাণী বউকে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন। নান্তির—অর্থাৎ গৌরীর বয়স তখন বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়েছে। এই আঠারের পরিচ্ছেদেই—যেখানে ফ্যালার মা হঠাৎ একদিন পথে শিবনাথকে অতি গর্হিত এক অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে,—সে অংশটুকুর, আকস্মিকতা ভোলবার নয়। এ কাহিনীর অনেক অংশই বৈচিত্র্যহীন——অতিরিক্ত দীর্ঘ,—শিথিল—এবং কৃত্রিম বলে মনে হয়। এই দুঃসহ শিথিলতা আর বৈচিত্র্যহীনতা দূর করবার জন্যেই কোনো কোনো জায়গায় অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটিয়ে, কৌতূহল এবং চমক সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। ফ্যালার মায়ের প্রসঙ্গ কতকটা সেই প্রয়াসের মধ্যেই গণ্য।

আঠারোর পরিচ্ছেদে প্রবীণ নায়েব রাখাল সিংও শিবনাথকে কাশী থেকে নান্তিকে নিয়ে আসবার পরামর্শ দিয়েছেন। তার আগে,—শিবনাথের ঘরখানি কী কী ছবি দিয়ে সাজানো হবে, সে-বিষয়ে পিসিমা শৈলজা ঠাকরুন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিবনাথের সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছেন। অনন্ত বৈরাগী কাঠের ব্লকে-ছাপা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, যুগল-মিলন ইত্যাদির ছবি এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে সব পছন্দ হয় নি। এদিক থেকে শিবনাথের সঙ্গে তার পিসিমার রুচির গরমিল নেই। এইসব কথা থেকেই শৈলজা ঠাকরুনের মনটা কোমল হয়ে এসেছে এবং সেই অবস্থায় তাঁকে বলতে শোনা গেছে যে, বউকে অর্থাৎ গৌরীকে তিনি যে আনতে চেয়েছেন, সেটা রাগের বশে নয়। —'সে আমার কর্তব্য, আর বউমার ওপর রাগ-অভিমান করাও আমার ভুল।' এই আলোচনার পরে শিবনাথ উঠে গিয়ে শ্রীপুকুরের সামনের বারান্দায় বসেছে,—বিষণ্ণ বোধ করেছে সে,—'তাহার কল্পনার বৈরাগ্যের স্পর্শ লাগিয়া সমস্ত পৃথিবীই যেন গৈরিকবসনা হইয়া উঠিতেছিল।' অতঃপর রাখাল সিংয়ের পরামর্শ,—এবং তারপর—'হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল বিবাহের পরেই সে গৌরীকে লক্ষ্য করিয়া 'বধূ' নামে একটি কবিতায় লিখিয়াছিল' 'মণি-ঝরা হাসি তোর, মতি-ঝরা কান্না'। এইরকম মানসিক

অবস্থায় পড়লে—বোধ হয়, মানুষ-মাত্রেই এক রকম অকারণ চাঞ্চল্য দেখিয়ে থাকে। শিবনাথেরও সেই অবস্থা—'বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা সে উঠিয়া ডাকিল, কেষ্ট সিং! বাইসিক্লটা বের কর তো। বাইসিক্লে উঠিয়া সে পোষ্ট-অফিস রওনা হইয়া গেল, ডাক আসিবার সময় হইয়াছে।' পোষ্ট-অফিস থেকে ফেরবার পথে ক্যালার মা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে—'আমার বউকে কোথায় সরিয়ে দিলি, বল বল্‌ছি, আমার সোমথ বউ। এ তোমারই কাজ।'

ব্যাপারটা তুচ্ছ, বটে। ক্যালার মা নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক। তাদের স্বভাবই ঐ রকম। শিবনাথও নিরপরাধ। শৈলজা, জ্যোতির্ময়ী এসে অবিলম্বে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন। কিন্তু গৌরীর কাছে ঐ খবরটি হয়তো কিছুটা বিকৃত ভাবেই পৌঁছেছিল। আঠারোর পরিচ্ছেদেই তার চিঠি এসেছে। সে লিখেছে—'মনে করিয়াছিলাম, বিষ খাইয়া মরিব। কিন্তু দিদিমার কথায় মন মানিল, কেন মরিব? দিদিমা বলিলেন, মনে কর্, তোর বিবাহ হয় নাই। ···যে লোক একটা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য ডোমের মেয়ের মোহে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তাহার সহিত কোন ভদ্রকন্যা-ভদ্ররমণীর বাস অসম্ভব।'

এই চিঠিরই ক'দিন পরে এসেছে সুশীলের চিঠি। সুশীল লিখেছে—'আপনি আর দেশে বসিয়া কেন? কলেজ খুলিতে আর কয়দিনই বা বিলম্ব! আপনি এখানে চলিয়া আসুন। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেশের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবেন।'

আঠারোর পরিচ্ছেদে এইভাবে দুটি চিঠি অবলম্বন করে শিবনাথের জীবনে দুটি বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ গৌরীর সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,—দ্বিতীয়তঃ দেখা দিয়েছে তার কলকাতা যাত্রার সংকল্প! গৌরীর চিঠি দেখে জ্যোতির্ময়ী শিবনাথকে বলেছেন যে, সে কলঙ্ক না গেলে তার সঙ্গে সে যেন আর দেখা না করে—'এই আমার আদেশ রইল'। অতঃপর কলকাতা। আঠারোর পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠায় হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেচে শিবনাথ। সুশীল তাকে নিতে এসেছে।

উনিশের পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, এক বছর কলকাতার এক মেসে

বাস করবার পরেও কলকাতা সত্যিই পুরোনো হয়ে যায়নি তার কাছে। তার মনে হয় কলকাতা যেন দেশের হৃৎপিণ্ড—সমস্ত রক্তস্রোতের কেন্দ্রস্থল। উপমা বদলে দিয়ে সুশীল বলেছে—'এই বিরাট শহরটা হোলো একটা শোষণযন্ত্র।' দুই বন্ধুর মধ্যে দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা উঠেছে। দুটি তরুণের আলাপে স্বদেশ-প্রেমের এইসব কথা থেকেই দুর্যোগের প্রতিকারের কথাও দেখা দিয়েছে। তারই মধ্যে শোনা গেছে সুশীলের আট বছরের বোন দীপার উল্লেখ। সত্য, সঞ্জয় প্রভৃতি আরো কয়েকটি ছেলেরও নাম করা হয়েছে। তারই মধ্যে, কোন এক জাহাজের খালাসীকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সুশীল রিভলভার কিনতে উদ্যত হয়! আর, সেই বীরের সেবাব্রত স্মরণ করে শিবনাথ তার সোনার চেন উৎসর্গ করে! এইসব ঢেউয়ের মধ্যেই হঠাৎ একদিন খবর কাগজে দেখা যায়—'ইউরোপের ভাগ্যাকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। সেরাজেভো শহরে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড এবং তাঁহার স্ত্রী অজ্ঞাত আততায়ীর গুলির আঘাতে নিহত। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অষ্ট্রিয়ান গবর্মেণ্টের সার্ভিয়ার নিকট কৈফিয়ত দাবি। যুদ্ধসজ্জার বিপুল আয়োজন'।

সেই উনিশ শ চোদ্দ সালে, একদিন—'ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সুশীল বলিল, এইবার কাজের সময় আসছে শিবনাথ। যে কোনো মুহূর্তে প্রত্যেককে প্রয়োজন হতে পারে।'

রামকিঙ্করবাবু আর কমলেশ শিবনাথকে আর-একবার ফেরাতে এসেছিলেন, কিন্তু সেবারও ফেরেনি শিবনাথ। কুড়ির পরিচ্ছেদে, উপযুক্ত অনুসন্ধানের ফলে শিবনাথের চারিত্রিক নিষ্কলঙ্কতা সম্বন্ধে রামকিঙ্করবাবুরা অবিশ্যি পরিতৃপ্ত হয়েছেন। কমলেশ নান্তির ভাই,—শিবনাথের বন্ধু। একদিন শিবনাথ সম্বন্ধে কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করেছিল বলে খুবই অনুতাপ দেখা দেয় কমলেশের মনে। কুড়ির পরিচ্ছেদেই এই অনুসন্ধান-বৃত্তান্ত বলা হয়েছে বটে,—কিন্তু এর ফল আগের পরিচ্ছেদেই সূচিত—শিবনাথকে নিরপরাধ জেনেই রামকিঙ্করবাবু তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন।

এই কুড়ির পরিচ্ছেদেই একদিন দুপুরে অমলেশকে আবার শিবনাথের ঘরে আসতে দেখা যায়। শিবনাথ তখন পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী-দলে। দলের অরুণ বলে একটি ছেলের কাছে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। তার মেস

থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে, শিবনাথকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবার নির্দেশ আসে দল থেকে। অভাবিতপূর্ব পরিবেশে,—সেই মেসেরই ঝাড়ুদারনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে গ্রামের সেই নিরুদ্দিষ্টা ডোম-বউকে!

একুশের পরিচ্ছেদে দেশের তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলির কর্মব্যস্ততার ইশারা দেওয়া হয়েছে—'সুশীলকে দেখাই যায় না। সে নাকি সমগ্র উত্তরাপথ—লাহোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটা বিরাট ব্যবস্থার চেষ্টায় ফিরিতেছে।' শিবনাথের ঘরের সামনে গোয়েন্দা ঘোরাফেরা করে। এই অবস্থায় সেই ডোম-বউয়ের সস্নেহ উদ্যোগেই ঘরের আবর্জনার সঙ্গে গোপন অস্ত্রশস্ত্রগুলি বাইরে অপসারিত হয়। এদিকে শিবনাথের কাছে পিসিমার চিঠি আসে। তিনি লিখেছেন—'তোমার মা কয়দিনই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, তোমার সর্বাঙ্গ যেন রক্তমাখা, ঘরের মেঝে রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে।' পরদিন সে যখন বাড়ি গিয়ে মাকে দেখে আসবার সংকল্প করেছে, সেই সময়ে পূর্ণ এসে এই কথা জানায় যে, তাদেরই দলের অসামান্য এক নেতা হঠাৎ দলের মত উপেক্ষা করে বিরোধী হয়ে উঠেছেন—তাঁরই কাছে যেতে হবে শিবনাথকে।

বাইশের পরিচ্ছেদে, শিবনাথ আর পূর্ণ, দুজনে সাঁওতাল পরগনার এক দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছোয়। সেখানে, সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস-হারা সেই নেতাকে খুন করেছে পূর্ণ! অনেক 'আকস্মিক' ঘটনার মধ্য দিয়ে শিবনাথ গিয়ে পৌঁছোয় তার মায়ের মৃত্যু-শয্যায়। অতঃপর তেইশের পরিচ্ছেদে জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়।

এই তেইশের পরিচ্ছেদেই গৌরী শ্বশুরবাড়তে এসে পৌঁছোয়। জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যুর পরেও শৈলজা ঠাকরুন তাঁর কর্তব্য ভোলেন নি। তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শিবনাথ যে নিজের হাতে বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব নিতে পারে,—এ সম্ভাবনা তাঁর মোটেই ভালো লাগে নি। চব্বিশের পরিচ্ছেদে পিসিমার সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য উচ্চারিত হতে দেখে, গৌরী আর কমলেশের সম্বন্ধে শিবনাথের বিমুখতা দেখা দেয়। এদিকে পিসিমার কর্ত্রীত্বেই, বেশ সমারোহের সঙ্গে শিবনাথের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের ঝগড়াও মিটে যায়। গৌরীর হাতেই সংসারের ভার দিয়ে শৈলজা এইবার কাশী যাত্রা করেন।

পঁচিশের পরিচ্ছেদে তো বটেই,—তারপর ছাব্বিশের পরিচ্ছেদেও গৌরীর

সঙ্গে শিবনাথের আবার মনোমালিন্য চলতে দেখা গেছে। রাখাল সিংয়ের সঙ্গেও ঠিক বনিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পিসিমার অভাব সত্যিই এক অপূরণীয় অভাব!

ইতিমধ্যে গ্রামে অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। উনত্রিশের পরিচ্ছেদে—রামরতনের সহায়তায় সম্পত্তি বাঁধা রেখে টাকা জোগাড় করবার চেষ্টা দেখা যায়। তিরিশের পরিচ্ছেদে গৌরীর সন্তান-সম্ভাবনার খবর পাওয়া যায় এবং একত্রিশের পরিচ্ছেদে সুশালের মারফৎ পূর্ণর মৃত্যু-সংবাদও এসে পৌঁছোয়! বত্রিশের পরিচ্ছেদে গোঁসাইবাবার হাতে শিবনাথের জমিদারি-সমর্পণ,—অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তার যোগদান,—এবং তারপর তেত্রিশের পরিচ্ছেদে তার গ্রেপ্তারের খবর!

'ধাত্রীদেবতা' তারাশঙ্করের প্রথম দিকের রচনা হলেও এটি তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত উপন্যাস। এতে তাঁর স্বভাবের প্রায় সব লক্ষণই ধরা পড়েছে,—যেমন,—পদে পদে আকস্মিকতার দিকে ঝোঁক,—একঘেয়ে বর্ণনা,—একঘেয়ে কথকতা,—জমিদারির কথা আর চাষবাসের কথা,—নালিশ-মকদ্দমার প্রসঙ্গ,—সন্ন্যাসী-প্রসঙ্গ,—বা ঐ ধরনেরই অন্য কিছু কিছু ঘোষণা বা ইঙ্গিত! শরৎচন্দ্রের মতন কতকটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সামর্থ্য থাকলেও তাঁর মতন সাবলীল ভঙ্গি পাননি তারাশঙ্কর। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' প্রভৃতি উপন্যাসে—অথবা তাঁর আগেকার কাহিনীগুলিতেও লেখক হিসেবে তারাশঙ্করের বিশেষ কয়েকটি বিষয় আর রীতির দিকেই ঝোঁক দেখা গেছে। সে-সব লক্ষণের কথা ইতিমধ্যে নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। জমিদারি-আবহাওয়া, দলিল-দস্তাবেজের বুলি, চাষী-মোড়লের কথা,—প্রতাপ আর প্রভুত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের বিলাসের বর্ণনা দিয়ে যাওয়াই তাঁর স্বভাব। আর, সেই সঙ্গে কিছু-কিছু সমস্যার কথাও তিনি উত্থাপন করে থাকেন। 'চাঁপাডাঙ্গার বৌ', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'আরোগ্য-নিকেতন,' 'বিচারক', 'সপ্তপদী', 'স্বর্গ-মর্ত্ত', 'রাধা', 'যোগভ্রষ্ট' ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পর্বের লেখাতেও তাঁর সেই অভ্যাসেরই অনুস্মৃতি দেখা যায়।

কালিন্দী, চাঁপাডাঙ্গার বৌ

'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'কালিন্দী' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলির কথা আলোচনা করতে গেলে,—তারাশঙ্করের স্বভাবের কয়েকটি বিশেষত্ব এই সব রচনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে বলে মান্‌তে হয়। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র সঙ্গে 'কালিন্দী'র,—'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র সঙ্গে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। আবার, এদের বৈসাদৃশ্যের দিকটাও সুস্পষ্ট। 'কালিন্দী'তে একটি চরের অধিকার নিয়ে রায়হাটের প্রাচীন জমিদার-বংশের বিভিন্ন শরিকের মধ্যে বিবাদের কথা খুবই বিশদভাবে বলা হয়েছে। রায়বংশের ইন্দ্র রায়,—তাঁরই চিরকালের প্রতিপক্ষ, রায়েদের দৌহিত্রবংশের রামেশ্বর চক্রবর্তী,—প্রাচীন নায়েব যোগেশ মজুমদার,—আর সেই জমিদার-বাড়ির সমস্ত কাজের নিয়ন্ত্রী রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি দেবী,—তাঁর দুই ছেলে, মহীন আর অহীন,—এঁদের সকলের সমাবেশে 'কালিন্দী'র কাহিনী-প্রবাহে যে চরিত্র-বৈচিত্র্য বা ঘটনা-বহুলতা দেখানো হয়েছে, 'ধাত্রীদেবতা'র পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা এবং ঘটনার বহুলতার দিক থেকে—তাতে এদের উভয়ের সাদৃশ্যই অনুভব করা যায়, যদিও 'কালিন্দী'তে যে হিংসা, প্রচণ্ডতা অথবা ভয়াবহতা দেখা গেছে, 'ধাত্রীদেবতা'তে তা নেই। 'কালিন্দী'তে রামেশ্বরের পিতা সোমেশ্বরের আমলে বীরভূমের ইতিহাস-বিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহের কথা উঠেছে,—সেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েই ইংরেজের হাতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন সোমেশ্বর। শুধু তাই নয়, তাঁর পরাজয়ের পরে ইংরেজরা পাছে তাঁর স্ত্রী শৈবলিনীর কোনো ক্ষতি করে, এই আশঙ্কায় সোমেশ্বর নিজের হাতে,—খাঁড়ার আঘাতে শৈবলিনীকে হত্যা করেছিলেন বলে শোনা যায়। চক্রবর্তীদের এই সোমেশ্বরের মৃত্যুর পরে, রায়েদের সঙ্গে তাঁদের কলহ শেষ হয়। সোমেশ্বরের ছেলে রামেশ্বরের সঙ্গে তেজচন্দ্র রায়ের মেয়ে রাধারানীর বিয়ে হয়। কিন্তু রামেশ্বরের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে সে বিয়ে বড়োই অশান্তিপ্রদ হয়। রাধারানীর একটি সন্তান হয়, কিন্তু শৈশবেই তার মৃত্যু ঘটে যায়। তারপর রাধারানীও নিরুদ্দেশ হয়। তখন পশ্চিম-প্রবাসী এক শিক্ষকের কন্যা এই সুনীতিকে বিয়ে করেন রামেশ্বর।

এই উপন্যাসে অতঃপর দেখা দিয়েছে চাষী-সর্দার রংলাল। রংলালের দাবি এই ছিল যে, তারাও চরের কিছু অংশের দখল পাবে। কিন্তু ইন্দ্ররায় সে কথায় কান না দেওয়ায় রংলালই চক্রবর্তীদের বাড়িতে গিয়ে সুনীতি দেবীকে জানিয়ে দেয় যে, আইন-সম্মতভাবে আফ্‌জলপুরের সংলগ্ন সেই চরের দখল চক্রবর্তীরাই দাবি করতে পারেন। প্রজাদের ওপর যাতে অবিচার না হয়, সেই অভিপ্রায় নিয়ে,—মায়ের আদেশে অহী তখন গেছে ইন্দ্র রায়ের কাছে। কিন্তু ইন্দ্র রায় তখনো কান দেন নি সে-কথায়। তারপর রংলালের সঙ্গেই একদিন চরে বেড়িয়ে এসেছে অহী। ইন্দ্র রায় সাঁওতালদের উৎসাহের খবর পেয়েছেন। অহী যে তাদের রাঙাঠাকুর সোমেশ্বরের নাতি, এই খবর পেয়ে তারা খুবই খুশি হয়েছে। সে খবরও তাঁর অজানা থাকেনি। তখন শঙ্কিত হয়ে, ননীচোরা পাল নামে অতি দুর্দান্ত এক প্রজার নামে কিছু জমি লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তারই সাহায্যে চক্রবর্তীদের সঙ্গে নতুন বিবাদ সৃষ্টি করেছেন ইন্দ্র রায়। ইন্দ্র রায়কে জমিদার বলে মেনে নিয়েছে ননী পাল। রাধারানীর নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে কটাক্ষ শোনা যায় তারই মুখ থেকে। আর, তাইতেই রেগে গিয়ে, উত্তেজিত অবস্থায় ননী পালকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে মহীন।

রাধারানী যে ইন্দ্ররায়েরই নিজের বোন ছিলেন, আর সেই বোনের জন্যেই মহী যে ননী পালকে হত্যা করে জেলে গেছে,—মহীর মামলা চালাতে গিয়ে চক্রবর্তী-বংশ যে পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেছেন,—তাঁদের জমিদারি নিলামে কিনে নিয়েছে নায়েব যোগেশ মজুমদার,—এইসব ঘটনাতেই ইন্দ্র রায়ের মনের পরিবর্তন ঘটেছে। নিজের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর কাছেও তিনি যেন অপরাধী বোধ করেছেন। এদিকে অহী বড়ো হয়ে উঠেছে, লেখাপড়াতেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে। ইন্দ্র রায়ের ছেলে অমলের সঙ্গে একই কলেজে পড়তে পড়তে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব দেখা দিয়েছে। ইন্দ্র রায়ের মেয়ে উমা কলকাতায় তার মাতুলালয়ে থেকে, কোনো এক ইস্কুলে পড়ে। তাকেও ভালো লেগেছে অহী-র। এদিকে, যোগেশ মজুমদার যাতে চক্রবর্তীদের আর বেশি বঞ্চিত করতে না পারেন, সে-জন্যে বিমলবাবু নামে কোনো এক চিনির কলের মালিককে চর ইজারা দেন ইন্দ্র রায়। ফলে, অচিরেই নগর বসে যায় সেই চরে। সাঁওতালদের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয়,—তাদের

মধ্যে অশান্তি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে। তারপর অহীর সঙ্গে উমার বিয়ে হয়ে যায়। অচিরেই কলের মালিকের সঙ্গে ইন্দ্র রায়ের এবং চক্রবর্তীদের মামলা বেধে গেছে, কলের মালিকই জয়ী হয়েছে। আবার বদলে গেছে চরের চেহারা। ট্র্যাক্টর এনে জমি চষে ফেলেছে নতুন মালিক। এদিকে উমার কাছ থেকে ইন্দ্র রায় জানতে পারেন যে, অহী সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়েছে। ইন্দ্র রায়ের কাশীযাত্রা তাই স্থগিত রাখতে হয়েছে। 'ধাত্রীদেবতার' মতন এখানেও—এই সন্ধিতে কিছু থানা-পুলিসের আয়োজন দেখানো হয়েছে। অহীন্দ্রকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

এই ভাবে ঘটনার ঘনঘটা ঘটিয়ে, তারাশঙ্কর তাঁর 'কালিন্দী'র এই শেষ দিকে, নাটকীয় ভাবে, জরাগ্রস্ত রামেশ্বর চক্রবর্তীকে কোনো-এক গভীর রাত্রে তারই পর্যঙ্কে স্থাপিত অবস্থায় দেখিয়েছেন। পত্নী সুনীতিকে কাছে ডেকে নিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন তিনি। রাধারানীকে তাঁরই হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল—সন্দেহবশে তাকে গলা টিপে মেরেছিলেন রামেশ্বর! রাধারানীর ছেলেকে অবৈধ সন্তান ভেবে তাকেও গলা টিপে হত্যা করেছিলেন রামেশ্বর। রাধারানী তাই অভিসম্পাত দিয়েছিল যে, রামেশ্বরের চোখ যেন নষ্ট হয়ে যায়,—তার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়!

রামেশ্বর অন্ধও হয়েছিলেন, তাঁর কুষ্ঠও হয়েছিল। কিন্তু মহী-অহীর পুণ্যে সেই অন্ধতা আর কুষ্ঠ-ব্যাধি থেকে তিনি নাকি মুক্ত হয়ে উঠেছেন। সব শুনে, থরথর করে কাঁপতে হয় সুনীতিকে! পরিবেশের এইরকম প্রচণ্ডতা,—ঘটনার এই ধরনের চমক,—এবং সব মিলিয়ে জটিলতা, বিস্ময় আশঙ্কা, উপদ্রব, আলোড়ন আর বিহ্বলতার এইরকম আবর্ত সৃষ্টি করাই তারাশঙ্করের স্বভাব! কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর চিরাভ্যস্ত সমারোহ-প্রদর্শনের চেষ্টায় তাঁকে অনুত্তীর্ণ হতেও যে না দেখা যায়, এমন নয়! যেমন, তাঁর 'চাঁপাডাঙার বউ' উপন্যাসে।

বর্ধিষ্ণু চাষী ছিল সে,—দেবগ্রামের মাতব্বর ছিল প্রতাপ মণ্ডল। ঠিকাদারী আরম্ভ করবার পরে, হঠাৎ তার একদিন টাইফয়েডে মৃত্যু ঘটে যায়। ফলে, গেল তার বিষয়-সম্পত্তি। বড়ো ছেলে সেতাবের বয়স তখন মাত্র বার বছর,—ছোটো মহাতাপের ছ' বছর। তারপর, যথাকালে নিজের হাতে চাষের কাজ শুরু করেছে সেতাব। কাদম্বিনী নামে

একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার। ছেলেবেলায় টাইফয়েড হওয়ার ফলে মহাতাপকে কিঞ্চিৎ জড়বুদ্ধি বলে মনে হোতো। কিন্তু পরে সেও সুস্থ হয়ে ওঠে। কাদম্বিনী তারই এক জ্ঞাতি-কন্যা মানদার সঙ্গে মহাতাপের বিয়ে দেয়। এইভাবে চলতে-চলতে—ঘটনাস্রোতে, চাঁপাডাঙার বউ নিঃসন্তানা কাদম্বিনীকে দিয়ে একদিকে আক্রোশ আর আক্রমণ,—অন্যদিকে স্নেহ-মমতা-আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু মহাতাপ-কাদম্বিনী-ঘটিত কটাক্ষ, ঘোঁতনের আক্রোশ, সেতাব-পুঁটির বিবাহ ইত্যাদি নানা আয়োজন সত্ত্বেও এ-উপন্যাসের সত্যিকার স্বাভাবিকতার অভাব সত্যিই বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, মন্বন্তর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

১৩৪৯ সালের আশ্বিন মাসের গোড়ার দিকে 'গণদেবতা',—তারপর ১৩৫০ এর মাঘ মাসে তাঁর 'পঞ্চগ্রাম' প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে, এই একই ধারায় তাঁর 'মন্বন্তর' বইখানির কথাও স্মরণীয়। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মতন এই সব লেখাতেও সংস্করণে সংস্করণে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। 'গণদেবতা'র প্রথম সংস্করণের 'নিবেদন' অংশে তিনি লিখেছিলেন: 'সংক্ষেপে কয়েকটি কথা প্রয়োজনবোধে নিবেদন করিতেছি। 'গণদেবতা' বইখানি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। এটি তাহার অংশবিশেষ;—চণ্ডীমণ্ডপ নামাঙ্কিত অংশ। দ্বিতীয় অংশ 'পঞ্চগ্রাম' নামে বাহির হইতেছে। 'ভারতবর্ষে' যাঁহারা 'চণ্ডীমণ্ডপ' পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন—'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'চণ্ডীমণ্ডপ' ও বর্তমান বইখানি প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। গোড়ার আশি পৃষ্ঠা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পর—একাশি পৃষ্ঠা হইতে অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ নূতন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করিতে বসিয়া সমস্তই পাল্টাইয়া গেল। প্রায় প্রতিটি ছত্র নূতন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভাল-মন্দের বিচারক যাঁহারা, তাঁহারা ভাল-মন্দ বিচার করিবেন। বিচার-প্রার্থীর মত তাঁহাদের রায় আমি মাথা পাতিয়া লইব।'

তেরশ পঞ্চাশ সালের মাঘ মাসে 'পঞ্চগ্রাম'-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন: 'পঞ্চগ্রাম' প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল। 'গণ-দেবতা' (চণ্ডীমণ্ডপ) প্রকাশিত হইয়াছে পনের মাস পূর্বে। 'গণ-দেবতা'র প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইল। বহু সহৃদয় পাঠক 'পঞ্চগ্রাম' সম্বন্ধে অনুসন্ধানও করিয়াছেন। বিলম্বের জন্য কোন কারণ বা কৈফিয়ৎ দিব না; শুধু ক্রটি স্বীকার করিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। 'পঞ্চগ্রামের' মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের চাষী মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে একটা কথা নিবেদন করি। আমি নিজে যেমন দেখিয়াছি—তেমনি লিখিয়াছি। কতকগুলি হুবহু সত্য ঘটনা—কাহিনীর আকারে সাজাইয়া দিয়াছি মাত্র।'

এই ভূমিকাতেই তিনি আরো লিখেছিলেন: 'সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা বলিবার আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভবপর হয় নাই। এবং এত বড় পুরাতন দেশ ও সমাজের অতি প্রাচীন ইতিহাসের সব কথা আমার জানাও

নাই। তাই অকথিত অনেক কিছু থাকিল। তবে যাহার কথকতা করিয়াছি—তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার; বিশ্লেষণে মতান্তর ঘটিতে পারে। আমার ইচ্ছা ছিল—'চণ্ডীমণ্ডপ'—এবং 'পঞ্চগ্রাম' এই দুইখানি উপন্যাসের একত্রিত রূপের নাম দিব 'গণদেবতা'। কিন্তু 'চণ্ডীমণ্ডপ' প্রকাশের সময়ই ভুল হইয়া গিয়াছে। 'চণ্ডীমণ্ডপ'ই 'গণদেবতা' নামে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে; তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া গেল; সুতরাং সে সংশোধনের আর উপায় নাই।'

'গণদেবতার' সঙ্গে 'পঞ্চগ্রামের' এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা তিনি নিজেই এইভাবে বলেছেন। রচনাকালের দিক থেকে 'মন্বন্তর' এই দু'খানি বইয়ের সন্নিহিত বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এতে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। 'মন্বন্তরে'র প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি যে চক্রবর্তী-পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন, সে-পরিবারের পূর্বপুরুষ সুখময় চক্রবর্তী কলকাতা শহরে—অন্ততঃ পঞ্চাশ বিঘে জমিতে বস্তি গড়ে তুলে, ভাড়াটে প্রজার এক রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন! সেই চক্রবর্তী-পরিবারের দিকে তাঁর মনোযোগের কৈফিয়ৎ হিসেবে 'মন্বন্তরে'র ভূমিকায় কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। এখানে তাঁর সে-মন্তব্যও স্মরণ করা দরকার। তাছাড়া এই ভূমিকাতেই 'মন্বন্তরে'র ভাষা সম্বন্ধেও তাঁর নিজের মন্তব্য আছে। তিনি সাধুভাষাতেই লিখে এসেছেন,—কিন্তু 'মন্বন্তরে' চলতি ভাষায় প্রয়োগ ঘটেছে।

তিনি জানিয়েছেন: 'মন্বন্তর প্রকাশিত হোলো। দেশের অবস্থার পটভূমিতে বাঙালীর এ যুগের নতুন আদর্শ-অনুপ্রাণিত ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়ে বই লিখবার কল্পনা আমার ছিল। কিন্তু সে কল্পনা এত শীঘ্র কর্মে রূপান্তরিত হবে, এ ভাবি নি। একটি আলোচনা-বাসরের বিতর্ক থেকে মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং 'মন্বন্তর' লিখতে আরম্ভ করি। পূজা-সংখ্যা আনন্দবাজারে প্রকাশ করবার জন্য তখন এর রূপ ছিল অন্যরূপ। স্থান সঙ্কুলানের জন্য সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশ করবার সময়—যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বিশদভাবে বলবার, উপন্যাসের লম্বিত তালে সুর বাঁধবার চেষ্টা করেছি।' এছাড়া তাঁর এই 'মন্বন্তর'-এর ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন: 'আর একটি কথা বলবার আছে। সেটি

'মন্বন্তরে'র ভাষা সম্পর্কিত, চলতি ভাষায়। এর অর্থ এ নয় যে, আমি বর্তমান উপলব্ধিতে চলতি ভাষাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছি। তবে বিষয়বস্তুর বাহন হিসাবে এ-ক্ষেত্রে এ-ভাষাকেই গ্রহণ করেছি। সে হিসাবে চলতি ভাষায় 'মন্বন্তর' আমার প্রথম রচনা। বহুপূর্বে 'ত্রিশূন্য' নামে একটি গল্প অবশ্য চলতি ভাষায় লিখেছিলাম। কিন্তু তাকে ঠিক গণনার মধ্যে আনা যায় না।'

নানা চরিত্রে, ঘটনায়, সংলাপে, বক্তৃতায় উচ্ছ্বাসে তারাশঙ্করের এই তিনখানি উপন্যাসই স্মরণীয়। কিন্তু দেবু, স্বর্ণ,—সদ্‌গোপপাড়া, মুচিপাড়া, ডোমপাড়া,—ময়ূরাক্ষীর তীরভূমি ইত্যাদি উল্লেখ-আলোচনা-বর্ণনার বিপুলতা ছাড়া এসব রচনায় নতুন কোনো দিগন্ত-সন্ধানের চিহ্ন নেই। সে-কথা এই সূত্রেই স্বীকার্য।

মহাগ্রাম, দেখুড়িয়া ইত্যাদি পাঁচ খানি গ্রাম নিয়ে পঞ্চগ্রাম। সেখানে খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান সব প্রজা মিলে যখন ধর্মঘটের আয়োজন করে, তখন কালীশিবপুরের দেবনাথ ঘোষের ওপরেই ন্যায়রত্ন-মশাই বিধান দেবার ভার দেন। দেবু ছিল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। কিন্তু ন্যায়রত্ন মশায়ের পৌত্র বিশ্বনাথের আগ্রহে সেদিন ধর্মঘটেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পঞ্চগ্রামের এই দেবু আর স্বর্ণর কথা এর আগেই বলা হয়েছে। এই উপন্যাসের আখ্যান-প্রকৃতি—অথবা এরই সঙ্গে জড়িত 'গণদেবতার' আখ্যান-প্রকৃতি নতুন করে ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই। 'গণদেবতার' গণ্যমান্য দ্বারিকা চৌধুরী, জগন ডাক্তার,—একমাত্র ব্রাহ্মণ হরেন্দ্র ঘোষাল,—নতুন ধনী শ্রীহরি পাল বা ছিরু ইত্যাদি চরিত্রের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর একই রকম আবহ ফুটিয়ে তুলেছেন। দেবু ঘোষ চাষী হয়েও চাষীর ঘরের ব্যতিক্রম। ছিরু পালের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তার,—কিন্তু তার প্রকৃতি অন্যরকম। লেখাপড়ায় কৃতী ছিল সে,—অভাবে পড়ে অল্প বয়সেই ছাত্রজীবন ত্যাগ করতে হয় তাকে। তারপর সে হয়েছে ফ্রী-প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত! তার স্ত্রী বিল্বাসিনী, আর ছোটো একটি ছেলে, এই নিয়েই তার সংসার।

গ্রামের কর্মকার অনিরুদ্ধ এই দেবুরই বাল্যবন্ধু। তার স্ত্রীর নাম পদ্ম। নিঃসন্তানা এই পদ্মর সম্বন্ধে ছিরুপালের মনে জেগে থাকে গোপন লালসা। সেই সঙ্গে হরিজন-পল্লীর পাতু বায়েনের বোন দুর্গার রূপ-যৌবন

আর, তার স্বেচ্ছাচারিতার কথাও সুস্পষ্ট। ছোটো বড়ো সকলেই দুর্গার অনুরাগী, ছিরুপালের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে। ফলে, ছিরুপাল আর পাতু পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে।

'গণদেবতার' কাহিনী বা ঘটনাস্রোত এই ভাবে তারাশঙ্করেরই অভ্যস্ত চরিত্ররূপ,—জীবন-সমস্যা,—অবৈধ প্রণয়-প্রসঙ্গ,—পল্লীসমাজের চাষী, কামার, নিম্নশ্রেণীর ধনী, দুশ্চরিত্র স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি উপাদান-উপকরণ সমাবেশের মধ্য দিয়ে, তাঁরই নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্রমশঃ জটিলতা সৃষ্টি করে এগিয়ে গেছে। এই রীতিই তাঁর স্বকীয় রীতি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় কোপাইয়ের বাঁধ, আর, বাঁশবাদি গ্রামের ভাগ্যবিধাতা 'কর্তাবাবা',—অতি প্রাচীনকালে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল যেখানে,—সেই 'সাহেবডাঙ্গা',—সেই বেলগাছ যে জায়গাটিকে গ্রামের কাহার-অধিবাসীরা 'বাবার থান' বা সেই 'কর্তাবাবা'র অধিষ্ঠানভূমি বলে চিহ্নিত করে রেখেছিল, সে-পরিবেশও তাঁরই স্বাক্ষর-চিহ্নিত। বেহারাপাড়ার প্রধান—বানোয়ারী-কাহার, আর, তার নিঃসন্তানা স্ত্রী গোপালীবালা, এই দুজনকে নিয়েই একটি সংসার। এ ছাড়া গ্রামের প্রবীণদেরই অন্যতম—সুচাঁদ কাহারনীর কথাও স্মরণীয়। কাহার-পাড়ার কতো যে আচার, আর কতো যে বিধানের মালিক সে। তার মেয়ে বসনের বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু তার স্বামী মারা গেছে। চৌধুরীদের মাতাল সেজো-ছেলেটিও লোকান্তরিত। সেই ছেলেটির সম্বন্ধে বসনের অনুরাগের কথা সুপরিচিত। এদিকে, বসনের মেয়ে পাখি অসামান্যা রূপসী। চৌধুরীদের সেই লোকান্তরিত ছেলেটির সঙ্গে পাখির যেন চেহারার সাদৃশ্য দেখা যায়। পাখির বিয়ে হয়েছিল নয়নের সঙ্গে। কিন্তু নয়নের হাঁপানি-রোগ বরদাস্ত করতে পারেনি পাখি। স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে, সে তাই পালিয়ে এসেছিল তার মায়ের কাছে। তারপর বাঁশবাদি গ্রামের সুস্থ, সবল করালী-ই তার মনে জায়গা দখল করে!

হাঁসুলী-বাঁকের এই 'করালী' চরিত্রটি তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসের বিদ্রোহী পুরুষ-চরিত্রগুলিরই অন্যতম। অতি শৈশবে তার মা তাকে পরিত্যাগ করে যায়। তারপর জাঙ্গালের ঘোষেদের বাড়িতে কাজ করবার সময়ে বিনাদোষে মার খেয়ে সে পালিয়ে যায়। নিজেদের কুলধর্ম ত্যাগ করে চন্দনপুরের রেল-লাইনের কাজে লেগে যায় সে। অবশেষে পাখির সঙ্গে প্রণয় ঘটেছে তার!

এ-উপন্যাসের আর একটি অদ্ভুত চরিত্রের নাম নসুরাম—তথা, নসুবালা। করালীর পিসতুতো ভাই সে। তার ভাব-ভঙ্গি, আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা সবই স্ত্রীলোকের মতন,—তাই নামও নসুবালা। করালীর ঘরে সেই যেন গৃহিণী! আর সেখানে থাকে আটপৌরে-পাড়ার জেল-ফেরৎ পরম কাহার। তারই স্ত্রী কালোশশী এক সময় বানোয়ারীর সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল।

এই সব স্ত্রী, পুরুষ,—এই প্রথা, আচার, সংস্কার এবং সংস্কার-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে,—হাঁসুলী-বাঁক-অঞ্চলের নানা উপকথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, এ-কাহিনী উনিশ-শ তেতাল্লিশ সালের সর্বনাশা-বানের বর্ণনায় এসে পৌঁছেচে। নয়ন মরেছে, বানোয়ারী মরেছে, কালোশশীর বোনঝি সুবাসীকে বিয়ে করেছে বানোয়ারী। গোপালীবালাও মরেছে। ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এবং ধীরে ধীরে উপকথাময়, ছায়াচ্ছন্ন বাঁশবাদি পিছনে ফেলে এ-গল্পের ধারা এগিয়ে এসেছে নতুন কালের নতুন হাঁসুলী-বাঁকের দিকে!

সন্দীপন পাঠশালা, আরোগ্য-নিকেতন

বইয়ের আকারে 'সন্দীপন পাঠশালা' প্রথম ছাপা হয় ১৩৫২ সালের মাঘ মাসে। ১৯৪৬ এর ১৫ই জানুয়ারি তারিখে স্বাক্ষরিত এই বইখানির ভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছিলেন :

> 'সন্দীপন পাঠশালা' ১৩৫২ সালের 'কৃষকে' 'উদয়াস্ত' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে নাম পরিবর্তন করলাম। 'সন্দীপন পাঠশালা'ই বইখানির সঙ্গত নাম। বাংলা দেশের শিক্ষক-জীবন অবহেলিত অনাদৃত। পাঠশালার শিক্ষক পণ্ডিতমহাশয়দের তো কথাই নাই। এঁদের সুখ-দুঃখ অবহেলিত, সমাজ-জীবনে সামান্যতম সম্মান থেকেও এঁরা বঞ্চিত। এঁদের নিয়ে দু-চারটি হাস্যরসাত্মক রচনা আমাদের সাহিত্যে আছে—সেইগুলিই এঁদের প্রতি অবহেলিত নিদর্শন। সীতারাম আমার কাছে বাস্তব; তার মনের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। তাকে সাহিত্যে রূপদানের বাসনা ছিল, এতদিনে তা সম্ভবপর হওয়ায় আমি নিজে আনন্দিত হয়েছি সবচেয়ে বেশি।
>
> 'বইখানি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়, অনেক কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করেছি, এবং তাতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।'

'সন্দীপন পাঠশালা'র আদর্শের কথাটা বইয়ের শুরুতেও আছে, শেষেও আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে, রত্নহাটা গ্রামের সদ্‌গোপ পাড়ায় নতুন ইস্কুলে ভর্তি হবার আগ্রহ দেখা গেছে। এদিকে রমানাথের ছেলে সীতারামও ছাত্র। গ্রামের ইস্কুলে থার্ডক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল সে। কিন্তু সীতারাম নর্মাল পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তার মা নেই। বিপত্নীক বাপ রমানাথ তার বিয়ে দিয়েছিল অল্প বয়সেই। একটু লেখা-পড়ার সুযোগ খুঁজছিল সীতারাম। পাছে সে-সুযোগ না জোটে, এই ভয়ে গভীর রাত্রে মনের দুঃখে গান গাইতে শোনা গিয়েছিল তাকে—'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল'! মাতৃহীন সেই ছেলের কণ্ঠে সেই দুঃখের গান শুনে রমানাথ আর আপত্তি করতে পারে নি!

বাল্যকালে, সীতারামের নিজের চোখে শিক্ষকের সম্মান দেখবার সুযোগ

এসেছিল একদিন। রত্নহাটা ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণ জমিদার-পরিবারের ছেলেরা তাদের গ্রামের সদগোপ শিক্ষককে প্রণাম করেছিল! বাবুদের উপেক্ষায় আর অনাদরে অভ্যস্ত সদগোপ-সমাজের পক্ষে সে দৃশ্য কি ভুলে যাওয়া সম্ভব ?

তারপর রত্নহাটার জমিদার-বাড়িতে 'কৃশকায়া দীপ্তগৌরবর্ণা মধ্যবয়সী' রানীমার অধীনে শ্যামু-দেবুর শিক্ষকের ভূমিকায় তার জীবন শুরু হয়। সেও অনেক দিনের কথা—সেটা ছিল ৮ই শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। সেই তেরশ' বাইশ থেকে শুরু করে, একে-একে অনেক,—অনেক দিন কেটে গেছে। পাঠশালা,—ইংরেজি ইস্কুল,—হেডমাষ্টার,—ইনস্পেক্টর—অনেক দেখেছে সীতারাম! তারপর হুগলী নর্মাল ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে সে। শেষ পরিচ্ছেদে [ষোড়শ],—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষ-সূচনায় এসে দেখা যায় যে, কৃষিজীবী পিতা রমানাথের সন্তান সীতারাম তখন খুবই বুড়ো হয়ে গেছে। এ-কাহিনীর শুরু যেখানে, সেখানে কিন্তু রমানাথকে দেখা গেছে পূর্ণ যৌবনে অধিষ্ঠিত। তখন সে বালক। সেটা সুদুর তেরশ' সালের কথা। সেখান থেকে—সময়ের স্রোত বয়ে এসেছে অনেক দূরে!

সীতারামের চোখে তাই পুরু চশমা, তবুও সে ভালো দেখতে পায় না। কয়েকটি তারিখ বড়োই উজ্জ্বল হয়ে আছে তার মনের গভীরে! ১৯৩৭-এর ১২ই ডিসেম্বর তার স্ত্রী মনোরমার মৃত্যু হয়। তারই কয়েক মাস আগে ৭ই সেপ্টেম্বর সীতারামের মেয়ে রত্না বিধবা হয়েছে। এই সব শোকের মধ্যেও সীতারাম শান্ত ছিল। তার মনে পড়েছিল 'মহর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের' সহিষ্ণুতার কথা। ধীরাবাবুর মা সেই সহিষ্ণুতা দেখে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কানাই রায়কে সীতারাম বলেছিল, 'সংসারে দুঃখই তো আসল জিনিষ রায়-কাকা। দুঃখ ছাড়া সংসারে আছেই বা কি, বল।' সেই কানাই রায়ও নিউমোনিয়ায় মরেছেন। ধীরাবাবুই বড় ডাক্তারের কাছে সীতারামের চোখের চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধীরাবাবুর মা বলেছিলেন, 'তুমি দীক্ষা নাও বাবা।' দীক্ষাও সে নিয়েছে! এদিকে,—সময়ের স্রোতে, ধীরাবাবুর মায়েরও মৃত্যু হয়েছে!

মনে পড়ে সে-সব দিনের কথা,—সেই রানী মাকে! ধীরাবাবুই নাম দিয়েছিলেন তার ইস্কুলের। শ্রীকৃষ্ণের গুরুর নাম সান্দীপনি মুনি। তাঁরই পাঠশালাতে কৃষ্ণ-বলরাম পড়েছিলেন। এদিকে দেশের কাজ ক'রে ধীরাবাবু

জেলে গিয়েছিলেন। দেশের ইতিহাসের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সন্দীপন-পাঠশালা কেবলই ভেঙেছে। শেষে সীতারামের নিজের হাতে-গড়া—সেই সন্দীপন-পাঠশালা সত্যিই পুরোপুরি উঠে গেছে একদিন।

সরকারের উদ্যোগে উচ্চ-প্রাথমিক অবৈতনিক ইস্কুল বসেছে জেলাতে। তাতে দুঃখ নেই সীতারামের। বিনা মাইনেতে দেশের সব ছেলে পড়তে পাবে,—সেই সুখেই মন তার ভরপুর!

শেষ দৃশ্যে ধীরাবাবুকে আবার আসতে দেখা যায়। সীতারাম তখন জীর্ণ, অবনত। তবু সে শরীর সোজা করে বসে। দুই দরদীর সেই আনন্দ-সম্মেলনের মধ্যে সীতারামকে বলতে শোনা যায়: 'লক্ষ্মণের চেয়েও আমি বেশি বীর, ধীরাবাবু। শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হয়েছিলেন, হনুমানকে বিশল্যকরণীর জন্যে গন্ধমাদন আনতে হয়েছিল। আমি শক্তিশেল বুকে গেঁথে নিয়ে বেড়াচ্ছি।' ধীরাবাবু জিগেস করেছিলেন, 'বয়স তো তোমার বেশি নয়?' তার জবাবে সীতারাম বলেছে, —'পাঠশালার পণ্ডিত, যাদের আয় পনেরো টাকা। তাদের এই বয়সই ঢের। তা ছাড়া—। হাসলে পণ্ডিত। তারপর বললে, জানেন তো, সন্দীপন পাঠশালা উঠে গেল। শিক্ষা-কর বসল দেশের উপর। ফ্রী ইউ-পি স্কুল হোলো, আমার পাঠশালাও তারই মধ্যে চলে গেল।' সেই করুণ ঘটনা-সন্ধিতেই— সমবেদনাময় ধীরানন্দ সীতারামের নিজের কথা শুনতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন,—'পণ্ডিত, তোমার মনোরমার কথা বলো। তোমার রত্নার কথা বলো।' দেশের বিখ্যাত লেখক ধীরানন্দকে পাঠশালার পণ্ডিত সীতারাম সেই সন্ধ্যায় তাঁর নিজের কথা বলতে গিয়ে, সমুচিত আবেগের সঙ্গেই বলেছে,—'তবে যেন ধীরাবাবু মিথ্যে রঙ-চঙ চড়াবেন না। একতারায় যেমন সুর ওঠে, তেমনই বাজাবেন। বাউলের গান যেমন হয়, তেমনই রাখবেন। একরঙা ছবি, যেমন লাগুক, দোসরা রঙের আঁচড় দেবেন না।—এই পাঠশালার পণ্ডিত।'

ধীরাবাবুকে সীতারাম সেদিন একখানি খাতা দিয়েছিল। সেই খাতাতে তার জীবনের সব কথাই লেখা ছিল, শুধু একটি কথা ছিল না। বৃদ্ধ সীতারামের নিজের মুখ থেকেই ধীরাবাবু সে কথা শুনলেন: 'ধীরাবাবু, বালিকা-বিদ্যালয়ে এক শিক্ষয়িত্রী এসেছিল, তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। পাঠশালার পণ্ডিত হলেও তো মানুষ আমরা। সেই কথাটা লেখা নাই।'

এই স্বীকারোক্তির পরেই পণ্ডিতের স্বর বদলে যায়। নিজের দৃষ্টিশক্তির কথা-প্রসঙ্গে ধীরাবাবুকে সীতারাম শেষ যে-কথাগুলি জানিয়েছে, তাতেই এই 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। সেই শেষকথাগুলির আনন্দ-বেদনার মধ্যে তারাশঙ্করের স্বভাবগত একটি মনোভঙ্গির,—পরিচিত এক অভ্যাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। পঞ্চগ্রামে,—গণদেবতায়,—কালিন্দীতে তো বটেই,—তাছাড়া তাঁর বিচারক, যবনিকা, যোগভ্রষ্ট প্রভৃতি আরো বিভিন্ন রচনায় তাঁর এই বক্তব্যের ভঙ্গিটি কোনো-না-কোনো ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সীতারাম বলেছে,—'ধীরাবাবু, আর একদিকে ভাল হয়েছে। ইষ্টদেবকে দেখতে পাই ভেতরে। আর—। হাসবেন না যেন। বসে থাকি আর ভাবি। ভাবি নয়, দেখতে পাই। সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলেরা যায় ইস্কুলে, আমি দেখি তাদের যে চেহারা নয়, সেই চেহারা দেখি। আটটি দশটি ছেলের পায়ের শব্দ শুনতে পাই, আমি ভাবি, চোখেও যেন দেখি, গ্রামের সব ছেলেমেয়ে চলেছে পাঠশালায়—মোটাসোটা চেহারা, ঝকমকে চোখ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে চলেছে সব পাঠশালায়। ফ্রী ইউ-পি পাঠশালা, দেখি ঘরের পর ঘর বেড়ে চলেছে—হুগলীর সব ব্যারাক দেখেছিলাম, সেই রকম সারি সারি ঘর। তার মধ্যে পাঠশালার পণ্ডিত একজন দুজন নয়,—দশজন বিশজন, তারা আমাদের মত দুঃখী নয়, আমাদের মত কম-লেখাপড়া-জানা পণ্ডিত নয়, তারা পড়াচ্ছে তাদের। তাদের মাইনে হয়েছে, দশ টাকা পনরো টাকা নয়, তিরিশ চল্লিশ টাকা, দেশে খাতির হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সবচেয়ে বড় মানুষ বললে তাদের সাজা হয় না। ছেলেরা পড়ছে, নামতা বলছে, লাফালাফি ছুটোছুটি করছে। দেশের সব—সব ছেলে পড়ছে। রত্নহাটার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, মুসলমান, আমার সন্দীপনে যাদের পাড়ার ছেলেরা পড়ত—সাহা, স্বর্ণকার, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ী সবারই ছেলে—সব পড়ছে সুর করে করে।' একটু থেমে সে আবার বললে, অন্ধ চোখে আমি তাই ভাবি, তাই দেখতে পাই। ধীরাবাবু, আমি তাই দেখতে পাই।'

এই উচ্চ আদর্শবোধ, —আর দেশের কল্যাণে ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের কথা তারাশঙ্করের বিশেষ প্রিয়কথা। এইসব প্রসঙ্গসূত্রেই তিনি করুণ-কোমল ভাবাবেগ ফুটিয়ে তোলেন। এখানেও তাই হয়েছে। সীতারামের সম্বন্ধে পাঠকের শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রণতি জাগাতে চেষ্টা করেছেন তিনি। সীতারামের

সেই অন্ধ অবস্থা! দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে ধীরানন্দ তাকে প্রণাম করেছে!

তারাশঙ্করের স্বভাবের বিশেষত্বগুলি এখানেও একই ভাবে চোখে পড়ে। তবে 'ধাত্রীদেবতা'র তুলনায় 'সন্দীপন-পাঠশালা' আরো যেন কিছু পরিণত রচনা বলে মনে হয়।

'আরোগ্য নিকেতন' (প্রথম প্রকাশ: চৈত্র, ১৩৫৯) দেবীপুর গ্রামের প্রায় আশি বছর আগেকার এক চিকিৎসালয়ের কাহিনী। স্থাপনকর্তা জগদ্বন্ধু কবিরাজ সেকালে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ঠাকুরদাস মিশ্রকে বলেছিলেন: 'আমাদের বংশের বসতি এখানে যতকাল থাকবে ততকাল এ আটন এ পাট পাকা হয়ে রইল।' জগদ্বন্ধু পুনরপি বলেছিলেন: 'এক পক্ষের লাভ আরোগ্যলাভ, অন্য পক্ষের লাভ সেবার পুণ্য। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—'লাভানাং শ্রেষ্ঠ আরোগ্যম্' —অর্থাৎ আরোগ্যলাভই সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভ।'

তখনো 'আরোগ্য-নিকেতন' নামকরণ হয়নি। নামকরণ হয়েছিল জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলে জীবন মশায়ের আমলে।

মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল দূরে,—জংশন থেকে বড় লাইন ছেড়ে, অপরিসর শাখা- রেলপথে এগিয়ে,—সমৃদ্ধ এক গ্রামের স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে আরো এগিয়ে গেলেই সমৃদ্ধ নতুন গ্রাম নবগ্রাম। সেখানে 'মেডিক্যাল স্টোর্স' আছে,— ভালো ডাক্তারও আছেন,—ভালো চায়ের দোকানেরও অভাব নেই। কিন্তু দেবীপুর আরো দূরে। বয়সের জীর্ণতায় এবং দারিদ্র্যের ভারে সেখানকার গাছ-পালা, মানুষ-জন বড়োই নিপীড়িত! সেখানে—'প্রথমেই চোখে পড়বে—ঝড়ে শুয়ে-পড়া শূন্যগর্ভ বকুল-গাছতলায় ধর্ম-ঠাকুরের আটন।' তারপর কামারশালায় চাষীদের ভিড়,—আর হাপরের হাওয়ায় উড়তে-থাকা গলিত লোহার ফুলকি! সেখান থেকেই গ্রামের আরম্ভ। বাঁশবনে,—শিরীষ গাছের মাথায় সেখানে কতো যে পাখির ডাক।

বিকেলের দিকে, আরোগ্য-নিকেতনে জীবনবন্ধু মশায় একা বসে থাকেন। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঁচিশ হাত লম্বা, খড়ের চাল-ওলা জীর্ণ একখানি কোঠা ঘর। বারান্দার দু'কোণে—'দুটি রক্তকরবীর গাছ সতেজ সমারোহে অজস্র লালফুলে সমৃদ্ধ হয়ে বাতাসে দুলতে থাকে। ওই গাছদুটির দিকে চেয়ে বসে

থাকেন বৃদ্ধ 'মশায়'। প্রায় সত্তর বছর বয়স তাঁর।—'স্থবির, ধূলিধূসর দিক্‌-হস্তার মতো বৃদ্ধ। এককালের বিশাল দেহের কাঠামো কুঞ্চিত দেহচর্মে ঢাকা; বক্ষপঞ্জর প্রকট হয়ে পড়েছে, মোটা মোটা হাত—তেমনি দুখানি পা, সামনে দেখবেন প্রকাণ্ড আকারের অতিজীর্ণ একজোড়া জুতা, পরনে ময়লা থান-ধুতি—তাও সেলাই করা; শোভা শুধু শুভ্র গজদন্তের মতো পাকা দাড়ি-গোঁফ; মাথার চুলও সাদা কিন্তু খাটো করে ছাটা।'

'আরোগ্য-নিকেতন-এর' প্রথম দশ পৃষ্ঠার মধ্যে জীবন মশায়ের এই রূপ-বর্ণনার ধারাতেই তারাশঙ্করের শিল্প-সামর্থ্যের সুনিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশের জীর্ণতা এবং অবসাদ,—সেই সঙ্গে নিজের শরীরেও জরার অভিব্যক্তি,—সেই অপরাহ্ন-বেদনার মধ্যেই জীবন মশায়ের চোখের সামনে অজস্র লালফুলে-সমৃদ্ধ আশ্চর্য দুটি রক্তকরবীর সতেজ সমারোহ জাগিয়ে রেখেছেন তারাশঙ্কর! তাতে তিনি একরকম সংকেত-প্রয়োগের,—একরকম প্রতীক-চেতনারই পরিচয় দিয়েছেন!

এদিকে হাটকুড়ো জেলের পোষা শালিখটা তখন কাছেই কোনো একটা গাছে বসে মানুষের শেখানো বুলি বলতে থাকে। জীবন মশায় ভাবেন—মানুষের চেয়ে গাছের আয়ু কত বেশি! ষাট বছর আগে তাঁর বাবা যে রক্তকরবীর কলম লাগিয়েছিলেন, সে গাছ এতোকাল পরেও সমান উজ্জ্বল হয়ে আছে! মনে পড়ে, জন্মান্তর সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস বদলে গেছে একালে! সেই ভাবনার স্রোতে ভাসতে-ভাসতে, অন্য কালের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। এমন সময়ে, পথের প্রান্তে বৃদ্ধ সেতাবের সাদা-ছাউনি দেওয়া ছাতা দেখা যায়।

মানুষের রক্তস্রোতে কালের পদধ্বনি অনুভব করতে পারেন জীবন মশায়! ঐতিহ্যসূত্রে, বংশ-পরম্পরাক্রমে এ-অনুভূতি তাঁরা পেয়ে আসছেন। নিদান হাঁকায় জীবন মশায়ের নাম আছে। নাড়ী দেখে, অভ্রান্ত ভাবে রোগীর মৃত্যুকাল ঘোষণা করতে পারেন তিনি! নিজের ছেলের হাত দেখেও মৃত্যুর তিন মাস আগে থেকেই তিনি তার মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। ছেলে ছিল ডাক্তার। নিজের স্ত্রীকে তিনি সে-অমঙ্গলের কথা তো বলেইছিলেন,—ডাক্তার-ছেলেটিকেও আকারে ইঙ্গিতে সে-কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন!

কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে বাজশ্রবার পুত্র ঋষি বিশ্বজিৎ-এর যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। সেই বিশ্বজিতের পুত্র নচিকেতা। নচিকেতা সজ্ঞানে যমালয়ে গিয়েছিলেন.। যম-নচিকেতা-সংলাপে, তাই দেখা যায় মৃত্যুতত্ত্বের আলোচনা। নচিকেতার আগ্রহে তুষ্ট হয়ে যম বলেছিলেন ওঁকারের-কথা।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণে।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

অর্থাৎ ব্রহ্মের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এ আত্মা কারণান্তর থেকে আবির্ভূত হননি। আবার এ-আত্মা থেকেই কিছু যে উৎপন্ন হয়েছে, তাও নয়। ইনি জন্মরহিত,—ইনি নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ! শরীর নিহত হলেও এঁর নাশ ঘটে না।

বৃহদারণ্যকে, শ্বেতাশ্বতরে—এবং আরো কোনো কোনো উপনিষদে মৃত্যুর আলোচনা প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনায় মৃত্যুর কথা কতো যে ছড়িয়ে আছে। অনেক দিন আগে—'কণিকা'র মাত্র দুছত্রের 'জীবন' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।

তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতনে' ভারতবর্ষের সেই সুপ্রাচীন মৃত্যু-ধারণার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যা দু'লাইনে বলে গেছেন, তিনি সেই কথাই বলেছেন অনেকটা জায়গা জুড়ে।

•

'আরোগ্য নিকেতন'-এর শিল্প-কর্মের দিকটাও তুচ্ছ নয়। প্রথমতঃ বিশেষ বিশেষ স্থানের এবং কোনো কোনো পাত্র-পাত্রীর রূপ বর্ণনার কথা মনে পড়ে। আদিতেই রক্তকরবী-প্রতীক ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। একটি পোষা শালিখ পাখির ডাক,—দেবীপুর গ্রামে বিকেলের আলোয় বসে-থাকা শাদা দাড়ি-গোঁফে শোভমান জীবনমশায়ের মূর্তি,—কিংবা নিদান হেঁকে, নিজের ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হতে দেখে তিনি যে—'শোকবিহ্বল পরিবারটির মধ্যে অচঞ্চল হয়ে বসে থাকতেন—গুমোটে ভরা বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্ম-অপরাহ্নের স্থির বনস্পতির মতো'—এই সব বর্ণনার মধ্যেই তাঁর শিল্প-রুচির স্বাক্ষর আছে। এবং

এগারো পৃষ্ঠার এই 'সূচনা' অংশেই 'আরোগ্য নিকেতন'-এর জগৎ-প্রকৃতির মূল কথাটা তিনি তাঁর পাঠকদের মনে সঞ্চারিত হতে দিতে পেরেছেন।

উনিশ শ' পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ তের শ' ছাপ্পান্ন সালের এক শ্রাবণ অপরাহ্ণের ঘটনা থেকেই এ-কাহিনী শুরু হয়েছে। গোষ্ঠ কর্মকারের ছেলে মতি এসে জীবন মশায়কে প্রণাম করে। মতির মা'কে একবার দেখতে যেতে হবে মশায়কে। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অনেকগুলি ওষুধ জানা ছিল গোষ্ঠর। রঘুবর ভারতী ছিলেন বড় দরের যোগী। গোষ্ঠ তাঁর কাছ থেকেই ওষুধগুলি পেয়েছিল। জীবন মশায়ের সম্বন্ধে গোষ্ঠর যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ ছিল,—জীবন মশায় তা ভোলেন নি। সেই শ্রদ্ধার ঋণ মনে রেখেই মতির মাকে দেখে আসেন তিনি। মতিকে বলেন—'মায়ের যা খেতে ইচ্ছে, খেতে দিবি, বুঝলি?' অর্থাৎ তার ব্যাধি দুরারোগ্য!

প্রথম পরিচ্ছেদে এইটুকুই খবর। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর দাবা-খেলার সঙ্গী সেতাব মুখুজ্যের নাড়ী দেখে পদব্রজে তিনি যখন বাড়ি ফিরছেন,—তাঁর সেই ফেরবার পথেই নতুন 'হেল্‌থ্‌ সেণ্টার' দেখানো হয়েছে। জীবন মশায়ের মনে পড়ে—উনিশ শ' দুই কিংবা তিন সালে গ্রামে প্রথম দাতব্য-চিকিৎসালয়টি গড়ে উঠেছিল। এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই হাসপাতালের নতুন পাশ-করা ডাক্তার প্রদ্যোৎ বোসকে দেখা গেছে। এবং এই তরুণের সঙ্গে প্রাচীন জীবন মশায়ের আদর্শের বিরোধ দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে।

'আরোগ্য-নিকেতন'-এর ছত্রে-ছত্রে সেই আদর্শের দিকটি ধ্বনিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর কুল-পরিচয়ের প্রসঙ্গেও সে-কথা ধীরে ধীরে' —সুকৌশলে উচ্চারিত হয়েছে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—'পুত্র জগদ্বন্ধু দত্ত ছিলেন (দীনবন্ধুর) উপযুক্ত সন্তান। তিনি পিতার কাছে সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। মৃত্যুকালে দীনবন্ধু মশায় ছেলেকে বলেছিলেন—'বিষয় কিছু পারিনি করতে, কিন্তু আশয় দিয়ে গেলাম মহৎ। মহদাশয়ত্বকে রক্ষা কোরো। ওতেই ইহলোক পরলোক—দুইই সার্থক হবে।' জগদ্বন্ধু মশায় সে মহদাশয়ত্ব রক্ষা করেছিলেন। লোকে তাঁকে 'জগৎ মশায়' বলতো।

নবগ্রাম থেকে দেবীপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরি হয় অনেক পরে। সেকালে এ-রাস্তায় হাঁটতে কষ্ট হোতো। জগৎ মশায় কবিরাজ ছিলেন, জীবন মশায় হলেন ডাক্তার। তারপর—সময় বদলে গেছে।

জীবন মশায় লোককে ডেকে বলেন—'একালে অনেক ভালো চিকিৎসা উঠেছে, হাসপাতাল হয়েছে, নতুন ডাক্তার এসেছে, তোমরা সেইখানে যাও' কিন্তু তাঁর ওপর বিশ্বাস যাদের, তারা যেতে চায় না। যারা পয়সা খরচ করতে অসমর্থ, তারাও পড়ে থাকে তাঁরই ভরসায়। মকবুলও যায় না, কামদেবপুরের দাঁতু ঘোষালও তাঁকে ছেড়ে যেতে চায় না।

'আরোগ্য-নিকেতন'-এ এদেশের প্রাচীন চিকিৎসকদের এই মহদাশয়ত্বের কথাই বিশদভাবে বলা হয়েছে। সেকালের সঙ্গে একালের বিরোধের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ডাক্তারি-প্রসঙ্গের পটভূমিকায়। আনুষঙ্গিক কথা হিসেবে, কামদেবপুরের দাঁতু ঘোষালের রূপায়ণে লোভাতুর মানুষের অসংযমের ছবিও পাওয়া যায়। তারই মধ্যে তারাশঙ্করের স্বভাবসিদ্ধ উপমা-কৌশলের সিঞ্চন লক্ষ্য করা যায়, যেমন—পুরোনো কালের লোক অমরকুঁড়ির পরান খাঁর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'মাথার চুল শাদা হয়েছে, চোখের চাউনির মধ্যে বাপ-চাচার চাউনি ফুটে ওঠে, গোটা মানুষটাই শীতকালের গঙ্গানদীর জলের মতো পরিষ্কার।'

জীবন মশায়ের পিতা জগদ্বন্ধু জমিদারি কিনেছিলেন—'জমিদারদের দম্ভের উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্যে।' জীবন মশায়ের জীবনে, তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা-চর্চাতেও সেই আদর্শ এসে মিশেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে জীবন মশায়ের 'ক্ষমাহীনা' স্ত্রী আতর-বউয়ের কথা আছে—সেইসঙ্গে নবগ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার শশী মুখুজ্যেরও। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তারাশঙ্করের উপন্যাসের আর-এক লক্ষণ—এ-বইয়ের রাজনৈতিক কর্মী-চরিত্র কিশোরবাবু দেখা দিয়েছেন। নবগ্রামের তিনজন পাশ-করা ডাক্তারের মধ্যে প্রদ্যোতের কথা আগেই বলা হয়েছে। আর আছেন নবগ্রামেরই সন্তান হরেন ডাক্তার,—আর, প্রৌঢ় চারুবাবু।

সন্দীপন-পাঠশালার ধীরাবাবু যেমন দেশকর্মী, 'আরোগ্য নিকেতন'-এর এই কিশোরও সেইরকম। তারাশঙ্করের অনেক লেখাতেই এই 'টাইপ'টি চোখে পড়ে। 'ধাত্রীদেবতা'র সুশীল-পূর্ণ এরই রকমরের বটে,—তবে, তারা পুরোপুরি ঠিক এ-'টাইপ' নয়! তারা সন্ত্রাসবাদী, এরা গান্ধীবাদী!

শশী কম্পাউণ্ডার এ-বইয়ের আর-এক স্মরণীয় চরিত্র। জীবন মশায়ের নিজের হাতে তৈরী শিষ্য সে! তার কম্পাউণ্ডারি, দাবা-খেলা, সংকীর্তন,—

তার মদ-তামাকের নেশা,—সরলতা এবং গম্ভীরতা—সব মিলিয়ে এই রোগ-আরোগ্য-মৃত্যুতত্ত্ব-গম্ভীর 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর সে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র!

মতির মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে জীবন মশায়ের সঙ্গে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের মতান্তর শুরু হয় বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। বাইরের সেই সংঘর্ষই জীবন মশায়ের ভেতরকার দ্বন্দ্ব হ'য়ে ওঠে। সে যেন এক-কালের সঙ্গে অন্য কালের বিরোধ,—এক দৃষ্টির সঙ্গে অন্য দৃষ্টির,—নিজের আদর্শের সঙ্গে নিজেরই অভিজ্ঞতার! পুরোনো ডাক্তারদের মধ্যে চারুবাবুই প্রবীণতম। তিনি নিজে,—তা'ছাড়া চক্রধারী, হরেন ডাক্তার,—এঁরাও জীবন মশায়ের গুণগ্রাহী—কিন্তু প্রদ্যোৎ আর অন্যান্য তরুণ ডাক্তারের চোখে তিনি বড়োই সেকেলে,—তাঁরা জানেন যে, জীবন মশায়ের যুগ সত্যিই অতিক্রান্ত!

এককালে, রঙলাল ডাক্তারই ছিলেন জীবন মশায়ের আদর্শ। মুর্শিদাবাদের সন্নিহিত কাঁদীতে এণ্ট্রান্স পড়তে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে এক দরিদ্র কায়স্থ শিক্ষক-কন্যার প্রেমে পড়ে। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাঁর সেই নব যৌবনের প্রণয়িনী মঞ্জরী-মেয়েটির কথা বলা হয়েছে বিশদ ভাবে।

মঞ্জরীর ভাই বঙ্কিম ছিল জীবনের সহপাঠী। কিন্তু মঞ্জরীকে নিয়ে 'গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি' ভূপী বোসের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। জীবন দত্ত প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভূপী বোসকে জখম করে, কাঁদী পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে। সেই সঙ্গে তাঁর মেডিক্যাল কলেজে পড়বার স্বপ্নও শেষ হয়। এ-উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে সেই দুর্ঘটনার বর্ণনা আছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে জীবনের কৌলিক বিদ্যা আয়ুর্বেদ পাঠ শুরু হয়। ভাগবত-কথকের মতন দক্ষ কথক ছিলেন জগদ্বন্ধু মশায়। ছেলেকে পাঠ দিতে গিয়ে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে কথকতা করেছিলেন তিনি। অষ্টম পরিচ্ছেদের সেই কথকতার মধ্যেই শোনা যায়: মহাভারতে আছে, ভগবান প্রজাপতির সানন্দ সৃষ্টিকর্মের কথা। সেই সৃষ্টিতেই দেখা দিয়েছে জরা! প্রজাপতি ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। তাঁর ধ্যাননেত্রে তিনি দেখলেন তাঁরই সামনে উপস্থিত তাঁর কন্যা মৃত্যুকে! — 'পিঙ্গলকেশা পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা; গলদেশে ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায়।' সেই মৃত্যুকে পাপ স্পর্শ করেনা, পুণ্যও না,—মানুষের কর্মফলই নানা রোগের মাধ্যমে মৃত্যুকে আহ্বান করে। মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু

বধির। কোনো বিলাপের দৃশ্য তাকে দেখতে হয় না, কোনো আর্তনাদ তাকে শুনতে হয় না।

জগদ্বন্ধু মশায় সেদিন ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন—'মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু বধির। রোগই তার সন্তানের মতো নিয়ত তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে নিয়ম—কাল। যার কাল পূর্ণ হয়, তাকে যেতে হয়। অকালমৃত্যুও আছে। নিজের পাপে মানুষ নিজের আয়ুক্ষয় করে কালকে অকালে আহ্বান করে। আমাদের যে পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদ—তার শক্তি হোলো, কাল যেখানে সহায়ক নয় রোগের, সেখানে রোগকে প্রতিহত করা।'

জীবন ডাক্তারের পিতা সেই জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন: 'মৃত্যু সেই আনন্দস্বরূপেরই ছায়া—পরমানন্দ মাধব'!

জীবন মশায়ের নিজের জীবনে মৃত্যু সম্বন্ধে সেই পরমানন্দ মাধবের ধারণাই অটুট হয়ে আছে। রঙলাল ডাক্তার ছিলেন রূঢ়ভাষী মানুষ। জীবন মশায়কে তিনিই বলেছিলেন, 'টাকা চাওয়াটা অপরাধ নয়। কারও কাছে ভিক্ষা কোরো না, কাউকে ঠকিও না, কারও চুরি কোরো না, কাউকে সর্বস্বান্ত করে নিও না, কিন্তু তুমি যার জন্যে খাটবে তার মজুরি—ফীজ,—এ নিতে সংকোচ কোরো না।'

জীবন মশায়ের স্ত্রী আতর-বউ চরিত্রটি—এখানকার এই তত্ত্বের চাপেও—মোটেই ভোলবার নয়। শৈশবেই বাপ-মা হারিয়ে মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তিনি বেশ মুখরা এবং অসাধারণ তাঁর জীবনীশক্তি!

এইসব বিচিত্র চরিত্র আর বিভিন্ন ঘটনা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর রোগতত্ত্ব, মৃত্যুতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্বের কথা এগিয়েছে। এখানকার রচনাগুণও স্মরণীয়। দু' একটি নমুনা দেখা যেতে পারে। যেমন—রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গে একটি রোগিণীকে দেখতে গেছেন জীবন মশায়—

> 'রোগিনীর হাতখানি বিছানার উপরে যেমন ভাবে ছিল—তেমনি ভাবেই রইল; জীবন দত্ত শুধু মণিবন্ধের উপর আঙুলের স্পর্শ স্থাপন করলেন। চোখ বন্ধ করে পারিপার্শ্বিকের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। প্রায় রিক্ত-পত্র অশ্বত্থ গাছের একটি সরু ডালে একটি মাত্র পাতা, অতি ক্ষীণ বাতাসের প্রবাহে দৃষ্টির অগোচর কম্পনে কাঁপছে; সেই অনুভব করতে হবে। অথচ অসতর্ক

রূঢ় স্পর্শ হলেই পাতাটি ভেঙে ঝরে যাবে। অতি সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করে তিনি বসলেন। ধ্যানস্থ হওয়ার মতো।'

সাঁইত্রিশের পরিচ্ছেদে কিশোরের কথা স্মরণ করেছেন তিনি। কিশোর বলেছিল :

'নারী আর প্রকৃতি ও দুই সত্যই এক। দু'দিন পরেই বুকে পা দিয়ে দলে আপনার পথে চলে যায়। কখনও নিজের মুণ্ডু কেটে নিজেই রক্তস্নান করে। তখন নিজে স্বামীকে গ্রাস করে ধূমাবতী সাজে, কখনও আবার নিজের বাপের মুখে স্বামী-নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে।'

অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রের পরিসমাপ্তিতে—সেই সাঁইত্রিশের পরিচ্ছেদেই, বৃদ্ধা মঞ্জরীর রোগশয্যায়, –তারই নাড়ী দেখে জীবন মশায় বেরিয়ে এসেছেন। তখন—

'মশায়ের মনের মধ্যে ঘুরছিল সেই পিঙ্গলবর্ণা কন্যার কথা, পিঙ্গলবর্ণা পিঙ্গলকেশিনী, পিঙ্গলচক্ষু কন্যা—কৌষেয়কামিনী, সর্বাঙ্গে পদ্মবীজের ভূষণ, অন্ধ বধির। অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো, শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মতো, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মতো; সঙ্গীতের সঙ্গে সমাপ্তির মতো; গতির সঙ্গে পতনের মতো; চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মতো। মৃত্যুদূত তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়, অন্ধবধির কন্যা, অমৃতস্পর্শ বুলিয়ে দেন তার সর্বাঙ্গে। অনন্ত অতলান্ত শান্তিতে জীবন জুড়িয়ে যায়। তেমনি করে জুড়িয়ে যায় যেন মঞ্জরী। মৃত্যুদূত সে যেন আসে ভূপীর রূপ ধরে।'

'পরমানন্দ মাধব, তোমার মাধুরীতে সৃষ্টিতে কুড়ানো মধু, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত।'

তারাশঙ্করের স্বভাবসুলভ অলঙ্কার-বিলাস আর আবেগ-সমৃদ্ধি এসে যোগ দিয়েছে এইসব অংশে। বহুকাল আগে, লাভপুরে নির্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে সেকালের যে চিত্তাকর্ষক নাট্যভঙ্গি তাঁর মনোহরণ করেছিল, তাঁর লেখায় তাঁর অগোচরেই সেই ভঙ্গি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে থাকে! পরমানন্দ মাধবের রূপ দেখতে দেখতে জীবন মশায় তাই—

'নিজের হাতখানা ধরলেন, রক্তস্রোত আজ দ্রুত চলছে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়েছে। দেহের লোমকূপের মুখগুলি স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল এমন উত্তেজনা তিনি অনুভব করেন নি। তিনি কী—তাঁর কী?

কিন্তু তাঁর মৃত্যুদূত কোন্‌রূপে আসবে? মঞ্জরী নয়। মঞ্জরী জীবনে ভ্রান্তি। মিথ্যা। আতর বউএর রূপে? তাঁর বাবা জগৎমশায়ের রূপ ধরে? শুক্ল রঙলালের মূর্তিতে? অথবা নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে সে থাকবে—তাকে দেখা যাবে না? সে বনবিহারী?'

অতঃপর একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে নিজের রোগশয্যায় নিজের নাড়ী দেখে জীবন মশায় বলেছেন, 'মনে হচ্ছে, গ্রামের বাইরে—গ্রামে ঢুকবার মুখে সে পদার্পণ করেছে। গ্রামে ঢুকছে।'

আর, এই শেষ পরিচ্ছেদেই মৃত্যুকে জয় করবার কথাও পুনরায় বলা হয়েছে:

'অভয়া অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ার উপর তাঁর প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল। সারাটা দিন নিরম্বু উপবাসিনী', কুশাগ্রে জল পর্যন্ত খায়নি। কালও অর্ধ উপবাস; নিজের ঘরের গাছের ফল আর মধু খেয়ে থাকবে। আগামী জন্মে পাবে অবৈধব্য ফল। যতদিন সে জীবিত থাকবে ততদিন মৃত্যু ওর স্বামীর সান্নিধ্যে আসতে পারবে না। সাক্ষাৎ মৃত্যুবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও মৃত্যুকে ফিরে যেতে হবে অভয়ার এ-জন্মের এই ব্রতচারণের পুণ্যফলের প্রভাবে। সাবিত্রী করেছিলেন এই ব্রত। সত্যবানের প্রাণ গ্রহণ করে মৃত্যুর অধিপতি চলেছিলেন মৃত্যুপুরীর দিকে। অপার্থিব পথ—পার্থিব রহস্যলোক সেখানে। পার্থিব দৃষ্টি সেখানে অন্ধ। কিন্তু এই ব্রতপালনের পুণ্যে সাবিত্রী মৃত্যুপতিকে অনুসরণ করেছিলেন; এই পুণ্যবলে মৃত্যুপতিকে পরাভূত করে ফিরিয়ে এনেছিলেন স্বামীর জীবন। সাবিত্রীর কাহিনী সত্য কি মিথ্যা, এই ব্রত করে আজও এমন ভাগ্য হয়েছে কি হয় নি—এ বিচার কেউ করেনি; আবহমান কাল গভীর বিশ্বাসে এই ব্রত করে এসেছে এদেশের মেয়েরা। অভয়ার উপবাসশীর্ণ মুখে সেই বিশ্বাসের গাঢ়তম ছাপ দেখেছিলেন। তাঁকে দেখে অভয়ার মুখে শুক্লা প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মতো একটি বিশীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। তা দেখে মশায়ের মন থেকে ক্রোধের অস্বস্তির রেশ নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, আশ্বিনের পূর্ণিমার নির্মেঘ আকাশের মতন তাঁর সারা মনটা ঝলমল করে উঠেছিল। মনে মনে বলেছিলেন—'চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি মৃত্যু পাপের বিচার করে না, পুণ্যের করে না; সে আসে ক্ষয়ের পথে, ক্ষয় যেখানে প্রবল সেখানে সে অপরাজেয়, সে ধ্রুব! তবু আজ আমি

বারবার আশীর্বাদ করছি, এ সত্য হোক, পরজন্মে তোমার স্বামীর জীবনে ক্ষয় প্রবল হলেও যেন তোমার পুণ্যবলের কাছে মৃত্যু হার মানে।'

পৌষলক্ষ্মী ও অন্যান্য গল্প, বিচারক

'আরোগ্য-নিকেতন' কাহিনীতে যেমন মৃত্যুতত্ত্বের কথা আছে, তাঁর 'বিচারকে' তেমনি বিচার-তত্ত্বের কথা! তারাশঙ্করের ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তত্ত্বের দিকে তাঁর নজর লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু সেখানে পাত্র বা বাহনের আয়তন ছোটো বলেই বোধ হয়, তত্ত্ব সেখানে গল্প-কে আচ্ছন্ন করতে পারে না। তাঁর 'জলসাঘর', 'মধু মাষ্টার' 'তারিণী মাঝি', 'অগ্রদানী' 'তমসা' প্রভৃতি গল্প সর্বস্বীকৃত আবেদনের বিষয়। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব, ব্যক্তিতত্ত্ব, পরিবারতত্ত্বের দিকে তাঁর নজর কিছু যেন বেশিই পড়েছে!

তাঁর সব গল্প সমান সার্থক নয়, সে-কথা ঠিকই। কোন্ লেখকেরই বা তা হয়? কিন্তু তবু,—গল্পেই তাঁর বেশি সার্থকতা,—উপন্যাসে তিনি মন্থর, ফেনময়, ঘোষণাব্রতী,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবোচ্ছ্বাসবহুল এবং আকর্ষণহীন!

গল্পে আর উপন্যাসে—তত্ত্বকথা আর আঙ্গিকের আবেদনগত প্রভেদ সম্বন্ধে কথা ওঠা স্বাভাবিক। তাঁর 'পৌষলক্ষ্মী' (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) গল্প-সংগ্রহের কথাই ধরা যাক। গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষে এ-বইখানি তাঁরই নামে উৎসর্গ করা হয়। 'পৌষলক্ষ্মী', 'ইস্কাপন', 'শেষকথা', 'বোবাকান্না' ইত্যাদি গল্পে তারাশঙ্কর তাঁর চিরাভ্যস্ত রীতি-নীতিই ব্যক্ত করেছেন। এ-বইয়ের নাম-গল্পটির শুরুতেই তের শ' পঞ্চাশ সালের পৌষ মাসে পালপাড়ার কালী-ঘরের সামনে অশোকতলার আড্ডায় কথা বলা হয়েছে। মুকুন্দ পাল সে আড্ডার প্রাচীনতম ব্যক্তি। তার বয়স প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর। পূবদিকে নদীর ধার পর্যন্ত গাঁয়ের মাঠ,—মাঠের প্রথমে ষাঁড়াজোল, তারপর মাঝের জোল, তারপর বেনো কূল। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ধান-ক্ষেত। গাঁয়ের বাগ্দি, কাহার, মুচি প্রভৃতি দিন-মজুরের দল সারা-বছর চাষের কাজে থাকে

না,—ফসল কম ফললে তারা দল বেঁধে চলে যায়। ধান কাটার সময় তারা ধান কাটতে ফিরে আসে।

সে-বছর গ্রামের নদীতে যেমন বানও এসেছিল, তেমনি ধানও ফলেছিল। মুকুন্দ পালের কৃষাণের জ্বর হয়েছিল বলে মুকুন্দ সে-দিন নিজেই ধান কাটতে নেমেছিল, কিন্তু তার দুর্বল শরীরে তখন বড়ই অবসাদ। হাতে তার কাস্তে চলছিল না কিছুতেই। নিজের এই দুর্বলতার ফলে বড়ই নৈরাশ্য নেমে এসেছিল তার মনে। ছেলেবেলায় সঙ্গীরা,—এবং যৌবনে মুরুব্বিরা তার নাম দিয়েছিল 'ভীম'। প্রৌঢ় বয়সে লোকে তাকে 'মোটা মোড়ল' বলে ডাকতো। কিন্তু তার রোগজীর্ণ অবস্থায়—'শ্রীকৃষ্ণ' অর্থাৎ 'চেকা'—সম্পর্কে মোড়লের নাতি সে,—সেই কিনা তাকে ঠাট্টা করে যায়! বার্ধক্যের যন্ত্রণায়,—চেকার বিদ্রূপের আঘাতে, নিজের অতীতের কথা ভাবতে বসে যায় মুকুন্দ। মাত্র আট বছর আগেই চেকাকে সে লড়াইয়ের আখড়ায় হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে স্বাস্থ্য আজ আর নেই। সেকালের সমবয়সী বন্ধু যোগেন্দ্র ঘোষকে তাই মোড়ল বলে—'যগন্দ, একি হোলো ভাই যগন্দ।' তখন—'যগন্দ বলে লা এসে ঘাটে লেগেছে। আর দেরি নাই।' যগন্দ-র গলা কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও 'চোয়ালের নিচে সমস্ত মাংসটা থর থর করে কাঁপতে লাগল।'

শীতে কাতর হয়েছিল মুকুন্দ। রোদ উঠতেই গায়ের র‍্যাপার খুলে-ফেলে, সে ধান কাটতে আরম্ভ করে দেয়।

উনত্রিশ বছর বয়সে মুকুন্দর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। তারপর সে পাশের চণ্ডীপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-বাড়ির একটি বিধবা তরুণী ঝিকে বৈরাগীদের আখড়ায় নিয়ে এসে, তাকে কণ্ঠি পরিয়ে বৈষ্ণবী করিয়ে আনে। তিরিশ বছর আগে মুকুন্দর যখন পূর্ণ যৌবন, তখন সে মাঠে কাজ করতো,—আর সেই মেয়েটি তার জলখাবার নিয়ে আসতো। তেরশ বিশ সালে—সেবারও গ্রামে যেমন বান, তেমনিই প্রচুর ধান হয়েছিলো—দুপুরে মাঠে এসে মেয়েটি তাকে বলেছিল—'ওরে বাস রে। এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে।' তাই শুনে মুকুন্দ ছড়া কেটেছিল :

সিঁদুর-মুখী ধানে ধানে
ভরিবে গোলা

আমার সোনামুখীর হবে
সোনার কাঠির মালা।

আজ এতদিন পরে মুকুন্দর মেয়ের মেয়ে—অর্থাৎ তার নাতনী এসে ঠিক সেই কথা বলতেই,—ক্ষেতে কাজ করতে-করতে মুকুন্দ সেই পুরোনো ছড়া দিয়েই তার জবাব দেয়! কিন্তু তার পরেই কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে হঠাৎ সে সচেতন হয়ে ওঠে,—তাকে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ এইখানেই শেষ হয়েছে।

এই 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মুকুন্দ মোড়লের দেহে-মনে জরার আক্রমণ ব্যাপারটিকে এখানে তিনি তার অন্তরের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয় করে তুলেছেন।

গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মুকুন্দ তার পুরোনো আমলের হেলে-বলদ 'কেলে'র জন্যে সমবেদনা বোধ করেছে। 'কেলে'ও বুড়ো হয়ে গেছে, মুকুন্দও তার যৌবন হারিয়ে ফেলেছে! সময়ের বিরুদ্ধে,—পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পরিবর্তনের বিরুদ্ধে মুকুন্দ তার শরীরের যৌবন-সামর্থ্যকে এক অপরিবর্তন উপভোগের বিষয় বলে মনে রাখতে চায়! এই প্রৌঢ় বয়সে সে তার নিজের যৌবনকালের হাসি হেসে ওঠে! সে-হাসি শুনে তার নাতনী সরস্বতী বলে,—'কর্তা হয়তো আর বাঁচবেনা, নয়তো কর্তার মাথা খারাপ হয়েছে।' আড়াল থেকে তার মেয়ে লক্ষ্মী দেখতে পায় যে, তার বাপ মুকুন্দ কুস্তিগীরের মতন কাপড় এঁটে, রীতিমতো বৈঠক করছে! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মুকুন্দর এই দুর্দশাই উজ্জ্বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মুকুন্দ, আর তার বন্ধু যগন্দকে 'গৃহজাত'—অর্থাৎ দেশী মদ খেতে দেখা যায়। নিজেদের লুপ্ত স্বাস্থ্য আর বিস্মৃতপ্রায় শক্তির কথা বলতে থাকে তারা! তারা একথাও বলে যে, তেরশ পঞ্চাশ সাল থেকে 'চেকা'র ভিরকুটি বেড়েছে আর, অচিরেই তা ভাঙবে। স্বাস্থ্যবান যুবক চেকার সম্বন্ধে এই ঈর্ষাবোধই তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রধান কথা।

তারপর গল্পের চতুর্থ—এবং শেষ পরিচ্ছেদ। ক্ষেতে ধান কাটতে-কাটতে মুকুন্দ শোনে যে, গ্রামের কে একজন প্রবীণ মানুষ নাকি হঠাৎ মারা গেছেন। সেই খবর শুনে মুহূর্তকালের জন্যে বিচলিত হয় সে। তারপর আবার কাটা ধান গাড়িতে বোঝাই চলতে থাকে। অবশেষে ধানে বোঝাই গাড়িতে

উঠে, গাড়ি হাঁকিয়ে দেয় মুকুন্দ। ইতিমধ্যে কী যেন ঘটে যায়, কী যেন হয়ে যায়!

'চারিদিক কেমন হয়ে আসছে। চাঁদনী রাতে বকের পালকের মতো রঙের মলমলে ঢাকা মা বসুমতী—। এ কি! তার এ কি হল? সরস্বতী, তার মেয়ে লক্ষ্মী, মাঠ-ভরা ধান, এ ফেলে—। সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে পড়ে যাবে সে। গাড়ি চলছিল! পালের দুই হাতের মুঠার মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠা-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বার কতক পা দুটো ছুঁড়লে—নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধুলার উপর। এক মুঠা ধুলা কাপড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধানে ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পর মুহূর্তে।'

এই গল্পের মোট অধ্যায়-বিভাগ এই চারটিই,—এবং আঙ্গিকের দিক থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে মুকুন্দর মৃত্যুবর্ণনায় এই গদ্যরীতির প্রয়োগ স্মরণীয়, সন্দেহ নেই। এখানে জীবন-যৌবনের একরকম তত্ত্বকথাও আছে,—গল্প-রচনার বিশেষ এক আঙ্গিক-সিদ্ধিও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব বা আঙ্গিক—দুয়ের কোনোটাই এখানে দুর্বহ ভার হয়ে ওঠেনি। এদিকে, তাঁর উপন্যাসে কিন্তু তত্ত্ব প্রায়ই ভার হয়ে ওঠে। আর সে-ক্ষেত্রে আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর কোনো খেয়ালই থাকে না বোধ হয়!

'বিচারক' (প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৬৩) উপন্যাসের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই সে-কাহিনীর নায়ক জ্ঞানেন্দ্রনাথকে অশোকস্তম্ভ-খচিত প্রতীকের নিচে বিচারকের আসনে স্তব্ধভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। বয়স তাঁর ষাটের নিচেই,—গৌরবর্ণ, সুপুরুষ তিনি,—সবল, কর্মঠ দেহ, কিন্তু তাঁর মাথার চুলগুলি সবই শাদা হয়ে গেছে। নাকের দু'পাশে,—আর, তাঁর কপালেতেও সারি সারি দুশ্চিন্তার রেখা।

নিজের কাজের গুণেই মুনসেফ থেকে ধীরে ধীরে জজ হয়েছেন তিনি। রায় লিখতে বেশ একটু দেরি হয় তাঁর। তাঁর প্রতিটি রায় গভীর চিন্তার

ফল। বিচারে তিনি ক্ষমাহীন। আপীলেও তাঁর বিচারের কোনো রদবদল ঘটতে দেখা যায় না!

এক-একটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই 'ক', 'খ' ইত্যাদি বিভাগ রক্ষা করে, এ-কাহিনী এগিয়ে গেছে। প্রথম পরিচ্ছেদের 'খ'-বিভাগে পৌঁছেই দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বদলি হয়ে এসেছেন অপেক্ষাকৃত শান্ত, ছোটো একটি জেলাতে। স্ত্রী আর বই,—এই দুটি মাত্র আকর্ষণেই তিনি মগ্ন! তাঁর ম্যাট্রিক-ফেল আর্দালিটি বলে—রাত বারোটা তো সাহেবের রাত নটা।—'বারোটা পর্যন্ত রোজ কাজ করেন। নটায় আর্দালীর ছুটি হয়। মেম সাহেব টেবিলের সামনে বসে থাকেন; সাহেব নথি ওলটান, ভাবেন, আর লেখেন। আশ্চর্য মানুষ, সিগারেট না, মদ না, কফি না; চা দুকাপ দুবেলা—বড় জোর আর এক-আধ বার। চুপচাপ লিখে যান। মধ্যে মধ্যে কাগজ ওলটানোর খসখস শব্দ ওঠে। কখনও হঠাৎ কথা—একটা কি দুটো কথা, বইখানা দাও তো। বলেন মেম-সাহেবকে। আউট হাউস থেকে আর্দালী বয়েরা—দেখতে পায়, শুনতে পায়। এক-একদিন আরো বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তিনি। রাত্রে কোনো কাজে কোনো খানসামাকে ডাকাও পছন্দ করেন না তিনি। ইজিচেয়ারখানা বের করতে হলেও নিজে উঠে বের করে নিয়ে থাকেন,—স্ত্রীকে বলেন—আমি নিজেই নিচ্ছি। ওরা সারাদিন খেটে ঘুমোচ্ছে। ডেকো না। সারাদিন খেটে রাত্রে না ঘুমোলে ওরা পারবে কেন? মানুষ তো!'

স্ত্রী সুরমাও জজের মেয়ে। জ্ঞানেন্দ্রনাথকে তিনি বলতেন—'মুনসেফ থেকে তো জজ হয়েছ। ছেলে নেই, পুলে নেই। আর কেন? আর কী হবে? হাইকোর্টের জজ, না সুপ্রীম কোর্টের জজ? ওঃ! এখনও আকাঙ্ক্ষা গেল না?' সে-প্রশ্নের জবাবে জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁর অভ্যস্ত হাসি হেসে নিজের নিয়মানুগত্যের সংকল্প শোনাতেন। তারই মধ্যে একদিন সুরমা জিগেস করেছিলেন—'আচ্ছা বলতে পার, সংসারে এমন মানুষ কেউ আছে যার ভুল হয় না?' জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'নেই'। তিনি আরো বলেছিলেন—'তুমি তো সে ভাল করে জান সুরমা। এবং সে-কথাটা তো আমার নয়, আমার গুরুর, তোমার বাবার। দম্ভ নয়, হাইকোর্টে রায় টিঁকবে কি না-টিঁকবে সেও নয়, সে কখনও ভাবি নে। ভাবি আজ নিজে যে রায় দিলাম, সে রায়, দু'মাস কি ছ'মাস কি ছ'বছর পরে ভুল হয়েছে

বলে নিজেই নিজের উপর যেন না স্ট্রিকচার দিই।' এবং একথা বলতেও তিনি সংকোচ বোধ করেন নি যে—'আমি অবিশ্যি ভগবানে বিশ্বাস ঠিক করিনে, সে তুমি জান, তবু...ভগবানগিরির যে-সব বর্ণনা তোমরা কর—ভাল ভাল কেতাবে আছে—সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে বলি, আমার জজিয়তি ভগবানগিরির চেয়েও কঠিন। কারণ, ভগবান সর্বশক্তিমান—তাঁর উপরে মালিক কেউ নেই,—সূক্ষ্ম বিচারক নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও অটোক্র্যাট। অন্ততঃ করুণা করতে তাঁর বাধা নেই। ইচ্ছে করলেই আসামীকে দোষী জেনেও বেকসুর মাফ করে খালাস দিতে পারেন।'

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী সুরমা সম্বন্ধে এইটুকু খবর দিয়েই প্রথম পরিচ্ছেদের 'খ' বিভাগ শেষ হয়েছে। অতঃপর 'গ' বিভাগে পৌছে 'বিচারক'-এর আসল সমস্যা উত্থাপিত হতে দেখা যায়। তারাশঙ্করের শেষ দিকের নানা লেখার মধ্যে এই লেখাটির সংহতিগুণ চোখে পড়বার মতন! 'গ' বিভাগে এবং শুধু সেটুকু ক্ষেত্রেই বা কেন,—বইখানির সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত সতর্ক বিন্যাস-কৌশল চোখে পড়ে। যাট বছরের বুড়ো বাপকে খুন করবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে এসেছিল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলে,—সেও আবার দুই ছেলের বাপ! ছেলে বলাই দাস অবাধ কর্মোদ্যমে এগিয়ে চলে। তার বাপ ছিল ধর্মভীরু বৈষ্ণব। ছেলের কিন্তু অন্য প্রকৃতি। প্রয়োজন-মতন অন্যের জমি আত্মসাৎ করতেও কুণ্ঠা নেই তার। বাপের হিতোপদেশে কান দেয় না বলাই। এদিকে শাশুড়ীতে-পুত্রবধূতেও বিরোধ শুরু হয়ে যায়,—'বৈষ্ণবের সংসারে বধূটি পেঁয়াজ ঢুকিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মাছ ঢুকিয়েছে এবং ছেলে তাকে সমর্থন করেছে।' সেই অবস্থায় ছেলে ঝগড়া ক'রে স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে যায়—বাড়ির পাশেই সে তখন নতুন ঘর তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে, হঠাৎ দুটি ছেলে রেখে বৃদ্ধের পুত্রবধূ মারা গেল। তারপর, ছেলেকে ব্যভিচারী হতে দেখে, তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবার সংকল্প করেছিল বুড়ো বাপ। ছেলে যখন খবর জানতে আসে, তখন বাপ বলেছিল—'এ বাড়ি থেকে তুই বেরিয়ে যা, আমার ধর্ম চঞ্চল হবেন। মৃত্যুর সময়েও আমার মুখে জল তুই দিসনে, মুখাগ্নিও করতে পাবিনে, শ্রাদ্ধও না, ভগবান যদি আজ আমার চোখ দুটি নেন, তবে আমি বাঁচি। তোর মুখ আমাকে আর দেখতে হয় না।'

ঠিক তারই পরের রাত্রে—তখন গ্রীষ্ম ঋতু—দাওয়ার একদিকে শুয়েছিল

বলাই দাসের বাপ,—অন্যদিকে নাতি-দুটিকে নিয়ে বলাইয়ের মা। —'গভীর রাত্রে কুড়ুল দিয়ে বৃদ্ধের মাথাটা কে যেন দুফাঁক করে দিয়ে গেল! একটা চীৎকার শুনে ধড়মড় করে বৃদ্ধা উঠে বসে হত্যাকারীকে ছুটে উঠোন পার হয়ে যেতে দেখে চিনেছিল যে সে তার ছেলে।'

আদালতে বলাই দাসের মা বলেছিল—'নাঃ কাঁদব না হুজুর। ধর্মের মুখ তাকিয়ে সত্যি কথাই আমাকে বলতে হবে হুজুর। আমি মিছে কথা বললে ও হয়তো এখানে খালাস পাবে। কিন্তু পরকালে কী হবে ওর? মরতে একদিন হবেই। আমিই বা কী বলব ওর বাপের কাছে? আমি সত্যিই বলছি। হুজুর বিচার করে খালাস দিলে ভগবান ওকে খালাস দেবেন, সাজা দিলে সেই সাজাতেই ওর পাপের দণ্ড হয়ে যাবে; নরকে ওকে যেতে হবে না।' আসামী পক্ষের উকিল অবিনাশবাবুর জেরাতে বিচলিত হয় নি বৃদ্ধা। জজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ তার সূক্ষ্ম, সুস্থ বিচারবোধের প্রশংসা ক'রে—তার ছেলেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন! নিজের বাড়িতে বসে, স্ত্রী সুরমার কাছে সেই বৃদ্ধার সত্যধর্ম-পালনের কথা তুলে তার প্রশংসাই করেছিলেন তিনি।

প্রথম পরিচ্ছেদের 'খ' বিভাগে আর-একটি মামলার বিবরণ পাওয়া যায় —সুবল ঘোষ একজন চাষী; তার প্রথম পক্ষের ছেলে নগেন দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে খগেনকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতন স্নেহে-সমাদরে লালন করেছে। বাপের মৃত্যুর পরেই ছ'বছরের ছোটো ভাইকে সে বুকে টেনে নিয়েছিল। তারপর,—আসামী নগেন ঘোষ নিজে স্বীকার করেছে যে, নৌকো উল্টে দুই ভাই নগেন আর খগেন নদীতে পড়ে গিয়েছিল। ছোট ভাই খগেন সাঁতার ভাল জানত না, সে বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে। বড় ভাই,—আসামী নগেন তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে আত্মরক্ষার জান্তব প্রবৃত্তির তাড়নাতেই তার গলা টিপে ধরে! এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট ভাইয়ের কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, সে কোনো রকমে নদীর বাঁকের মুখে চড়ায় গিয়ে ওঠে। পরদিন সকালে ছোট ভাইয়ের দেহ পাওয়া যায় ওই চড়ার আরো খানিকটা নিচে। নৌকোতে নদী পার হবার সময়ে এই দুর্যোগ ঘটেছিল। নগেন বলেছে যে, জল থেকে কিনারায়

উঠে সে কিছুক্ষণ সেখানে শুয়েছিল। মাঝরাত্রে তার শরীর সুস্থ হয়। তখন তার মনে হয়েছিল যে, খগেন হয়তো মরে গেছে। সকালে উঠে সে থানায় গিয়ে এজাহার দেয়। —'এর সাজা কী সে তা জানে না। ভগবান জানেন। যা সাজা হয় জজ সাহেব দিন, সে তাই নেবে।'

এই দুটি অপরাধ-কাহিনীতেই এ-কাহিনীর ভূমিকা অংশটুকুর সমাপ্তি। বাইরের এইসব ঘটনা থেকেই জ্ঞানেন্দ্রনাথের অন্তরের আলোড়ন শুরু হয়েছে। এবং এ-কাহিনীর সমস্যা অথবা প্রস্তাব যাই হোক্ না কেন,—এর আসল কথাটির ইশারা আছে সপ্তম পরিচ্ছেদের 'খ' বিভাগে—যেখানে খগেন-নগেনের মামলা সম্বন্ধে পাবলিক প্রসিকিউটার বলেছেন—'আত্মরক্ষা যেমন সহজ প্রবৃত্তি, সাধারণ ধর্ম—তেমনি আত্মত্যাগ, পরার্থে আত্মবিসর্জনও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি মহত্তর ধর্ম।' পাবলিক প্রসিকিউটার আমাদের পুরাণের কথা তুলে মহর্ষি মাণ্ডব্যের কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

তারাশঙ্করের রচনাধারা আজও অব্যাহত। তাঁর আরো অজস্র গল্প-উপন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর 'মহাশ্বেতা',—তাঁর চলচ্চিত্র-কাহিনী 'না',—আবার তাঁর 'রাধা'—এইসব রচনার মধ্য দিয়ে নিরন্তরভাবে তিনি তাঁর কতো কথাই যে বলে চলেছেন! তাঁর সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশের সময় আসেনি এখনো—তবে শরৎচন্দ্রের পরে, বাংলায় নাম করবার মতন তিনিই যে একমাত্র কথা সাহিত্যিক নন,—তিনি যতো তত্ত্বাগ্রহী ততো রসসৃষ্টিশীল যে নন,—সেকথা মানতেই হয়।

রাধা, যোগভ্রষ্ট

আঠারো শতকের তৃতীয় দশকের শেষদিকে—মোগল আমলের ভারতবর্ষে, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান ও সুবাদার মুরশিদকুলী খাঁর অব্যবহিত পরের আমল,—অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের বছর তিরিশেক আগেকার বাংলা-দেশের বিবরণ দিয়েই 'রাধা' কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে।—'বাংলা দেশে মহাপ্রভুর যে বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্লাবন এনেছিল, জীবনকে সাগর-সঙ্গমের মহাতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিল,—সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজে এসেছে, ফলে দেশ-জীবনের অবস্থা হয়েছে বিলের মত।' সেই বাংলাদেশের অজয় নদের এক তীর্থতটে কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমোহিনী—মা আর মেয়ে,—এই দুটি নারী-চরিত্রের উপস্থাপনা ঘটেছে তাঁর এই উপন্যাসে। ইলাম-বাজারের বৈষ্ণবী নটী কৃষ্ণদাসী। মেয়ে মোহিনীকে নিয়ে কৃষ্ণদাসীর অনেক আশা, অনেক কল্পনা। সে জানে—'মেয়ে তো নয় সাক্ষাৎ আগুনের শিখা।' তার রূপের আকর্ষণ অনিবার্য। এদিকে, ইলামবাজারের ধনী ব্যবসাদার রাধারমণ সরকারের সঙ্গে কৃষ্ণদাসীর ঘনিষ্ঠতা আছে। এই রাধারমণের ছেলে অক্রুর। বৈষ্ণব বংশের ছেলে হয়েও অক্রুর দুর্দান্ত মাতাল। নারীদেহের প্রতি তার প্রচণ্ড আকর্ষণ। সেই অক্রুর-মোহিনী-বৃত্তান্তই সংঘাতময় হয়ে উঠেছে তাঁর এই বিপুলায়তন 'রাধা' কাহিনীতে (১৩৬৪)। তাঁর নাট্যরচনা 'কালিন্দী', 'দুই-পুরুষ' ইত্যাদির কথা নাট্যশিল্পের দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে-আলোচনা এখন স্থগিত থাক। কারণ, নাটক তাঁর আসল ক্ষেত্র নয়,—যদিও নাটকীয় আড়ম্বরের দিকে তাঁর আগ্রহ সংশয়াতীত! প্রধানতঃ তিনি কিন্তু গল্প-উপন্যাসেরই লেখক।

জমিদারদের ধ্বংস বা অবসানের কথা,—বেদে-সাঁওতাল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কথা, আবার কালাচরণ,—বানোয়ারী, নসুরাম, বাচস্পতি-মশায় ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের চরিত্রের কথা তিনি অনেকবার বলেছেন। 'রাধা' উপন্যাসে তাঁর প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজের কথাই পুনরায় দেখা গিয়েছে। প্রথম দু'এক পৃষ্ঠা এগিয়ে গেলেই দেখা যায়ঃ

> 'কৃষ্ণদাসী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ ধরলে। চারিপাশে পাতলা শালবনের ভিতর মাঝে মাঝে খানিকটাখানিকটা চাষের ক্ষেত।

তারই আলের উপর দিয়ে, শালবনের ভিতর দিয়ে পায়ে চলার পথ গঞ্জ-বাজারকে বেড় দিয়ে চলে গেছে। ঐ পথ ধরে কৃষ্ণদাসী মেয়েকে নিয়ে এক নির্জন ঘাটে গিয়ে নামবে। বাঁয়ে বোলপুর সুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত শালবনের এলাকাটা পার হয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। বনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে এই গাড়ির রাস্তাটি। ঐ রাস্তায় সারিবন্দী গোরুর গাড়ি চলছেই—চলছেই। ধান আর চাল, চাল আর ধান। উত্তর দিক থেকে আসে এই ইলামবাজার অম্বুবাজার গঞ্জে।'

সেই নির্জনতার ছবি ফুটেছে ঠিক এর আগের অনুচ্ছেদে। সেখানে আবার যেন কবির অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে সে-বর্ণনাটুকুও তুলে দেওয়া হোলো—

'পাখি ডেকেছে। পাখি ডাকলে আর রাত্রি থাকে না। ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা, খনা বলেন সে হোলো উষা।' উষাকাল রাতও নয়, দিনও নয়। পাখি বাসা ছেড়ে বাতাসে পাখা মেললেই উষা শেষ, দিন শুরু হয়ে যায়।'

বড়ো রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে, রাধারমণ দাস সরকারের পাষণ্ড বংশধর অক্রুর সরকারের আক্রমণ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভয় দূর হয় কৃষ্ণদাসীর। ডাইনে পড়ে থাকে ইলামবাজারের বাজার। অজয়ের তটভূমিতে শালের জঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে। 'ধাত্রীদেবতা'র প্রথমেই যেমন খানিকটা স্থান-পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এই 'রাধা' উপন্যাসেও ইলামবাজারের সদরঘাট আর তার সন্নিহিত শালবন-কুল-বনের কথা,—অজয়ের দক্ষিণে সেই বন যে কীভাবে পূব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে. সাঁওতাল পরগনার অরণ্যভূমির সঙ্গে মিশেছে, সে বর্ণনা বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ধরে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণে বাদশাহী সড়ক পার হয়ে জঙ্গল চলে গেছে দামোদরের ধার পর্যন্ত। তারপর নদীর পরপারে জঙ্গল আবার এঁকেবেঁকে, বাঁকুড়া জেলা জুড়ে, একদিকে চলে গেছে মানভূম হাজারিবাগের অভিমুখে,—অন্যদিকে মেদিনীপুর হয়ে উড়িষ্যা-সীমান্ত ধরে নাগপুরের দিকে।

কৃষ্ণদাসীর মেয়ে মোহিনীর বয়স মাত্র পনেরো বছর—তার নিজের

বয়স পঁয়ত্রিশ। রাধারমণ সরকারের দুশ্চরিত্র ছেলে অক্রূরের কবল থেকে এই মোহিনী মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখবার আগ্রহ,—আর সেই সঙ্গে নিজের জীবনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাস্রোতের কথা ভাবতে-ভাবতে কী যেন এক বেদনার ছায়া দেখা দেয় কৃষ্ণদাসীর মনে। সেই অমাবস্যার ফিকে-হয়ে-আসা অন্ধকারে,—শুকতারা-জ্বলা রাত্রিশেষে জঙ্গল পিছনে ফেলে, মোহিনীকে নিয়ে খোলা জায়গায় এসে কৃষ্ণদাসীকে একটু আত্মচিন্তার সুযোগ পেতে দেখা যায়। সেই সূত্রেই কৃষ্ণদাসীর কুলপরিচয় দেওয়া হয়েছে সাধক হিসেবে তার শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজীর বেশ খ্যাতি ছিল। তাঁর নাকি ভাবাবেশ হোতো, ভাবাবেশের সময় গোরাচাঁদের কাঁধের উত্তরীয় খসে পড়তো। বড়ো বড়ো গোস্বামীরা দেখতে আসতেন। 'তাঁরা বলতেন, প্রভুর অঙ্গেও কম্পন জাগে তাই এমন হয়।' 'কৃষ্ণদাসীর মোহান্ত যিনি,—সেই গোপালদাস কিন্তু প্রেমদাস বাবাজীর নিজের ছেলে নয়; সুন্দর রূপ দেখে পোষ্য নিয়েছিলেন শেষ সেবাদাসীর গৃহস্থাশ্রমের ছেলেটিকে। নাম দিয়েছিলেন গোপালদাস। পাটটিই বরাবরকার শিষ্য আর পোষ্যের পাট। এ পাটের সেবায়েত বাবাজীদের সেবাদাসী আছে, সন্তান নেই। অর্থাৎ সাধনেরই পাট, সংসারের হাট নয়। এখানে দেওয়া নেওয়া আছে, কিন্তু বিকিকিনি নেই। ঘর আছে দোর আছে, কিন্তু বাঁধন নেই। বাঁধনের ডোর পাকিয়ে উঠল কৃষ্ণদাসীর কন্যা মোহিনী হতে। গোপালদাস কৃষ্ণদাসীকে দিয়ে এল সাধনসঙ্গিনী করে; সাধনের ফুল ফল হোলো; বছর-কয়েক যেতেই কৃষ্ণদাসীর সন্তান হোল—মোহিনী।' তারপর গোপালদাসের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদাসীর শ্বশুর প্রেমদাস আর শাশুড়ী রাইদাসী গভীর স্নেহে তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। আখড়ার বিগ্রহেতেই পুরোপুরি মন দেবার পরামর্শ দিয়েছে কৃষ্ণদাসীকে। আর, লোকে যাকে বলে ডাকিনী-বিদ্যা,—সেই ওষুধ, মন্তর-তন্তর, ঝাড়ফুঁকের বিদ্যে দিয়ে গেছে তারা কৃষ্ণদাসীকে। সেই অবস্থাতেই ইলামবাজারে-জয়বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। গুরুদেবদের ইশারায় দেশে তখন গোপনে গোপনে পরকীয়া-সাধন, কিশোরী-ভজন চলে। আর সেই সময়েই ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী সরে আসে মুর্শিদাবাদে। রাঢ়-অঞ্চলে নতুন সমৃদ্ধি দেখা দেয়। ইলামবাজারের দোকানদারেরা এক পুরুষের মধ্যেই বিলাসী মহাজন হয়ে ওঠে। সেই বিলাসের টানে,—দেশের

শুষ্কবাদী, পরকীয়া-সাধনরত, দীনদরিদ্র সাধারণ মানুষ বড়োই বিপন্ন বোধ করে। 'ইলামবাজারের বৈষ্ণবী' শুনলে লোকে তখন ভ্রূ কুঁচকে কটাক্ষ করতো!

অবস্থা-সঙ্কটের এই গ্লানি থেকে তারাশঙ্কর এক লহমায় পাঠকের মনোযোগ সরিয়ে দিয়েছেন আর এক দৃশ্যে। মেয়ের হাত ধরে,—সমবয়সী সখীর মতো অজয়ের ঢালু পাড় ভেঙে জলে নেমে গেছে কৃষ্ণদাসী। এই ছবিটিতে তিনি আবার তাঁরই নিজস্ব উপমা ব্যবহার করেছেন—'মা এবং মেয়ে দুজনে ঝপ্ করে দুটি বালি হাঁসের মতো জলে এসে পড়ল।' এবং এই দৃশ্যের পরেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের শিল্প-কর্ম দেখা দিয়েছে। সে কাজটুকুও এখানে উদ্ধৃত হোলো:

> 'পাখির কলরবে ভরে উঠেছে ওপার-এপারের বনস্থলী। শীতের শেষ, বুনো হাঁসের ঝাঁক সারারাত্রি ক্ষেতে ফসল খেয়ে কলকল শব্দ তুলে দহের দিকে বিলের দিকে খালের দিকে ফিরছে। মোহিনী স্নান সেরে উঠে শুকনো কাপড় পরে পলাশতলায়-তলায় ঝরা ফুল কুড়চ্ছিল। শুকিয়ে দোলের রঙ খেলার রঙ হবে। কৃষ্ণদাসী কাপড় ছাড়ছিল। আর, তাকিয়ে ছিল ওপারের শালবনের দিকে। ওই বনের ভিতর দিয়ে পথ ধরে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে পুরীর পথ! কৃষ্ণদাসী মোহিনীকে কোলে নিয়েই ওই অরণ্যের ভিতর দিয়ে সড়ক ধরে মদনমোহনের বিষ্ণুপুর হয়ে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে জগন্নাথদর্শন করে এসেছে একবার। তখন মোহিনীর বাপ গোপাল দাস বেঁচে ছিল, দল বেঁধে গিয়েছিল তারা। এদিকে এ-বন কেন্দুলীর ওপারের শ্যামরূপার গড় পার হয়ে চলে গিয়েছে পাহাড়মুলুকের দিকে। আর একবার জগন্নাথ-দর্শনে যেতে মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা হয়। কিন্তু হয় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় জগন্নাথের পাট-অঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে মাথার বুকের সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে বাকি জীবনটা পথের ধারে বসে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে কাটিয়ে দেয়।'

এই বর্ণনায়,—এই বিশ্লেষণে একালের পরিণত তারাশঙ্করের যে-ভাষারীতি দেখা যায়, তাতে একই সঙ্গে মসৃণতা, সরসতা আর কবিত্বের আবেদন আছে। আদিযুগের 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে অথবা তাঁর 'কবি'তে মসৃণতা আর

কবিত্বের এরকম সমন্বয় ঘটেনি। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'তেও এ-স্বাদের অভাব ছিল। তবে, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়,' 'নাগিনী কন্যার কাহিনীতে' এই ধরনের অনুভূতিময়, দ্রুতগতি গদ্যের নিদর্শন বিরল নয়।

স্নান সেরে নিয়ে, কৃষ্ণদাসীর মেয়ে মোহিনী সেদিন পলাশফুল কুড়োতে কুড়োতে কিছু মহুয়াফুলও কুড়িয়েছে। মা আর মেয়ে দুজনেই সেই মহুয়া ফুল খেয়েছে। ক্রমশঃ সেই মহুয়ার রসে বিভোর হয়ে ওঠে কৃষ্ণদাসী। কয়েক মুহূর্ত আগেই তার মনে জগন্নাথকে কন্যা-নিবেদনের যে-সংকল্প জাগতে দেখা গিয়েছিল, মহুয়ার গুণে সে-সংকল্প বুঝি হাওয়ায় হারিয়ে যায়! গুন্ গুন্ করে মেয়েকে সে গান শুনিয়ে দেয়—'উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী।' সেই অবস্থায়,—লেখক বলেছেন—'কিশোরী-ভজনে রসবিলাস-উপার্জন-প্রত্যাশা তাকে উদ্দাম করে তুললে।'

তারপর দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে যায় হঠাৎ। কাঁসর-ঘণ্টা-শাঁখের শব্দ শোনা যায়। অজয়ের বাঁক পেরিয়ে একটি বড়ো নৌকো এগিয়ে আসে। সেই নৌকোর গলুইয়ে ধ্বজা উড়তে থাকে। জোর বাতাসে পালের টানে উজানে এগিয়ে চলা সেই নৌকোর ভেতর থেকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের শান্ত প্রসন্ন এক সন্ন্যাসীকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। মা-মেয়ে দুজনেই অভিভূত বোধ করেন।

> 'কৃষ্ণদাসী যাই হোক, বৈষ্ণবের ঘরে তার জন্ম, বৈষ্ণবের আখড়ায় সে বাস করে, সে এ-গোসাঁইকে দেখে প্রণাম করতে ভুলল না।। সেই তটভূমিতেই নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করে উঠে হাত জোড় করে রইল। 'পর-মুহূর্তে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে যতখানি সে অবাক হোলো ততখানি সে বিরক্ত হোলো। মেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ে না। কৃষ্ণদাসী তার হাত ধরে টানছে ঃ মর-মর-মর। প্রণাম কর। প্রণাম কর।
>
> মোহিনী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে বসে মাথাটি লুটিয়ে দিলে।
>
> কী যে হাবা মেয়ে। প্রণাম করতে গিয়ে আঁচল ছেড়ে দিয়েছে। পলাশফুলগুলি ঝরঝর করে পড়ে গেছে মাটিতে ছড়িয়ে।

'রাধা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ এইখানেই। কৃষ্ণদাসী

আর, তার মেয়ে মোহিনী,—সেকালের ইলামবাজার,—সেখানকার শ্রী, সম্পদ, উচ্ছৃঙ্খলতা,—সেকালের বৈষ্ণব ভাবুকতা, এবং তারই মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে—এক নবীন মোহান্তের এই নৌযাত্রার দৃশ্য দেখিয়ে অতঃপর তারাশঙ্কর তাঁর এ-উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রবেশ করেছেন। এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় মাধবার্চনার বর্ণনাতেই জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণদাসী সে দিন তার দেহরাগের কথা ভুলে গেছে, কপালে তিলক কেটে, রেশমের ঝাড়া সুতোয় তৈরী কেটের কাপড় পরে, প্রভুর সেবায় সেদিন নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছে সে। এখানে তার প্রকৃতির দুটি পৃথক দিক সুকৌশলে সূচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বলেছেন যে, সেজেগুজে, ডুলি চড়ে দাস-সরকারের কুঞ্জে নটীর মতন গান গাইতে যায় এক কৃষ্ণদাসী,—আবার প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় প্রভুর ধ্যানে মগ্ন হয়ে চোখের জল ফেলে যে, সে যেন আর এক কৃষ্ণদাসী! 'দুটো জীবন তার যেন দুটো আলাদা ঘরের মতন। দুই ঘরের মধ্যে কোনো যোগ নেই। অথবা দুটো আলাদা পাত্রে সে তরল পদার্থের মত আলাদা আকার ধারণ করে।'

এ-কাহিনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রবেশ করবার আগে এইবার একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। 'কবি' উপন্যাসে এবং তাঁর আরো কোনো কোনো রচনায় বাংলা দেশের পল্লীসমাজের বৈষ্ণব ভাবুকতার রূপ দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর 'প্রেমের গল্পে'র (১৩৬৬) 'রাধারাণী' গল্পটি তাঁর এই 'রাধা' উপন্যাসের প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক যদিও দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক যৎসামান্য। এ-গল্পে গৌরদাস দাস নামে এক যাত্রার দলের অভিনেতার জীবন-কথা রূপায়িত হয়েছে। গৌরদাস ছিল এক যাত্রার দলের অধিকারীর স্নেহে-মমতায় লালিত, কমনীয়কান্তি বালক-অভিনেতা। প্রতি সন্ধ্যায় তাকে গান শিখতে হোতো,—অধিকারী তাকে পাখির মতো অভিনয় শেখাতেন। বৃন্দা জিগেস করতো—'হ্যাঁগো শ্রীমতী, ব্রজেশ্বরী, ব্রজের রানী তুমি, তোমার চোখে জল কেন গো'। সে সুর করে উত্তর দিত, 'বৃন্দে গো পিরীতির রীতি এমন কেন বলতে পারো সখি।' এই ভাবে গানে, কথায়,—যাত্রার আসরে মুখে অলকা-তিলকা এঁকে, আসরে উপস্থিত সকলেরই মনোহরণ করতো সে। একদিন যাত্রা ভেঙে যাবার পরে, বাকি রাতটুকু ঘুমিয়েও ঘুম শেষ না-হওয়ায় সকালে সাজঘরের বারান্দায় ঠেস দিয়ে

সে যখন ঘুমোচ্ছিল, সেই সময় আট-ন'বছরের একটি মেয়ে তাকে ডেকে তোলে। সেই মেয়েটি অতঃপর গৌরদাসকে নিজের মায়ের কাছে নিয়ে যায়। তারই নাম রাধারাণী। রাধার মা গৌরদাসকে সস্নেহে গ্রহণ করেন,—রাধারাণীর প্রীতিতে-কৌতুকে,—তার মায়ের মমতায়—আগ্রহে গৌরদাস খুবই আকৃষ্ট হয়। প্রতি বছরে সেই গ্রামে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির রাস-যাত্রায় গৌরদাসের দলের বায়না বাঁধা হয়ে যায় তারই ফলে। তারপর একদিন রাধারানীর মা তাকে বলেন—'হ্যাঁ বাবা, আমার রাধুকে বিয়ে করবে—আমার বড়ো সাধ।' গৌরদাসের মনে আবেশ লাগে। রাধুর বাপ একদিন অধিকারীর কাছে গিয়ে, অধিকারীকে প্রণাম করে এই বিয়েতে তাঁর সম্মতি প্রার্থনা করেন। রাধারানীর মা-বাপ সত্যিকার বৈষ্ণব-পরিবারের মানুষ। কিন্তু অধিকারী যখন বলেন যে, মাত্র ছ'-সাত বছর বয়সে গৌরদাস ছেলেটিকে তার চেহারা দেখে আর তার গান শুনে, বর্ধমানের পথ থেকে তিনিই একদিন কুড়িয়ে এনেছিলেন,—সেখানকার দোকানীরা বলেছিল যে ছেলেটির মা নাকি—'এই নাচ গান করতো—মানে বারাঙ্গনা ছিল'—তখন রাধারানীর বাপের মনের আশা অবসাদে পরিণত হয়, বার-কয়েক ঘাড় নেড়ে সে জানিয়ে দেয় যে, তারা জাত বৈষ্ণব, ভেকধারী নয়। আর পেছনের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সে-কথা শুনতে শুনতে সেদিন গৌরদাসও কেমন অবসন্ন, বিবশ, পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। সেই রাত্রেই নিজের দল ছেড়ে, কাঁদতে-কাঁদতে চলে গিয়েছিল সে। তারপর দেশ-দেশান্তরে ঘুরে, নানা যাত্রার দলে ফিরে ফিরে, সেই গৌরদাস নিজেরই একটি দল গড়েছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পরে সে আবার ফিরে এসেছে তার সেই ছেলেবেলার রাধারানীর গ্রামে! তখন সে মূলগায়েন, আর রাধার ভূমিকায় যে অভিনয় করে, সে হোলো সেকালের মতোই একালের আর-একটি ছেলে। যাত্রার পরে, বিদায় নিয়ে ফেরবার পথে, নিজেরই অজ্ঞাতসারে সেকালের রাধারানীর মা-বাপের সেই আখড়ার পথে কী ভাবে যেন এসে পড়েছিল গৌরদাস! ঠিক সেই সময়ে—

> 'ওদিক হইতে একটা স্থূলাঙ্গী বিরলকেশা স্ত্রীলোক আসিতেছিল। মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মধ্য পথেই এক পাশে পিছন ফিরিয়া

দাঁড়াইল। মেয়েটির মুখে রাজ্যের বিরক্তি; মূলগায়েন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সন্তর্পণে সসঙ্কোচে স্থানটা পার হইতে হইতে গৌরদাসের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানেই একদিন লজ্জিতা রাধু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আশ্চর্যের কথা—আজও যে স্থূলাঙ্গী সেখানে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—সেও রাধু। গাছের শিকড়ে ঘর জীর্ণ হওয়ায় তাহারা স্থানান্তরে আখড়া বাঁধিয়াছে। সে এখন ঘরনী-গৃহিণী সন্তানের জননী। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ-যাত্রা দেখিয়া তাহার শরীরটা অবসন্ন হইয়া আছে—এবং মনটাও তাহার ভাল নাই। দলের রাধাটিকে দেখিয়া বহুদিন পূর্বের এমনই এক কিশোরকে তাহার মনে পড়িতেছিল। সেও রাধা। কতবার মনে হইয়াছে—এ-ই যেন সে-ই। তাহাকে মনে করিয়া মনটা তাহার বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বিষণ্ণতা বিরক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিরক্তভাবেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গৌরদাস পরম সম্ভ্রমভরে রাধুকে অতিক্রম করিয়া গেল, রাধুও অপরিচয়ের সঙ্কোচ লইয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।'

গৌরদাস আর রাধারানীর এই গল্পের মধ্য দিয়ে মানব-জীবনের গভীর বিষাদের দিকটিই তিনি এইভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন!

তাঁর 'রাধা' উপন্যাসেও জীবনের অন্তর্লীন গভীর বিষাদ-অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে—কিন্তু সে এক অন্য আয়োজনে,—অন্য পাত্র-পাত্রী আর অন্য আখ্যান-সমাবেশের মাধ্যমে। 'রাধা' উপন্যাসে এদেশের ইতিহাসের বিশেষ একটি পর্বে তাঁর যেমন বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়, তেমনি আবার বৈষ্ণব সমাজের স্বকীয়া-পরকীয়া সাধনভেদের তত্ত্বকথা,—জয়দেবের গীতগোবিন্দের শৃঙ্গার-রসের কথা ভারতে-ভাবতে—তাঁর গৃহীত ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বে, 'নারীর মধ্যে আদিম মহাপ্রকৃতির প্রচ্ছন্ন-ভাবে' অবস্থানের কথাতে—মহাকালীর প্রসঙ্গে (নবম পরিচ্ছেদ স্মরণীয়), পীরপুরুষ হজরৎ হোসেন সাহেব আর আনন্দ ঠাকুরের ডাকিনী বিদ্যা-চর্চার প্রসঙ্গে (অষ্টম পরিচ্ছেদ স্মরণীয়),—নবাব সুজাউদ্দীনের বিলাস-

কথায়,—মুরশিদাবাদ-হেতমপুর-বর্ধমানের নবাব আর জমিদারদের অর্ধ-ঐতিহাসিক, বিচিত্র কল্পনা-সমৃদ্ধ রোম্যান্সের পরিবেশ ঘনীভূত করে তোলবার দিকেই তারাশঙ্করের আগ্রহ দেখা গেছে! এই তন্ত্র-মন্ত্র,—এই ইতিহাস-গৌরব,—আর এই রকম চমকপ্রদ পরিবেশ এবং ঘটনা ঘটিয়ে তোলবার ঝোঁক তারাশঙ্করের স্বভাবের বিশেষত্ব। সে-কথা অনেকবার বলা গেছে। তাঁর এই 'রাধা' উপন্যাসে গভীর রাত্রে মোহিনীর মা কৃষ্ণদাসীর ডাকিনী বিদ্যা-চর্চা-প্রসঙ্গে 'বাট বয়ে বেড়াবার' কথা দেখে 'ছলনাময়ী' গল্প-সংগ্রহের 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পটির কথা এখানে আবার মনে পড়তে পারে। 'ছলনাময়ী' গল্পটিতে তান্ত্রিক শব-সাধনার কথাও আছে। আবার 'খড়্গ' গল্পে ঔরংজীবের সমকালীন ঢেকার রাজা রামজীবন রায়ের প্রবল প্রতাপ যে কীভাবে উত্তরকালে খর্ব হয়ে যায়,—নবাব মুরশীদকুলি খাঁর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কীভাবে যে রায়বংশের পতন হয়,—সেই ইতিহাসের পটে, কোনো এক ছেত্তার জীবন-কথা,—জীব-হত্যায় তার গভীর মনের অনিচ্ছা,—ঘুমের মধ্যে তার গোঙানি,—এক গভীর রাত্রে রাজকন্যার সঙ্গে তার অপ্রত্যাশিত কয়েকটি কথা—এবং সেইসব ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে তন্ত্র-সাধনার রহস্য-পরিবেশ বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের এই অদ্ভুত হাওয়া যেন তারাশঙ্করকে ঘিরে রেখেছে! রূপকথা আর রোম্যান্সের পরিমণ্ডল তিনি কিছুতেই বুঝি অতিক্রম করতে পারেন না! এই সূত্রে—'সপ্তপদী'র সপ্তম অধ্যায়টি মনে পড়ে। কৃষ্ণস্বামী আর রিনা ব্রাউনের কথা বলতে-বলতে সেখানেও তিনি এই ধরনের জাদুবিদ্যার প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গেছেন। প্রেত-পিশাচ-ডাকিনী-তন্ত্র-মন্ত্র তাঁর বর্ণনাতে না থাকলেও, তাঁর উপমায় এসব প্রসঙ্গে দেখা দিয়ে যাবেই, মূল বিষয়ে না থাকলেও প্রাসঙ্গিক স্মৃতিকথায় একটু জায়গা পাবে অন্ততঃ! 'সপ্তপদী'তে সেই ব্যাপারের নমুনা আছে ঃ

> 'কৃষ্ণস্বামীর মন বিহঙ্গের মতো আকাশ-বিহারী। আলো, আরও আলোর জন্য সে ডানা মেলেছে। বিনা ব্রাউনই একদিন সেই পাখা মেলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। আশ্চর্য মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের শক্তি, বাবা জেমস্ ব্রাউনের আঘাতে সেই রিনা ব্রাউন অন্ধকার গহ্বরে সরীসৃপ হয়ে গেল। তার বাল্যজীবনে পুরাণে পড়েছিল একজন রাজা কার অভিশাপে অজগর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে গল্প শুনেছিল কাজল-

হারার। কাজলহারা ঠিক রিনার মতো স্ফটিকে-গড়া মেয়ে, তার সতীন তাকে জাদুদণ্ডের প্রহারে সাপিনীতে পরিণত করেছিল।'

সত্যিই, ছেলেবেলায় তাঁর মায়ের কাছে কাজলহারার গল্প শুনেছিলেন তারাশঙ্কর। 'আমার কালের কথা'তে (১৩৬৬ সালের সংস্করণ, পৃঃ ৩৬-৩৭) সে-প্রসঙ্গ তিনি নিজেই বলেছেন। বেদে-ইরানী-নটী-পটুয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেই ছেলেবেলাতেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল। 'ডাইনীর বাঁশি'তে যে স্বর্ণ-ডাইনীকে দেখা গেছে, তার কথা তিনি নিজের জীবন-কথার মধ্যে বলেছেন। (ঐ পৃষ্ঠা ৭৯-৮০)।

ধাত্রীদেবতা'র রামজী সাধু তাঁদেরই বাগানে তারা-মায়ের আশ্রমে থাকতেন। আর গোঁসাইবাবাও ডাইনের ওঝা ছিলেন। নিজের দেখা জগৎকেই কথা-সাহিত্যে রূপায়িত করে তোলবার সংকল্প তাঁর! ছেলেবেলায় মায়ের মুখে কথকতার যে আদর্শ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সেই আদর্শেই তিনি যেন তাঁর নিজের রচনা চালিত করবার চেষ্টা করেছেন! এ-ছাড়া তাঁর বাবার মজলিসেও গল্পের কথকতা চলতো,—সদানন্দময় ব্রজজ্যাঠার মুখেও কতো গল্প শুনেছেন তিনি। লাভপুরের জামাই কেদার চাটুজ্যেও কতো-যে গল্প বলতেন! জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী, অনেকেই আসতেন,—অনেকের অনেক গল্প শোনবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর।

তারাশঙ্করের কবিত্বময় নানান্ বর্ণন-কৌশলে সেইসব বিচিত্র কথকতার প্রতিধ্বনিই হয়তো বা ফিরে পাওয়া গেছে। সে যাই হোক, 'রাধা' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'কৃষ্ণদাসীকে ভাবাকুল অবস্থায় কাঁদতে দেখা গেছে। নিতাই দাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, অন্যান্য বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সঙ্গে সেও সকালে দেখা সেই নবীন সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়েছে। আর দেখা গেছে গোপীদাস বাবাজীকে। তাঁর কবিত্বের প্রকাশ ঘটাবার জন্যে তাঁর নানা রচনায় যেমন এক-একজন পদ্যকার বা গান-রচয়িতাকে পাওয়া যায়, এ কাহিনীতে তেমনি গোপীদাস একজন। গোপীদাসের গানেও কিন্তু সে-সন্ন্যাসীর কোনো স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেটা পাওয়া গেছে 'কয়ো বোরেগী'র কাছ থেকে। সে প্রায় সন্ধ্যাবেলায়। এই 'কয়ো' তাঁর আর এক অদ্ভুত চরিত্র। তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—'কয়ো অর্থে কাক; কাককে এখানে 'কয়ো' বলে...'কয়ো বোরেগী নাম নয়, আসল নাম একটা

আছে, কিন্তু সে লোকে ভুলে গেছে। বাউণ্ডুলে, গাঁজাখোর ভিক্ষুক। কিন্তু ভিক্ষে সে গৃহস্থের দোরে দোরে ঘুরে করে না, সে বেছে বেছে গিয়ে দাঁড়ায় এ-অঞ্চলে যে-বাড়িতে যে-দিন কোনো একটা সমারোহ থাকে, সে-দিন সেই বাড়িতে।'

কৃষ্ণদাসী যখন প্রভুর আরতি শেষ করে, ঘরের কাজ সেরে নিয়ে রাধারমণ দাস-সরকারের সঙ্গে সাধনরাত্রি' উদ্‌যাপনে যাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, সেই সময়ে 'কয়ো' এসে মালপোয়া আর মালসাভোগ খেতে-খেতে জানিয়ে দেয় যে, সেই সন্ন্যাসী এসে নেমেছেন জয়দেবে নয়,—কদমখণ্ডীর ঘাটের ওপারে শ্যামরূপোর ঘাটে। তাঁর পরিচয় এই :

> 'রাজার ছেলে কালাপাহাড়। বলে, রাধা মানি না। জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা নয়, চামুণ্ডো। ঠাকুর এনেছে শুধু শ্যাম। ওই শ্যামরূপোর ভাঙা গড়ের এক পাশে মঠ বানাবে। বোষ্টুমী গেলে ঝাঁটা মারবে।'

কৃষ্ণদাসী নিজে দাস-সরকারের কুঞ্জে যাবার আগে ঘরবন্ধন অঙ্গবন্ধন মন্ত্র পড়ে মোহিনীকে শত্রুভয়মুক্ত করে রেখে যায়। তবু মোহিনী বলে'—তুই থাক্ না ভাই কয়ো'। কয়োর সঙ্গে মা-মেয়ের এই প্রীতির বন্ধন অকৃত্রিম। কৃষ্ণদাসীর তন্ত্র-মন্ত্রের গুণেই মোহিনীর ভয় করবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া. নবাব জাফর কুলী খাঁর শাসনের গুণে দেশে তখন 'বাঘে-বকরিতে এক ঘাটে জল খায়, বাজে-কবুতরে এক গাছের ডালে বসে জিরোয়।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় দাস-সরকারের কুঞ্জের দৃশ্যটিও চমৎকার! দাস-সরকার সুগন্ধি কাঠগড়ার তামাক টানতে টানতে বসে আছে,—শৌখিন দেওয়ালগিরির সামাদানে রাখা বাতির আলোয় আর পিলসুজের প্রদীপের আলোয় ঘর উজ্জ্বল,—রূপোর রেকাবিতে রাখা ফুলের মালা, ফুল, চন্দন, চুয়া, আতরদান,—দাস-সরকারের কাছেই চমৎকার একখানি খোল!—'সন্ধ্যার মুখেই দুগ্ধ এবং সর সহযোগে অহিফেন সেবন হয়েছে, তার উপর এই তামাক ছিলিমটির অব্যবহিত পূর্বেই সেবন করেছেন সকাল থেকে গোলাপ-জল-ভিজানো ত্বরিতানন্দ একদফা। 'ত্বরিতানন্দ অর্থাৎ গাঁজা'! এই কুঞ্জে অধিষ্ঠিত দাস-সরকারের মুখ থেকেই নবীন সন্ন্যাসীর পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায়। জাতিতে ব্রাহ্মণ, বড় জমিদার, উপাধি রায়চৌধুরী,—তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন পণ্ডিত,—পাঠান আমলে গৌড়ের সুলতানদের সুনজরে পড়ে

যায়,—তখন থেকেই সম্পদ-বৃদ্ধি! এই সন্ন্যাসীর বাপ ছিল ভোগী, তার দুই স্ত্রী, আর এক যবনী-রক্ষিতা! কৌশলে শরিকের সম্পত্তি কিনে-কিনে খুবই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা যবনী রক্ষিতা রাখার অপরাধে তাঁকে পতিত করবার চেষ্টা করে, তখন তিনি বৈষ্ণব হয়ে যান—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই 'যবনীকে ভেক দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন।' তারই বড় ছেলে এই নবীন সন্ন্যাসী। তার মা ছিল গোঁড়া পণ্ডিত বংশের মেয়ে। এই রাধা-ত্যাগী, শ্যাম-সর্বস্ব সন্ন্যাসীই এ কাহিনীর নায়ক।

সেই নায়কের ছবি সুপরিস্ফুট করতে গিয়েই ইতিহাসের দু'চারটি নাম আর অতীতের কিছু কিছু ছবি পরিবেষণ করেছেন তারাশঙ্কর। মহারাণা জয়সিংহ আচার্য কৃষ্ণদেবকে পাঠিয়েছেন বাংলা দেশে,—প্রয়াগে বিচার হয়েছে স্বকীয়া মতে সাধনা ভালো না-কি পরকীয়া পথই স্বীকার্য! পণ্ডিতেরা সেখানে স্বকীয়া মতেই স্বাক্ষর দিয়েছেন। তারপর স্থলপথ ছেড়ে জলপথে যাত্রা,—নবদ্বীপের পথে কাশী। সেখানেও বিচার-সভা বসেছে। সেখান থেকে এগিয়ে কাটোয়ার কাছে মালিহাটিতে। রাধামোহন ঠাকুরের মুখে রাধাতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে,—ক্ষিপ্র তর্কে হার মেনেছেন কৃষ্ণ দেব। অশ্রুবিগলিত চোখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি অজয়পত্র লিখে দিয়েছেন রাধামোহন ঠাকুরকে!

এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে এই সব নাটকীয় ঘটনার আড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে এক ভাবমোহ ঘনীভূত হতে দেখা যায়! কৃষ্ণদাস তো বইয়ের প্রথম দিকেই পাগল হয়ে গেছে,—শেষ দিকে পৌঁছে দেখা যায়—মোহিনী এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাকুল মাধবানন্দের সামনে। আর, মাধবানন্দ সেই মোহিনীর সামনে নতজানু হয়ে বলেছেন—'তুমি রাধা—আমার রাধা'!

তারাশঙ্করের স্বভাবধর্ম অনুসারেই এখানে মূল ঘটনা আর প্রধান চরিত্রের সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো অনেক উপকরণ মিশে গেছে। হিন্দু আর মুসলমান,—বর্গী আর নবাবী ফৌজ,—ভক্ত আর জ্ঞানী-তার্কিক—এক কাহিনীর আধারে কতো কী-ই যে মিশে গেছে!

বই শেষ করবার আগে তাঁর একালের আর-একটি রচনার উল্লেখ মাত্র করে রাখা যাক। পরে আরো বিস্তৃতভাবে তাঁর এই সাম্প্রতিকতম পর্বের

লেখাগুলির আলোচনা করা যাবে। সত্যিই তাঁর রচনার ধারা এখনো অব্যাহত ভাবে এগিয়ে চলেছে। সেই নিরন্তর প্রবাহের কথাই বার বার মনে পড়ে।

'যোগভ্রষ্ট' বইখানির মধ্যে তাঁর তত্ত্বাভিনিবেশ যে খুবই গভীর—এবং তা যে' কতকটা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে, সে-কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই।

১৩৬৬ সালে এই রচনাটি পূজা-সংখ্যা 'উল্টোরথে' বের হয়েছিল। তখন নাম ছিল 'যবনিকা'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় নাম পরিবর্তন করে তিনি এর নাম দিয়েছেন 'যোগভ্রষ্ট'। সেই নামান্তর সম্বন্ধে তিনি নিজে তাঁর ভূমিকায় বলেছেন—'হয়তো গোড়ারটিই ঠিক ছিল—অন্ততঃ ভূমিকা লেখবার সময় তাই মনে হচ্ছে। এই আখ্যানটি সচরাচর এই যুগে যে-অর্থে উপন্যাসকে উপন্যাস বলে থাকি—তা ঠিক নয়, অর্থাৎ ঠিক অতি সাধারণ সমাজ-জীবনের দৈনন্দিন সমস্যায় পীড়িত, সুখে দুঃখে বর্তমান যুগবোধে জর্জরিত সমাজচিত্র নয়। এর পাত্র-পাত্রী সবই কাল্পনিক—কোনখানে কোন সত্য জীবন ও ঘটনাকে কেন্দ্র করেনি বা আশ্রয় করেনি একটি ঘটনা ছাড়া। সেটি সুদর্শন ডেটিন্যু এবং ওই বিচিত্র সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ। বাকিটার মূল হোলো এই যে, আমার জীবনের অণুপরমাণুতে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে, অতীত সংস্কার-বিশ্বাসে ও নূতন শিক্ষার বুদ্ধিতে যে আমি মর্মান্তিক প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনুভব করছি—যার ফলে আজ সব ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সেই ধ্বংসস্তূপে ক্ষণজীবী চন্দ্র একটা বুদ্বুদ, সব মরুভূমি, সব মরুভূমি, শুধু বালু, কোন বিশ্বাস সেই, আশ্বাস নেই, এখানে সত্যটা কি ? এখানে আজ উলঙ্গ প্রশ্ন—আমি কে ? আমি কেন ? আমি কী ?'

'একদা বিশ্বাস করেছিলাম সৃষ্টির মূলে এক স্রষ্টাকে। ঈশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে গড়েছিল মনোরাজ্যে সপ্তস্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, নন্দনকানন, পারিজাত, মন্দাকিনী। গড়েছিল আদর্শ কর্তব্য। তাই ছিল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নির্দেশ। শুধু মনেই গড়ে ক্ষান্ত হয়নি মানুষ। বাইরের পৃথিবীতে হিমাচলের উপরে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ-অমরনাথের মন্দির থেকে দক্ষিণে জলমগ্ন কুমারিকা-প্রান্তে কন্যাকুমারীর বেদীপীঠ নির্মাণ করেছে। দেশে-দেশান্তরে মসজিদ্ উঠেছে, গীর্জা উঠেছে।'

'আজ জগতে এসেছে নাস্তিবাদ। ঈশ্বরবাদ আজ জীর্ণ বৃদ্ধ পিতার শবদেহের মত পড়ে রয়েছে। কোথাও আমরা সর্বময় উত্তরাধিকারী কর্তা বলে চীৎকার করছি। কোথাও মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চীৎকার করছি। শুধু

তাই নয়—আজ ওই ঈশ্বরের উপাধানের তলদেশে একটা চিরকুট পেয়েছি, যাতে লেখা আছে—ঈশ্বর চিরকালই এই শবের মত। মিশরের মমির মত সাজানো ছিল। জীবন্ত মনে হয়েছিল কিন্তু জীবন্ত কোনকালে ছিল না। তবে? তবে আমরা কে? আমরা কী? আমরা কে? জন্তুর পুত্র? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু? আমরা কি শুধু মরবার জন্য এবং যতদিন বাঁচি ততদিন শুধু ভোগের জন্য? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু—তাকে ভেঙেও মহানাস্তিতে পৌঁছুতে পারি না। পৌঁছুই এক মহাশক্তির প্রলয়ঙ্কর প্রকাশে। সে কি অস্তি? না, সে নাস্তি? সেই তো যবনিকা।'

তাঁর নানা উপন্যাসে তত্ত্বচিন্তার প্রাধান্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে, সেই সূত্রেই এই ভূমিকা থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা অনিবার্য। তিনি বলেছেন—'এ প্রশ্ন অজ্ঞানে হোক, সজ্ঞানে হোক, প্রতিটি মানুষকে আজ একটি মর্মযন্ত্রণায় অধীর করে রেখেছে। অস্তিবাদে হোক, নাস্তিবাদে হোক, সে খুঁজছে সেই পরম উত্তর অর্থাৎ একটি পরম বিশ্বাস। সেইটিই প্রকাশ করেছি একটি কাল্পনিক কাহিনীর সাহায্যে। কাহিনী কাল্পনিক হোক, পটভূমির স্থানকাল এবং ঐতিহাসিক স্থিতি ও গতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তার বদল কোথাও করি নি। সেইখানেই আমার দাবী এ-কাহিনীও সত্য। এ আমার কৌশল-সর্বস্ব রচনা নয়, এ আমার অন্তরের যন্ত্রণার সঙ্গীত।'

ঈশ্বর-সন্ধানী, কল্পনা-ব্যাকুল তারাশঙ্করকে এখানে পুনরায় মুখর হতে দেখা গেছে। '১৩৫০' আর 'মন্বন্তর'-যে পর্বে লেখা হয়েছিল, এ যেন তারই সুদীর্ঘ, সুতীব্র প্রতিবাদ!

উপসংহার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।' তাঁর সে-লেখাটি 'লেখকের কথা' বইয়ে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) ছাপা হয়েছে। আরো পরিস্ফুট করে তিনি বলেছিলেন,—'খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসের চরিত্র,—মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়েই তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ঐ একই কথা। তবে, সে-কথা তিনি তাঁর নিজের মতন করেই বলেছেন। তিনিও অভিজ্ঞতার ওপরেই জোর দিয়ে থাকেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অভিজ্ঞতার মানুষ বলতে আপত্তি হবার কথা নয়। 'দেবযান'-এর মতন অলৌকিক কাহিনীর ভূমিকা হিসেবে, জীবের মরণোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে তিনি 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ,' 'ভগবদ্গীতা,' শ্রীঅরবিন্দের 'দি লাইফ ডিভাইন' এবং বার্গসঁর বচন উল্লেখ করে মরণের পরবর্তী অভিজ্ঞতার ওপরেই জোর দিয়ে গেলেন! অন্যের কাছে সে-সব প্রসঙ্গ যতোই 'আষাঢ়ে গল্প' বলে মনে হোক্ না কেন, 'দেবযান'-এর লেখকের কাছে যতীন এবং পুষ্পের পারত্রিক আলাপ-আলোচনা এবং সে-জগতের যাবতীয় আচরণের উল্লেখ যে সত্যিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, তাতে সন্দেহ হবার কথা নয়।

মৃত্যু সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের মতন তারাশঙ্করকেও চিন্তিত দেখা গেছে! তবে বিভূতিভূষণের লেখাতে মৃত্যু-তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বত্রই যে বক্তৃতার আয়োজন বা উচ্চকণ্ঠে কিছু গম্ভীর বা গভীর কথা শুনিয়ে দেবার সংকল্প প্রকট হয়েছে, তা নয়। যাক্—এখানে সে-কথার দরকার নেই। আসল কথা, এই যে, জগতের যে-কোনো ব্যক্তির,—অর্থাৎ সাধারণ মানুষমাত্রেরই অভিজ্ঞতা—আর, অন্য পক্ষে, লেখকের অভিজ্ঞতা ঠিক এক জিনিষ নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে জীবন সম্বন্ধে মানুষ যে-যে বোধ বা ধারণা বা সুখ-দুঃখের যে-যে অনুভূতি পেয়ে থাকে,

সাহিত্যে সেই সব অনুভূতিই যেন নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে আমাদের মনে চমক লাগিয়ে দেয়। 'বনফুল'-এর ক্ষেত্রে এই অনুভূতি যে-পরিমাণে মৌলিক এবং বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটাতে পেরেছে, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে হয়তো ঠিক সে-পরিমাণে নয়! তারাশঙ্কর তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই বাস্তবানুগামী,—মাঝে-মাঝে ভাবালুতাময়, উচ্ছ্বাসপ্রবণ! বনফুল সেই একই কারণে—অর্থাৎ তাঁর অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যবশেই,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চমকপ্রদ,—ঠিক রোমাঞ্চকর না হলেও উত্তেজনাজনক—এবং বাস্তব-অতিশায়ী! এ-কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, এঁদের অনুভূতি ঠিক এক ধরনের নয়। তারাশঙ্কর বেশি নির্ভর করেছেন তথ্য দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার আগ্রহে,—সেই সঙ্গে বক্তৃতার ভঙ্গিতে দেশপ্রেম, মানব-বন্দনা, মৃত্যু-চিন্তা, ঈশ্বর-ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনাতে। শিক্ষিত, নগরবাসী আধুনিক বাঙালীর জীবন সত্যিই তাঁর স্বীকৃত বিষয় নয়। সেকালের জমিদারি—যা একালে ভেঙে পড়েছে,—হয় তিনি সেই অঞ্চলে ঘুরেছেন,—না-হয় সাপুড়ে বেদে, কবি, যাত্রার দলের লোকজন ইত্যাদি মানুষের রাজ্যেই তাঁর আগ্রহ।

জগতে একজনের অভিজ্ঞতা আর-একজনের অনুভূতির হুবহু নকল হতে পারে না। তের শ' তেষট্টি সালে প্রথম প্রকাশিত—এবং ঐ বছরেই গ্রন্থাকারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে পুনঃপ্রকাশিত বনফুলের 'ভুবন সোম' বইখানিতে অনিলবাবু বা সখীচাঁদ বা ভুবন সোম, এঁরা কেউ-ই অবাস্তব নন,—কিন্তু সেখানে এঁরা—এবং এঁরা ছাড়া ভুট্টা, ভাগিয়া, চতুর্ভুজ গোপ,—তার মেয়ে বিন্দিয়া ইত্যাদি সকলে মিলে যে ভ্রমণ-কাহিনীটি সুরসাল করে তুলেছেন, সে-কাহিনী কেমন যেন স্বপ্নের মতন সুন্দর আর সুখস্বপ্নের মতোই অবিশ্বাস্য মনে হয়! তার আগের বছর,—তের শ' বাষট্টিতে বনফুলের 'নিরঞ্জনা' বেরিয়েছিল। সে-কাহিনী আনাতোল ফ্রাঁসের Thais অবলম্বনে লেখা। কিন্তু ২৪-৯-৫৫ তারিখে ভাগলপুরে বসে, ছোটো একটি 'নিবেদন'-এর মধ্যে,—বনফুল তাঁর সেই বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'ইহা ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নহে, দেশ কাল পাত্র পাত্রী আমাদের দেশের অনুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।'

অর্থাৎ—উপন্যাসে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ রক্ষা করবার দায়িত্বকে আবশ্যিক বলেই গণ্য, সে-কথা সমালোচক-সমাজে বহুশ্রুত ব্যাপার। ইংরেজিতে গত শতকের আগের শতকে ডিফো, রিচার্ডসন এবং ফীল্ডিং-এর কলমে প্রথম যখন

উপন্যাস দেখা দেয়, তখন থেকেই এই 'বাস্তবতার' আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকদের সচেতন থাকতে দেখা গেছে। ফ্রান্সে রিয়্যালিজ্‌মের খুবই চর্চা হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে Duranty-র সম্পাদনায় সেখানে Realisme নামে এক পত্রিকা ছাপা হয়। কোনো কোনো আলোচকের মতে পশ্চিমে দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক 'রিয়্যালিজ্‌ম্‌'-এর সূচনা ধরা হয় ডেকার্টে এবং লক্‌-এর আমল থেকে। আঠারোর শতকের মাঝামাঝি সময়ে, টমাস রীড্‌-ই নাকি সাহিত্যে 'বাস্তব' আদর্শের কথা প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন। বহির্জগৎ যে মায়া নয়, মোহ নয়,—তা' যে সত্য,—এবং ইন্দ্রিয়গোচর এই বহির্জগতের ধারণা যে সত্যেরই প্রতিফলন বা প্রক্ষেপ, সে-সব তর্ক-বিতর্কের উল্লেখ এক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগবে না। উপন্যাসে জগৎ-সম্বন্ধে লেখকদের ব্যক্তিগত ধারণা প্রকাশের সুযোগ ঘটে থাকে,—সেই কথাটাই আসল কথা। এবং 'বাস্তবতা'র নামে আমাদের লেখকরা এই সব প্রসঙ্গে তাঁদের নিজের নিজের রুচি-অরুচির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন,—এখানে নিঃসন্দেহে এইটুকুই কেবল ধর্তব্য!

কিন্তু মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ কি কি? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত আলোচনার মধ্যে সে-কথার কোনো উল্লেখ নেই। তিনি শুধু এই বলে তাঁর সে-প্রবন্ধটি শেষ করেছিলেন যে, উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরো ব্যাপক, আরো প্রসারিত! উপন্যাসে অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন আর বিচিত্র পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী কাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই, কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করছে।'

সম্প্রতি ভারত-সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত Cultural Forum পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৫৯) মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ সম্বন্ধে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, মঞ্জেরি এস্. ঈশ্বরন্, অধ্যাপক তারকনাথ সেন, মুরিয়েল ওয়াসি এবং আর. ই. ক্যাভেলিরো—এই পাঁচজন আলোচকের মন্তব্য ছাপা হয়েছে। সকলেই জানেন যে, আমাদের সামাজিক অবস্থানক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যন্ত্রশিল্পের সূত্রপাত, নগরপ্রসারণ এবং

পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গেই উপন্যাসের ইতিহাস জড়িত। পাঠকসমাজে গল্পের চাহিদা বোধ হয় চিরকালের ব্যাপার। কিন্তু গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য যে ঠিক কোথায় অথবা কোন্ বিন্দুতে, সে-বিষয়ে হুমায়ুন কবির বলেছেন যে, গল্প হোলো জীবনের মোটামুটি স্থিতিধর্মী রূপায়ণ, আর,—উপন্যাস নিঃসন্দেহে তার চলচ্চিত্র। কিন্তু শুধু চলৎ-লক্ষণই নয়,—উপন্যাসে এই গতিধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সামগ্রিক ধারণাটাও থাকা দরকার। আবার এও স্বীকার্য যে, কেবল ঘটনাস্রোতের বর্ণনাকেই যথার্থ চলৎ-ধর্মবোধের উদাহরণ বলা ঠিক নয়। চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়ে তোলার মধ্যেই মানব-জীবনের যথার্থ গতিরূপের উপলব্ধি ফুটতে পারে। কবির সাহেব সে-কথাও বলেছেন। সময়ের ধারাবোধ এড়িয়ে, বা সেদিকে পূর্ণ অবহিত না থেকেও ছোটো-গল্প লেখা যেতে পারে, কিন্তু কালস্রোতের নিত্য-নতুন তরঙ্গের উদ্ভব আর বিলয় সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক কখনোই উদাসীন থাকতে পারেন না। উপন্যাসের এই সব লক্ষণ বিচারের কথা থেকেই তিনি উপন্যাসের সঙ্গে মহাকাব্যের তুলনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের আরো একটি কথা বলতে পেরেছেন। উপন্যাস আমাদের আধুনিক কালের মহাকাব্য তো বটেই,—মহাকাব্যের মতনই ধীরে ধীরে এবং সমগ্রভাবে জীবন-বীক্ষার প্রয়াস দেখা যায় উপন্যাসে। তবে, মহাকাব্য প্রধানতঃ কেবল বীরত্বের দিকেই সজাগ,—বীরের সম্বন্ধেই আগ্রহী। অপর পক্ষে, উপন্যাসে আমাদের এই মনুষ্য-জীবনের উত্থানভূমি এবং নিম্নতল—তার উচ্চশীর্ষ এবং গভীর গুহা-গহ্বর সব-কিছুই গৃহীত হয়। কিছুই উপেক্ষিত হয় না,—কিছুই সরিয়ে রাখা হয় না। এদিক থেকে দেখলে মহাকাব্যের তুলনায় উপন্যাসের বিস্তার যে আরো বেশি, সে-কথা বলতেই হয়। আবার, গতি এবং আয়তনের বিষয়েও বলবার কথা আছে। গতি তো আদ্যন্ত সমান নাও হতে পারে, আয়তনের ব্যাপ্তির মধ্যেও বিভিন্ন অংশের আঁটসাঁট সংহতি তো না-থাকতেও পারে। ঔপন্যাসিককে তাই তাঁর রচনার সর্বাংশের মধ্যেই আবশ্যিক অন্বয়ের কথা ভাবতে হয়। উপন্যাসের শিল্পরূপ বা গঠনকলা এই অন্বয়চিন্তাতেই আশ্রিত। ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতার মালমশলার ওপরেই তাঁর রচনাকে গঠন দেন এবং তাঁর অন্বয়ের ধ্যানটিকে রূপ দিয়ে থাকেন। এবং কোনো উপন্যাস সত্যিই মহৎ হোলো কি হোলো না,—তা বিচার করতে হলে, পাঠক দেখেন লেখকের উদ্দেশ্যটা কী ছিল,—এবং তা কতোদূর-ই বা ফুটেছে,—অথবা,

যে মাল-মশলা তাঁর সেই বিশেষ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রকৃতিটা কী রকম।* সমস্ত শিল্পীই রচনার মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত হতে দিয়ে থাকেন। তাঁদের এই পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বই এক-এক রকম উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা দেয়। তবে উদ্দেশ্য যদি খুবই স্পষ্ট, খুবই দৃশ্য—অর্থাৎ খুবই সোজাসুজি চোখে পড়বার মতন ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহলে শিল্পীর সৃষ্টি আশানুরূপ সার্থক হয়েছে বলা চলে না। সে বরং কখনো মাত্রাজ্ঞানহীন প্রগল্ভ্‌তা,—কখনো বা প্রচার বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

তাঁর মতে, আমাদের জীবন-সত্যের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্যের সামগ্রিক ধারণাটাই উপন্যাসের আসল কথা। শিল্পরূপের অল্প-বিস্তর ত্রুটি ঘটলেও তা উপেক্ষা করা যেতে পারে,—যদি, এই সামগ্রিক ধারণার দিক থেকে কোনো ত্রুটি না ঘটে। তিনি উদাহরণ দেখিয়েছেন—ডস্টয়েভস্‌কির উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই তো রূপগঠনে শৈথিল্য ঘটেছে,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিবিড় উপলব্ধির গুণেই সে-সব লেখা সমাদৃত হতে বাধেনি! অন্যদিকে, টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'র মধ্যে যে ঐশ্বরিক অনাসক্ত দৃষ্টি এবং যে শুচি-শান্ত উপলব্ধি দেখা গেছে, সে কি কখনো ভোলা যায়? ভিক্টর হুগো বা বালজাকের মধ্যে চরিত্র-রূপায়ণে হয়তো কিছু কিছু দুর্বলতার নমুনা আছে, কিন্তু যে পরম হৃদয়াবেগ দিয়ে,—যে গভীর সততা রক্ষা ক'রে, তাঁরা এই মানব-জীবনের বিচিত্রতা উপলব্ধি করেছেন,—সে-সব কি তুচ্ছ বলা চলে? কবির সাহেব এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নাম করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় সাহিত্যে একমাত্র 'গোরা'-ই বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যের মান অনুসারে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত হতে পারে। এবং 'গোরা'র এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি যে সত্যিই সে-উপন্যাসের চরিত্র-রূপায়ণগত দক্ষতায় এবং তার আয়তনের বিশালতায় আশ্রিত, সে-কথাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর

*অধ্যাপক কবির বলেছেন: 'The novelist imposes form and structure on the mass of experiences that come to him and where the form and the content fuse into a unity we have a great work of art. It reflects reality as refracted through the novelist's personality and this is what had led people to judge the greatness of a novel either by reference to the inner purpose of the novelist or the nature of the content on which he has worked.'

আরো সাম্প্রতিক উপন্যাসের কথায় এসে, তিনি বরিস পাস্তারনেকের 'ডক্টর জিভাগোর'-র কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিশেষ একটি মানুষ এ-দুনিয়ায় তার দুর্বোধ্য, জটিল, নির্মম এবং বিস্তৃত পারিপার্শ্বিকতার জালে জড়িয়ে,—প্রতিবেশের চাপে কতো যে কষ্ট পেতে পারে, এ-উপন্যাসে ব্যক্তিমনের সেই গভীর দুঃখানুভূতিই প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, সমগ্রতার দিকে এখানে ততোটা নজর নেই, যতোটা আছে পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-মনের প্রতিক্রিয়ার দিকে। 'ডক্টর জিভাগো'-কে তাই তিনি 'কবির লেখা উপন্যাস' পর্যায়ে ফেলেছেন। বলেছেন যে, তাতে আশ্চর্য কিছু কিছু প্রস্তরচিত্রের মনোহর বর্ণাঢ্যতাই যেন ফুটেছে। সেই রম্যতা-কে সমগ্রতা-বোধের ফল বলা চলে না। সমগ্রতাবোধ একরকম মানসিক ক্ষমতা। কেবল বহু বস্তুর সমাবেশকেই উপন্যাসের সমগ্রতা বলে না।

শ্রী মঞ্জেরি ঈশ্বরন্ আবার, অভিধান খুলে 'নভেল' কথাটির মানে দেখিয়ে দিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি নানাবিধ সংজ্ঞা এবং বর্ণনা তুলে তুলে উপন্যাসের বহুবিধ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ইংরেজিতে ড্যানিয়েল ডিফো থেকে শুরু করে জেম্স্ জয়েস অবধি সুবিপুল যে উপন্যাস-প্রবাহ বয়ে এসেছে, সেই ধারার বিচিত্রতা মানতেই হয়। ই. এম্. ফর্স্টার খুবই সোজাসুজিভাবে উপন্যাসে গল্পরসের আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। অধিকাংশ সাম্প্রতিক উপন্যাসে সাম্প্রতিক ব্যাপারেরই বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে। ফলে, সে-সব ক্ষেত্রে চিরকালের কথা সত্যিই চাপা পড়ে যায়। এবং মানব-জীবনের চিরন্তন সত্য যেখানে অনুপস্থিত, সে-রকম উপন্যাস আর যাই হোক, কালজয়ী যে নয়, তাতে সন্দেহ কিসের? ঈশ্বরন্ মনে করেন যে, উপন্যাসে কোনো-রকম বলপ্রয়োগই ভালো নয়,—যৌন-প্রসঙ্গ, কাঁদুনে কান্না, মনস্তত্ত্বকণ্টকিত রীতি—এ-সবের কিছুই বাঞ্ছিত নয়। তবে হ্যাঁ, সাধারণ পাঠকের কাছে উপন্যাস যে কতকটা শিক্ষাপ্রদ জিনিস, তাতেও সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসিদ্ধ শিল্পী বেন এ্যামস উইলিয়াম্স্-এর লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে ঈশ্বরন্ এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, উপন্যাসমাত্রেই কিছুটা ইতিহাস হতে বাধ্য। পরিশেষে তিনিও সেই বরিস পাস্তারনেকের প্রসঙ্গে এসেছেন। ইতিহাসের স্বরূপ কী? 'ডক্টর জিভাগো' বইখানিতে একজন

সেই প্রশ্নই তুলেছেন বটে। কিন্তু প্রশ্নটা বতো স্পষ্ট, উত্তরটা ঠিক ততো নয়। ঈশ্বরন্ বলেছেন, যে-কোনো যুগের কথাই তাবা যাক না কেন, সে-যুগের উপন্যাসে সেই বিশেষ যুগের মানব-চৈতন্যের সর্বাধিক স্ফূর্তির কথাটাই ধরা পড়ে থাকে!

অতঃপর অধ্যাপক তারকনাথ সেনের কথা। আদিতেই তিনি উপন্যাস-পাত্রটির ধারণ-ক্ষমতার কথা বলেছেন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের সবটাই,—অথবা যে-কোনোটাই ঔপন্যাসিকের গৃহীত বিষয় হতে বাধা নেই। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি—সব পক্ষই জায়গা পেতে পারেন। সাহিত্যের 'প্রকার' হিসেবে এতোবড়ো পাত্র বুঝি আর কোথাও নেই। মহাকাব্যের প্রসার,—নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত এবং উদ্বেগ,—গীতিকবিতার আবেগের টান—এবং তথ্যভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের মননগুণ, উপন্যাসে সবই যেন জায়গা পেতে পারে। মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই কী যে আশ্চর্য গৌরব আর মহিমা,—কী আশ্চর্য তার উৎসাহ বা আগ্রহগুণ,—মানুষ কীযে এক প্রহেলিকা—উপন্যাসে তার এই সত্যস্বরূপের সর্ববৈচিত্র্যেরই অভিব্যক্তি সম্ভব এবং সাধ্য। ইংরেজি সাহিত্যের কথা-সূত্রে অধ্যাপক তারকনাথ সেন একথাও বলেছেন যে, এলিজাবেথের যুগে ইংরেজ তার নাটকের মধ্যেই এই রকম বৃহৎ পাত্র-ধর্ম বা আধারগুণ ফোটাতে পেরেছিল। কিন্তু একালে একমাত্র উপন্যাসেই সে কাজ করা সম্ভব।

বৃহৎ পরিসীমা, বৃহৎ পরিসর,—ব্যাপ্তি এবং সমগ্রতা,—তাঁর মতে, এই সব গুণই হোলো মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ।* সই সমগ্রতা-বোধ যেখানে নেই, সেখানে সত্যিকার মহৎ উপন্যাস দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। টুর্গেনিভের A Lear of the Steppes'ও উপন্যাস নয়, কনরাডের 'টাইফুন'ও উপন্যাস নয়। অর্থাৎ সত্যিকার মহৎ উপন্যাস কেবল তিনিই লিখতে পারেন যাঁর চিত্তের ধারণাশক্তিতে অথবা কল্পনার ব্যাপ্তিতে কোথাও কোনো সংকোচ ঘটেনি!

---

* অধ্যাপক সেন বলেছেন: 'Range, breadth and sweep, amplitude and spaciousness, totality of appeal—these, then, are essential to the making of a great novel'.

কিন্তু সে-রকম মন কি চাইলেই পাওয়া যায়? সার্থক বড়ো উপন্যাস লেখবার উচ্চাশা অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বল্পশক্তিমান, সাধারণ লেখক যখন অসাধারণ কিছু একটা করে তুলতে উদ্যোগী হন, তখন তাঁর অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় হাস্যকর। অধ্যাপক সেনের কথায়—'Attempting to write a great novel without a great mind to inspire and organise the attempt can only result in an unsynthesised pot-pourri, and the novelist who makes the attempt looks like a man to whom you have given a great bag to fill with things of value and who brings it back half empty or filled with gimcrack.'

সুঠাম গল্পের জোরে,—কিংবা নতুন তথ্যের সমারোহে,—কিংবা রীতির নতুন নতুন কায়দায়,—এ সবের কোনো কিছুতেই একখানা মহৎ উপন্যাস লিখে ফেলা সম্ভব নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'চৈতন্যস্রোত' উদ্‌ঘাটনের আধুনিক 'ফ্যাশান' সম্বন্ধে অধ্যাপক সেন তো খুবই সন্দেহবাদী! কারণ, তাঁর মতে মানুষের মন যে বড়োই স্বেচ্ছাবিচরণে অভ্যস্ত! তবে, লেখক সে-ধারাকেও তাঁর নিজের অভিপ্রায়ের খাতে ফেলে, একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চালাতে পারেন বটে। এবং যা ছিল আদি-অন্ত-বর্জিত নিরন্তর 'স্রোত,'—লেখকের উদ্দেশ্যবোধের চাপে পড়ে, সেটা অচিরেই কৃত্রিম এক 'খাল' হয়ে দেখা দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়! অধ্যাপক সেন তাই বলেছেন,—উপন্যাস আর যাই হোক্—তাকে কোনোমতেই জীবনকথা প্রকাশের সংকীর্ণ একটা খাল মাত্র বলা চলে না!

গ্রীসে আলেকজাণ্ডারের বিজয়-অভিযানের ঠিক পরেই যে 'হেলেনিস্টিক' আমল গেছে,—সে-পর্বে যেমন 'এপিক' আর 'ট্র্যাজেডি'র অবসান সূচিত হয়, আর 'এপিলিয়ন' এবং 'প্যাস্টোরাল ইডিল,'—'এপিগ্রাম' এবং 'এলিজি'র প্রাচুর্য শুরু হয়েছিল,—তাঁর মতে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কতকটা সেই ভাবই যেন দেখা যাচ্ছে। ক্যালিমেকাসের Aitia থেকে অ্যাপলোর পরামর্শ স্মরণ করেছেন তিনি। বলেছেন—'Keep your muse thin'—'Mela biblion mela kakon'—অর্থাৎ 'বড়ো বই মানে বড়ো বোঝা'!

এ-যুগে বৃহদায়তন উপন্যাস অচল। তবু যে গল্স্‌ওয়ার্দির 'দি ফরসাইট সাগা' বা রোম্যাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ্' বা জুলে রোমাঁর 'মেন অব

গুড উইল'-এর মতন অতিকায় কিছু কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে, তা থেকে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তারই সুযোগ পাওয়া যায়। বাংলায় একালে তারাশঙ্করই সর্বাধিক স্ফীতকায় উপন্যাসের সর্বাধিক অশ্রান্ত লেখক। আয়তনের দিক থেকে আরো দু'-পাঁচজন লেখক যে তাঁকে ছাড়িয়ে না গেছেন, বা তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করেছেন, তা নয়। তবে, উপন্যাসের সার্থকতার দিক থেকে স্থূল আয়তনের দিকে ঝোঁকটা অবান্তর। 'আমি কতো মাংসল, কতো স্থূল, কতো গুরুভার হতে পারি,—এবং আমার অঙ্গে অঙ্গে কতো শিথিলতা ঘটতে পারে, সেটাই দেখানো যাক্ তবে'—এই বলে একালে কোনো কোনো বাংলা উপন্যাস যেন তাল ঠুকতে শুরু করেছে।

অধ্যাপক সেন বলেছেন, ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের আমল তো আগেই শেষ হয়েছে। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের যুগই হয়তো ভবিষ্যতে আরো কিছুকাল চলবে। হয়তো ব্যক্তিজীবন থেকে ক্রমশঃ সামগ্রিক জাতি-জীবনের দিকেই ভবিষ্যতের উপন্যাস আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে। হয়তো এক লেখকের রচনার পরিবর্তে উপন্যাস হয়ে উঠবে বহু লেখকের সমবায়-অনুশীলনের বিষয়। একথা বলবার সময়ে তিনি বিশেষভাবে যদি কোনো দেশের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে, সে বোধ হয়, রুশদেশ। কিন্তু সে দেশেও এরকম রচনা এখনো সত্যিই সম্ভব হয় নি।

ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফিরিয়ে, তিনি অতঃপর উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পনেরোই অগাষ্টের আগেকার শতকার্ধের কথা ভেবেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন—আমাদের সেই অর্ধ-শতকের জাতীয় সংগ্রাম কি সত্যিই একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের বিষয় হতে পারে না?

তাঁর এই প্রশ্নের কথা ভাবতে-ভাবতেই তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'সন্দীপন পাঠশালা' ইত্যাদি বইয়ের কথা পুনরায় মনে পড়তে পারে। 'কালিন্দী' প্রভৃতি বইয়ের পেছনে ঐ ধরনের একটা সংকল্প যে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র সংকল্পে কাজ হয় না। মহৎ উপন্যাসের জন্যে যা উপযুক্ত, বিধাতার দেওয়া সে-রকম ধারণাশক্তি বাংলা উপন্যাসে সত্যিই আজও চোখে পড়ে না। আমাদের ভালো উপন্যাস

আছে বটে, কিন্তু সত্যিকার মহৎ উপন্যাস কোথায়? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনজনের কলমেই যে মহত্ত্বের সম্ভাবনা দেখা গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সিদ্ধি? এইখানে মৃদুকণ্ঠে হয়তো একথাও বললে অসংগত হবে না যে, সাহিত্য-সমাদরের ক্ষেত্রে মহত্ত্ব-গুণটা কতকটা কালেরই দান। মানুষের ভাগ্যের বিধাতা যিনি,—সমাদরের ব্যাপারে তাঁরও সমর্থন চাই বই কি! অনেকে মিলে 'মহত্ত্বে'র একটা জনমতও তৈরি করা দরকার। সে মতের স্থায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু যা' সত্যিকার সার্থক রচনা, তার অনুকূলে জনমত গড়ে ওঠা চাই। এই প্রচারের যুগে—প্রচারে পিছিয়ে থাকলেই বা চলবে কেন?

ভবিষ্যতের উপন্যাস সম্বন্ধে অধ্যাপক সেন পরিশেষে এইচ. জি. ওয়েল্‌সের 'দি ওয়ার্ল্ড্ অব উইলিয়ম ক্লিসোল্ডে'র নাম করেছেন। সে বইখানিকে তিনি উচ্চ উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত বলেন নি বটে, কিন্তু 'আইডিয়া'র উপন্যাস বলতে যা বুঝিয়ে থাকে,—ক্লিসোল্ড্ যে সেই জাতের বই—এবং ভবিষ্যতে সেই জাতের উপন্যাসই যে আরো ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হতে পারে, এই রকম এক সম্ভাবনার কথা তিনি বেশ আবেগের সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীযুক্তা মুরিয়েল ওয়াসি তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মহৎ উপন্যাসের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে পুনরায় সেই সামগ্রিক ধারণা বা কল্পনাশক্তির কথাই তুলেছেন। সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের কথা তুলে তিনিও 'ডক্টর জিভাগো'র নাম করেছেন। আর, শ্রীযুক্ত ক্যাভেলিয়ো সে-বইয়ের নাম করেছেন বটে, তবে সেই সঙ্গে এই মন্তব্য যোগ করতেও ভোলেননি যে, সাম্প্রতিক কোনো রচনাকে 'শ্রেষ্ঠ' বলে ফেলাটা হঠকারিতারই নামান্তর; কারণ, কোনো রচনা সত্যিই মহতী সৃষ্টি হয়েছে কি না, সে-বিচার তো বহুকালব্যাপী এক সামাজিক অনুষ্ঠান! উত্তরকালে সে-রচনা সম্বন্ধে পাঠকরা কী ভাববেন, অথবা কী বলবেন, সে-সব কথা কি এই আজকের দিনে দাঁড়িয়েই চূড়ান্তভাবে বলে ফেলা যায়?

উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেখক এবং পাঠকদের মধ্যে সমুচিত ভাবনা যে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে, সাধারণ পাঠক এবং সাধারণ লেখকের কথা আলাদা। তাঁরা মোটামুটি প্রথার ধারক, প্রথারই বাহক! সব দেশে, সব কালে প্রথানুগামিতাই জনসাধারণের স্বভাব। এবং এই

ব্যাপক জনস্বভাব থেকেই লোকচক্ষুর অগোচরে শিল্পের নতুন নতুন রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেই সূত্র ধরেই এসব কথা বলা গেল।

মহৎ উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে কথা উঠলে শেষ পর্যন্ত শিল্পসৃষ্টিতে জীবনসমালোচনাগত শিল্পগুণের তারতম্যের কথাই ভাবতে হয়। উপন্যাসে জীবন-প্রক্ষেপের বিশ্লেষণে এগিয়ে গেলে, ঘুরে ফিরে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাই দেখা দেয়। মনে পড়ে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠা বা বাস্তবচর্চার ঝোঁক খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তখনকার লেখকদের মধ্যে Champfleury-র নাম খুবই পরিচিত। তাঁর আয়ুষ্কাল গেছে ১৮২০ থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Realisme-এর মধ্যে তৎকালীন বস্তুবাদী ভাবাদর্শের প্রতিভূ হিসেবে,—সে-আদর্শে তাঁর আনুগত্যের চিহ্নই সুস্পষ্ট। গুস্তাভ ফ্লবেয়ার (১৮২১-৮০) ছিলেন তাঁরই সমকালীন লেখক। ফ্লবেয়ারের জন্মস্থান Rouen। প্যারিতে তিনি আইন-শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর লেখক-জীবনের সূচনা ঘটে। দেশের নানা জায়গাতে এবং —ফ্রান্সের বাইরেও নানা অঞ্চলে তিনি ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'মাদাম বোভারী' প্রকাশিত হয়। এই 'মাদাম বোভারীর'র জন্যে তাঁকে কিছু আইনের তাড়না এবং আদালতের যন্ত্রণা ভোগ করতে হলেও পরিশেষে তিনি কিন্তু সসম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইতিহাসে ফ্লবেয়ারকে বাস্তবপন্থী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ স্মরণযোগ্য ব্যক্তি বলেই দেখানো হয়ে থাকে। তবে, তাঁর প্রথম দিকের লেখাতে রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের মোটেই যে অভাব ছিল না, কেউ কেউ সে-প্রসঙ্গও মনে করিয়ে দিয়েছেন। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি নাকি বস্তুবাদী সাহিত্য-চর্চায় হাত দিয়েছিলেন,—স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুধর্ম তাঁর নাকি স্বভাব নয়—এরকম কথাও বলা হয়ে থাকে। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-সূত্রে ক্যাজামিয়ঁ তো ফ্লবেয়ারকে মহান লেখক বলতেও আপত্তি করেননি। তিনি আরো এক কথা বলেছেন। ফলের গাছে পাকা ফলের সহজ সৌন্দর্য যেমন সহজেই আমাদের চোখের তৃপ্তি ঘটিয়ে থাকে, সে-রকম সহজ পরিণতির চিহ্ন ফ্লবেয়ারের কোনো লেখাতেই নেই। বড় আয়াসে-প্রযত্নে তিনি যে তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষ এক রকম

পরিণতি ঘটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন,—তাঁকে যে অসংখ্য কাটাকুটির যন্ত্রণা উজিয়ে এক-একখানি উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিমার্জনে পৌঁছুতে হয়েছে,—তার নজীর দেখতে হলে তাঁরই চিঠিপত্র খুঁজে দেখা দরকার।

কিন্তু জীবনের নানা খণ্ড-ঘটনার হুবহু বিবরণ তুলে ধরাটাই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কাজ নয়। তাই যদি হোতো, তাহলে এডমণ্ড (১৮২২-১৮৯৬) আর জুলে (১৮৩০-১৮৭০)—এই দুই Goncourt-সহোদরের কলম থেকেই জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হোতো। তাঁরা কিছু পরিমাণে ব্যালজাক-এর এবং কিছু পরিমাণে ফ্লবেয়ার-এর অনুসরণ করেছিলেন। শোনা যায়, এমিল জোলা নিজে,—এবং তাঁরই সঙ্গে তখনকার প্রাকৃতবাদী (naturalist) লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই তাঁদেরই পথ ধরে তাঁদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন! সেকালের জীবন-পরিবেশের খুঁটিনাটি নানা তথ্য,—বহু ছবি, দলিল, চিঠিপত্র, আসবাবপত্রের নমুনা ইত্যাদি সেকালের নানা উপকরণ তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের অঙ্গীভূত হতে দিয়েছিলেন। এই ভ্রাতৃযুগলের প্রশংসা করে ক্যাজামিয়াঁ জানিয়েছেন যে, কেবল তথ্য-সংগ্রহের বিপুলতাই এঁদের সামর্থ্যের বিশেষত্ব নয়,—যথার্থ শিল্পীর চোখ ছিল এঁদের। শুধু যে Fontainebleau প্রদেশের আরণ্য-সৌন্দর্য বর্ণনাতেই এঁদের মনোযোগ ছিল, তা নয়। প্যারি-নগরীর আশপাশের মফস্বল অঞ্চলও এঁরা বর্ণনা করে গেছেন। সেকালের পক্ষে সে-মৌলিকতাও তুচ্ছ নয়।

এই Goncourt-ভ্রাতৃযুগলের যখন বাল্যদশা, সেইসময়ে আলফাঁস দোদের (১৮৪০-১৮৯৭) জন্ম হয়। ফরাসী ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সামর্থ্যের কথা সুপরিচিত। ছোটগল্প এবং উপন্যাস, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। অকৃত্রিম মমতা আর কৌতুকবোধের সমন্বয়ে তাঁর বাস্তব-দৃষ্টিতে বিশেষ যে গুণটি বর্তেছিল, তারই ফলে, তাঁর লেখাতে ইংরেজ পাঠক-সমাজের চোখে বিশেষভাবে বাঞ্ছিত এবং বিশেষ সমাদরণীয় দুর্লভ 'হিউমার'-এর আভাস দেখা গেছে। ডিকেন্সের সঙ্গে সেইদিক থেকেই তাঁর সমধর্মিতার কথা ভাবা হয়।

দোদের সঙ্গে একই বছরে জন্মেছিলেন এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। ফরাসী সাহিত্যে প্রাকৃতবাদ বা 'ন্যাচারালিজম্'-এর তখন প্রবল

জোয়ারের কাল। তোমার লেখাতে সেই বস্তুবাদ এবং প্রাকৃতবাদের প্রভাব পড়েছিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কথা ভাবতে গেলে—রুশ-ফরাসী-ইংরেজি-জার্মান যে-কোনো সাহিত্য-রাষ্ট্রের কথাই ভাবা যাক্ না কেন, জগতের বাস্তব সত্য আর লেখকদের কল্পনার সৃষ্টি, এই দুইয়ের আনুপাতিক সম্পর্কের কথাটাই বার বার মনে আসে। যিনি যে-ভাবেই কল্পনার কাজ দেখান না কেন,—উপন্যাস রচনার কাজে—চরিত্র, ঘটনা, গঠন, সংলাপ ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণের সমাবেশে আমাদের এই দুর্বোধ্য জীবন-রহস্যের বিস্তার এবং গভীরতা,—দুটি দিকই ফুটিয়ে তোলা দরকার।

সে-কাজ কোন্ উপায়ে কী কৌশলে যে সাধ্য, সে-কথা কে বলবে? শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'কতদূরে কোন্ অবস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন বাঁধা-ধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচারবুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশই পাবার যো নেই।'

অর্থাৎ ঐ পর্যন্তই পাঠকের সীমা! মানিকবাবু যে তাঁর পূর্বোক্ত লেখাটিতে 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন'-এর কথা তুলেছিলেন, সে তো খুবই সংগত কথা। তবে, 'বিজ্ঞান' কথাটার দিকে সমুচিতভাবেই লেখকদের জাগরণ দরকার। তের শ' বত্রিশ সালের পৌষের 'সবুজপত্রে' সমসাময়িক-সাহিত্য আলোচনা-প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছিলেন,—'সমাজের নূতন নূতন সমস্যা, মানবপ্রাণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও কর্তব্যের আলোচনা যে সুকুমার সাহিত্য হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এই সকল বস্তু বা উপকরণ সাহিত্যের রূপে ও রসে রূপান্তরিত ও রসান্বিত করিয়া ধরিবার জন্য থাকা চাই একটা যাদুবিদ্যা, একটা মোহিনী শক্তি। আমাদের দেশে এই দিক দিয়া যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয়

শরৎচন্দ্র।' উপন্যাসের ক্ষেত্রে, শরৎচন্দ্রের কলমে এই মোহিনী শক্তি যে-পরিমাণে দেখা দিয়েছিল, তারাশঙ্করের কলমে ততোটা ঘটেনি। তবে গল্পে,—তাঁর 'রসকলি', 'জলসাঘর' প্রভৃতি লেখাতে তো বটেই,—'ইমারত' বা 'মাটি',—'শিলাসন' বা 'কামধেনু' বা 'স্থলপথ',—তিনশূন্য' বা 'মানুষের মন'—নানা পর্বের নানা গল্পেই সে-শক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

নলিনীকান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তৃত অর্থেই সুকুমার সাহিত্যের কথা ভেবেছিলেন। তিনি শিল্পী আর সংস্কারক, এই দুই পৃথক ভূমিকার কথা ধ'রে, আলোচনা করতে-করতে প্রসঙ্গতঃ দেশী-বিদেশী কয়েকজন লেখকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকুমারবাবু প্রধানতঃ উপন্যাসের কথাসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরের আমলের বাংলা উপন্যাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে 'মোহিনী শক্তি'র অভাবের ইশারা করেছেন।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় থেকে ১৩৫৪-র আষাঢ় মাসে ছাপা 'বাংলা উপন্যাস' বইখানিতে তিনি বাংলা উপন্যাসের আদিকাল থেকে শুরু ক'রে,—বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার এবং শরৎচন্দ্রের কথা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে ব'লে নিয়ে, পরিশেষে মাত্র বারো পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারা বর্ণনা করেছেন। এই আধুনিকতর উপন্যাস-ক্ষেত্রকে তিনি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে আগেকার ধারাকে সমুদ্রপ্রবেশোন্মুখ নদী বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, আমাদের উপন্যাসে বিষয়-নির্বাচন, আলোচনা-পদ্ধতি আর দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রাক্তন আদর্শ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সাম্প্রতিকতর বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা তারই মধ্যে নানান্ বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন। এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের বহুতর কথা মনে রেখে, নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে কয়েকটি আধুনিক প্রবণতার ওপরেই তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। একালের এইসব বিশেষত্বের মধ্যে একটি হোলো 'নিষিদ্ধ ও সমাজ-বিগর্হিত প্রেম'-এর দিকে লেখকদের নজর। আগের আমলেও বাংলা উপন্যাসের অন্যতম প্রসঙ্গ হিসেবে এ-দিকটি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু হাল আমলের লেখকদের কলমে এই প্রসঙ্গই কেমন যেন অন্য মনোভঙ্গির তাড়নায়,—অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। শ্রীকুমারবাবু এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়—'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাঙালী-সমাজে অবাঞ্ছিত প্রেমের বিরলত্ব সম্বন্ধে

সচেতন আছেন বলিয়াই ইহার আবির্ভাবের পটভূমিকা রচনার দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন—ইহাকে হয় আদর্শলোকের উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্র করিয়াছেন না হয় যে বিপুল, অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস ও প্রতিবেশ-বৈশিষ্ট্য হইতে ইহার উদ্ভব তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বারা ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়াছেন। ইঁহারা অবৈধ প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার পিছনে আছে উচ্চতর নীতিবোধের সমর্থন, বিদ্রোহের ঝাঁজ, বঞ্চিতের প্রতি ন্যায়-বিচারমূলক সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের অনুপম রসমাধুর্য।'

অপর পক্ষে, হাল আমলের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এই একই বিষয়ে বিপরীত মনোভাব দেখা গেছে। আবার, তাঁরই কথায়—'প্রথমতঃ ইহারা এইরূপ অবৈধ প্রেমের উদ্ভবকে বাঙালী-সমাজের একটি অতি সুলভ স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব রূপে গ্রহণ করিয়া ইহার সম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা কেমন করিয়া প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে জন্মিল, কি বিপুল হৃদয়াবেগের দোলায় আন্দোলিত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিল তাহার কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইঁহাদের উপন্যাসে মিলে না।' শ্রীকুমারবাবু এই প্রসঙ্গটি আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। এঁদের সম্বন্ধে —এই প্রসঙ্গ-নির্বাচনের ব্যাপারে যেমন, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাধিত (morbid) অবস্থা সম্বন্ধেও তেমনি,—তিনি খুবই স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—'অবিমিশ্র বাস্তববাদই ইঁহাদের প্রধান ধর্ম ও ইঁহাদের অনুসৃত প্রণালীর চূড়ান্ত সমর্থন এইরূপ দাবি ইঁহাদের তরফে করা হয়। কিন্তু আলোচনার মধ্যে যে সব সময় নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবানুসরণের পরিচয় মেলে, তাহা মনে হয় না।...কোনো কোনো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকের প্রথম বয়সের রচনা পড়িলে মনে হয় যে নিছক কুৎসিৎ-প্রীতিই তাঁহাদের বিষয়-নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার ইঁহাদেরই পরবর্তী রচনায় বাস্তবানুগত্য অন্য দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—কর্দমের হোলি খেলার পরিবর্তে কাব্যপ্লাবনের জোয়ার আসিয়া বাস্তবতার ভিত্তিমূল পর্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে ও অতীন্দ্রিয় রহস্যের আভাস পারিজাত-কুসুমসুরভির ন্যায় বাস্তব পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে।' উপন্যাস-লেখকের পক্ষে একথা যতই অপ্রীতিকর হোক্,—সত্যের খাতিরে প্রবীণ সমালোচকের এ-মন্তব্য নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য।

এ-কালের বাংলা উপন্যাসে কোনো মহিমার বা কোনো প্রশংসনীয় শক্তির পরিচয় নেই—এ-রকম কথা মনে করা বা তা প্রকাশ করা কোনো সৎ-পাঠকের অভিপ্রেত নয়।

উনিশ শ' তিরিশ থেকে উনিশ শ' ষাটের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিলেও—কিছু কিছু ভালো উপন্যাস যে বেরিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের স্মরণীয় উপন্যাস-শিল্পী। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ যে কতকটা প্রতিবেশ-নিরপেক্ষভাবে 'ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে দোলায়িত হৃদয়বৃত্তির ইতিহাস' লিখে গেছেন,—এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে 'সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হৃদয়াবেগের স্বাধীনতার বিদ্রোহ' উচ্চারিত হয়েছিল, শ্রীকুমারবাবুর সে-বিশ্লেষণেই বা সন্দেহ কিসের? আর, শতাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী—আমাদের এই সাম্প্রতিকতম বর্তমানে—'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা' যে 'আজ সর্বগ্রাসী অভিভবে জীবনকে বজ্রমুষ্টিতে' চেপে ধরেছে, সে-কথাও সন্দেহাতীত! ফলে, তাঁরই কথায়—'আধুনিক ঔপন্যাসিক জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অন্তর্জীর্ণতার জন্যই কোনো সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসরণে অক্ষম। হৃদয়াবেগের মধ্যে যাহা তীক্ষ্ণতম সেই প্রেমও আজ নানা জটিল সমস্যাজালে সমাচ্ছন্ন।'

এই শেষ মন্তব্যটি বিশেষভাবে সাম্প্রতিকতম বর্তমানের প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। এতে আমাদের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষভাবে একজনকে ভালো বা অন্যজনকে মন্দ বলবার চেষ্টা নেই। বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক সংখ্যাধিক যে সৎ পাঠকের কাছে মোটেই উল্লাসের বিষয় নয়, সেই গূঢ় এবং গুরু কথাটাই এইসূত্রে স্বীকার্য। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী,—কল-কারখানার শ্রমিক,—কৃষিজীবী গ্রামবাসী,—যাযাবর, সাঁওতাল, বেদে, সাপুড়ে ইত্যাদি—যে-কোনো শ্রেণীর কথাই আসুক না কেন,—জীবনের বিস্ময় একদিকে আর বাস্তব-জগতের সম্ভাব্যতা অন্যদিকে,—এরা কিছুতেই যেন আর পরস্পরের সঙ্গে মিশতে চাইছে না! শ্রীকুমারবাবু আরো লিখেছেন,—'অতি-আধুনিক উপন্যাসে হাস্যরসিকতার একান্ত অভাব'।

উপকরণের দিক থেকে, বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর যে অনেক নতুন তথ্য যোগ করেছেন, সেই-কথা ভাবতে-ভাবতেই শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটো একটি নিবন্ধের কথা মনে পড়ে। সে লেখাটির নাম, সাহিত্যের

উপকরণ'—তেরশ' ষাট সালের সাহিত্য-সংখ্যা-'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—'জাতিগত হিসেবে ইংরেজের তুলনায় আমাদের জীবনে বৈচিত্র্যের সুযোগ হয়ত কয়েকটি দিকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ত সত্য যে, জাতি হিসেবে আমাদের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার সামান্য একটু ভগ্নাংশ ছাড়া সাহিত্যের আলোয় এখনো তুলে ধরা হয় নি।' তারাশঙ্কর সত্যিই সে-কাজ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে একভাবে,—আবার 'আরণ্যক' বইখানিতে অন্যভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার পৃথক পৃথক ক্ষেত্র দেখিয়ে গেছেন,—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' যেমন তারাশঙ্করেরও নয়, বিভূতিভূষণেরও নয়—তাঁরই অন্য জগৎ,—প্রত্যেক শক্তিমান কথাসাহিত্যিকেরই তেমনি নিজস্ব এক-একটি জগৎ থাকে। সেই জগৎটি যতো পরিব্যাপ্ত, যতো সর্বজনীন হয়, ততোই ভালো—কারণ, উপন্যাস যে একালের মহাকাব্য! কিন্তু আদি ও অকৃত্রিম মহাকাব্য বলা যায় যাদের,—সে-সব রচনায় বিশেষ কবির বিশেষ দৃষ্টির খোঁজ নেবার দরকার নেই। তাতে সমষ্টিরই প্রতিফলন ঘটে থাকে। গল্পে-উপন্যাসে কিন্তু সে-রকম নয়। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে তারাশঙ্করেরই স্বভাবের স্বাক্ষর পড়ে,—বিভূতিভূষণের রচনায় বিভূতিভূষণেরই। সেই বিশেষত্বের কথাই—তের শ চৌষট্টির সাহিত্য-সংখ্যা 'দেশে', শ্রীকুমারবাবুর একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর সেই 'বাংলা উপন্যাস ১৯০১-২৫' প্রবন্ধটিতে তিনি বিভূতিভূষণ এবং, তারাশঙ্কর দুজনের আবির্ভাবকেই 'অতর্কিত' বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন। 'অতর্কিত'—কারণ এঁরা আধ্যাত্মিক! কারণ,—তাঁর মতে, উনিশ শ' কুড়ির দশকে এবং তার আগে থেকেই বাঙালীর যৌথ-পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে, সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—'জীবন-নদীতে সমস্যা-সঙ্কুলতার চড়া' দেখা দিয়েছে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়-নরেশ সেনগুপ্তের কথা-সাহিত্যে! শ্রীকুমারবাবু আরো লিখেছিলেন—'তারাশঙ্করের অতীতমুখী কল্পনা জরজর্র সামন্ততন্ত্রের যুগ-পরিবর্তনজনিত ব্যর্থতাবোধকে ভাষা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; ইহা 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ও 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ বাংলার অধ্যাত্মতত্ত্বাশ্রয়ী সমাজ-চেতনার মর্ম-রহস্যটি উদ্ঘাটিত করিয়াছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে অতীত যুগের ভাব-কল্পনা ও জীবনবোধ বর্তমানের প্রকৃতি-প্রেম ও ইতিহাস-চেতনার দ্বারা উন্নীত হইয়া প্রাচীন

সংস্কৃতির এক অভিনব রূপায়ণ সাধিত করিয়াছে।' এই দুজনের কথা-সূত্রেই তিনি তাঁর—আজ থেকে বছর-চারেক আগেকার সেই প্রবন্ধে বলেছিলেন—'এই জাতীয় রচনার মধ্যে বাংলা উপন্যাস পাশ্চাত্ত্য অনুসৃতির পথ ছাড়িয়া দেশের প্রাণ-সত্তার এক নিগূঢ় রহস্যালোকে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।'

এদিকে 'দেশ' পত্রিকায় তারাশঙ্কর সম্বন্ধে তের শ চৌষট্টিতে শ্রীকুমারবাবু যা বলেছিলেন, তের শ' ছেষট্টির সাহিত্য-সংখ্যায় 'স্বরাজ্যে স্বরাট' নামে প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্করের সেই উপকরণগত বিশেষত্ব আর আধ্যাত্মিকতার কথাই পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়—'এত বস্তু-বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে আর কারো লেখাতেই নেই।' তিনি তারাশঙ্করের—'অভাবিত চরিত্র'—'অভিনব পরিবেশ',—'স্বভাবসিদ্ধ নাটকীয়তা'র কথাও বলেছেন। তারাশঙ্করের বৈঠকী মেজাজের কথাও উল্লেখিত হয়েছিল—আর তাঁর অভিনয়-দক্ষতার কথাও। মূল চরিত্র আর ঘটনার চেয়ে পার্শ্বচরিত্রে আর আনুষঙ্গিক ঘটনাতেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর যে বেশি মনোযোগী, সে-কথারও উল্লেখ ছিল সে-প্রবন্ধে। কিন্তু ততোধিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ছিল নারায়ণবাবুর সেই লেখাটিরই শেষ দিকে। 'মন্বন্তর'-এ এবং '১৩৫০'-এ সাম্যবাদের প্রতি তাঁর নিতান্তই সাময়িক ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন তিনি—আর তৎপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—'হিউম্যানিজমের সঙ্গে আস্তিক্যবুদ্ধির মিলনে তারাশঙ্করের ভাবলোক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।'

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে তারাশঙ্কর সাম্যবাদে আগ্রহশীল ফ্যাসিবিরোধী-লেখকসংঘে যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে-পথ থেকে অচিরেই ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী,—নাট্যগুণে আগ্রহী,—ইতিহাসে তাঁর নিজের স্থান সম্বন্ধে একটু যেন বেশি সচেতন,—রচনায় মাত্রা-জ্ঞানের দিক থেকে একটু বেশি রকমই অসংযত! অল্প বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার এবং মতিবিবির সাক্ষাৎকার বর্ণনায় 'প্রদীপ নিভিয়া গেল' কথা-কয়টিতে তিনি অতুলনীয় নাটকের ইশারা অনুভব করেছিলেন। 'দেশ' পত্রিকারই তের শ পঁয়ষট্টির সাহিত্য-সংখ্যায় তাঁর সে আত্মকথা ব্যক্ত হয়েছিল। নানা তত্ত্বে নিজেকে চিহ্নিত রাখবার সাম্প্রতিকতম ব্যাপক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সেই বঙ্কিমচন্দ্রীয় রোম্যান্সের

মোহেই চিরাবিষ্ট। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ নয়। শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই এক সময়ে সাগ্রহে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন,—তাছাড়া তাঁর উপকরণ-সন্ধান ও রচনারীতি-প্রসঙ্গে কখনো শ্রীযুক্ত সমরেশ বসুর কথা মনে পড়ে,—কদাচ বা অন্য কারো! কিন্তু এসব কথা ভিন্ন কথা। তাঁর নিজের সম্বন্ধে এই কথাই সর্বাধিক স্মরণীয় যে, তিনি অভিজ্ঞতার মানুষ! 'কবি' উপন্যাসে,—'ধাত্রী দেবতায়,—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়'—আরো সাম্প্রতিক কালের আরো নানা রচনায় অভিজ্ঞতার ওপরেই তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন। এসব কথা তিনি তাঁর 'সাহিত্যের সত্য' বইখানিতে এবং তাঁর জীবনকথা-সম্পর্কিত অন্যান্য বইয়ে বলেছেন। আর, সাহিত্যে, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য তাঁরই 'সাহিত্যের সত্য' বইখানি থেকে তুলে দেখা যেতে পারে—'রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে স্থান-কালের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সূর্য স্থির আছে, গতিশীল পৃথিবী বিবর্তিত হচ্ছে; চলছে; ফলে বর্ণে ও উত্তাপের বিভিন্নতায় প্রভাত ও সন্ধ্যার লীলা রূপান্তরিত হচ্ছে—কালো জলের বুকে পদ্মের পাপড়ি খুলে যাওয়া এবং মুদিত হওয়ার মধ্যে। মানুষের জীবনলীলাও তো তেমনি ধারা সাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে আপেক্ষিক।'*

এই অর্থে-ই তারাশঙ্করের অনন্তের রসিক, অশেষের সন্ধানী!

এখানেই এ-বইয়ের ছেদ টানা যাক।

---

* 'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট (ক)

তারাশঙ্করের গ্রন্থপঞ্জী

তারাশঙ্করের সব বইয়ের প্রথম সংস্করণ দুর্লভ। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে মোটামুটি তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা সাজিয়ে দেওয়া গেল। বন্ধুবর শ্রীসনৎ গুপ্ত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্বনির্বাচিত গল্প' অবধি এই তালিকাটি তৈরি করে দিয়েছেন। তার পরের বইগুলি প্রথম প্রকাশকাল এবং অন্যতর কিছু কিছু উল্লেখ বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনাপ্রবাহ এখনো অব্যাহত। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীর প্রাথমিক খসড়া হিসেবে এটি কাজে লাগতে পারে।

ত্রিপত্র। (কাব্য) ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। পৃঃ ৬০

চৈতালী ঘূর্ণি। (উপন্যাস) ১৯২৮।

পাষাণপুরী। (গল্প) ১৪ জুলাই ১৯৩৩। পৃঃ ১৩৮

নীলকণ্ঠ। (গল্প) ৪ সেপ্টেম্বর। ১৯৩৩ । পৃঃ ১৭০

প্রেম ও প্রয়োজন। ১০ জুলাই ১৯৩৬। পৃঃ ২৮৪

ছলনাময়ী (গল্প)। ৫ অক্টোবর ১৯৩৬। পৃঃ ২৬১

জলসাঘর (গল্প)। ৩ অক্টোবর ১৯৩৭। পৃঃ ২৩৭

আগুন (উপন্যাস)। ৯ অক্টোবর ১৯৩৭। পৃঃ ১৭৮

রসকলি। ২১ মে ১৯৩৮। পৃঃ ২০৭

ধাত্রীদেবতা (উপন্যাস)। ৭ অক্টোবর ১৯৩৯। পৃঃ ৪৩০

কালিন্দী (উপন্যাস)। ৭ নভেম্বর ১৯৪০। পৃঃ ৪১৬

তিনশূন্য (গল্প)। ১৬ এপ্রিল ১৯৪১। পৃঃ ২১৩

কালিন্দী (নাটক)। ১০ আগষ্ট ১৯৪১। পৃঃ ১৩৭+৩

দুই পুরুষ (নাটক)। ২০ জুন ১৯৪২। পৃঃ ৫+১২৮

গণদেবতা (উপন্যাস)। অক্টোবর ১৯৪২। পৃঃ ৪১৩

প্রতিধ্বনি (গল্প)। ২ এপ্রিল ১৯৪৩। পৃ· ১৬৮

বেদেনী (গল্প)। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩। পৃঃ ২১৮

রাইকমল (উপন্যাস)। ৪ অক্টোবর ১৯৪৩। পৃঃ ১২০
দিল্লীকা লাড্ডু (গল্প)। ১৩ নভেম্বর ১৯৪৩। পৃঃ ১০৮
মন্বন্তর (উপন্যাস)। ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৪। পৃঃ ৩৫৭
যাদুকরী (গল্প)। ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৪। পৃঃ ২১২
স্থলপদ্ম (গল্প)। ১২ এপ্রিল ১৯৪৪। পৃঃ ১৬৩
পঞ্চগ্রাম (উপন্যাস)। ২৬ জুন ১৯৪৪। পৃঃ ৪৭৬
কবি (উপন্যাস)। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। পৃঃ ১৬৮
১৩৫০। ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৫। পৃঃ ১২৮
বিংশ শতাব্দী (নাটক) ১১ মে ১৯৪৫। পৃঃ ১৩৩
চকমকি (প্রহসন)। ১৩ জুন ১৯৪৫। পৃঃ ৮২
প্রসাদমালা (গল্প)। ৭ আগষ্ট ১৯৪৫। পৃঃ ১৭৪
হারানো সুর (গল্প)। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। পৃঃ ২১৩
দ্বীপান্তর (নাটক)। ৩০ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ১১২
ইমারৎ (গল্প)। ২২ মে ১৯৪৬। পৃঃ ১৯৪
সন্দীপন পাঠশালা (উপন্যাস)। ২১ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ২৩৯
ঝড় ও ঝরাপাতা (উপন্যাস)। ২৫ নভেম্বর ১৯৪৬। পৃঃ ১১৬
অভিযান (উপন্যাস)। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭। পৃঃ ৩২০
রামধনু (গল্প)। ১৭ আগষ্ট ১৯৪৭। পৃঃ ১৮৬
সন্দীপন পাঠশালা (বালপাঠ্য উপন্যাস) ২৮ মার্চ ১৯৪৮। পৃঃ ১৬০
তামস তপস্যা (উপন্যাস)। ১২ এপ্রিল ১৯৪৯। পৃঃ ২৩০
মাটি (গল্প)। ২৩ অক্টোবর ১৯৫০। পৃঃ ১৩৪
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (উপন্যাস)। ১৮ জুন ১৯৫১। পৃঃ ৪৫২
শ্রেষ্ঠ গল্প। ২৫ আগষ্ট ১৯৫১। পৃঃ ২৭৩
আমার কালের কথা (জীবনী)। ১৫ মে ১৯৫১। পৃঃ ২২৩
বিচিত্র (প্রবন্ধ)। ১৪ এপ্রিল ১৯৫৩। পৃঃ ১১৮
আরোগ্য নিকেতন (উপন্যাস)। ১৩ এপ্রিল ১৯৫৩। পৃঃ ৪০৬
প্রিয়গল্প। ৪ নভেম্বর ১৯৫৩। পৃঃ ২২০
কামধেনু (গল্প)। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৩। পৃঃ ১৪৬
স্ব-নির্বাচিত গল্প। ২৩ জুলাই ১৯৫৪। পৃঃ ২৩০

পরিশিষ্ট (খ)

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থ, গ্রন্থকার, উৎসক্ষেত্র, শিল্পাদর্শ ইত্যাদি— | পৃষ্ঠাঙ্ক

ট

ড

ত

দ

ধ

ন

ব

ভ

ম